আমার রামায়ণ

হিমানীশ গোস্বামী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৭১

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন : অনূপ রায়
মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এন. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ডি. বি. প্রিণ্টার্স, ৪ কৈলাস মুখার্জী লেন
কলকাতা-৬ হইতে আর. বি. মণ্ডল, কর্তৃক মুদ্রিত

সাগরময় ঘোষ

শ্রদ্ধাস্পদেষু



আমার রামায়ণ

আমার রামায়ণ ? কথাটি ভেবে চিন্তেই ব্যবহার করছি, কেননা কথাটি মোটেই মিথ্যে নয়। আপনাদের রামায়ণ রয়েছে আর আমার থাকতে পারে না ? রামায়ণ এক রকম নয় সকলেই জানেন—প্রত্যেকটি রামায়ণে গল্প কাহিনী আলাদা। ইন্দোনেশিয়ায় এক রকম রামায়ণ চালু আছে, দক্ষিণ ভারতে আর একরকম। তা ছাড়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ, তুলসীদাসের বা কাশীরাম দাসের রামায়ণেও কত পার্থক্য ! নামের বদল কাহিনীর বদল সত্ত্বেও রামায়ণ রামায়ণই। তা ছাড়া, দেখতে পাবেন রামায়ণ সকলে সবটা মনে রাখতে পারেন না। শিশুরা তো অনেকেই ভুলে যায়—তারা নিজেদের মতো করে গল্পটা বুঝে নেয়। কেবল শিশুরাই নয়—বড়দেরও ভুল হতে থাকে, নাম ভুল হয়, স্থান কাল ভুল হয়। জীবনের নানা ক্ষেত্রে যেমন ভুল হয়, হাজার হাজার বছরের শ্রুতিপ্রধান রামায়ণও সে ভুল হতে রেহাই পায় না। "সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মাসী" কথাটা বিনা কারণে সৃষ্টি হয়নি। সীতা রামের মাসী না হতে পারেন, তবে শুনেছি কোনও কোনও রামায়ণে সীতা রামের বোন ! আপনারা কি তিব্বতের রামায়ণের কথা জানেন ? সেখানে কুবেরের নাম 'কোরে', এটা বোঝা যায়, কিন্তু কুম্ভকর্ণ সেখানে অমলকর্ণ ! রাবণের পিতা বিশ্বশ্রবা নন, তিনি রতন ! রাবণের নামও সেখানকার রামায়ণে নেই, তিনি সেখানে দশবীর। আবার দেখুন শূর্পনখা ঐ রামায়ণে অনুপস্থিত—তিনি সেখানে ফুরপর ! কোথায় শূর্পনখা, কোথায় ফুরপর ! আর রামের নাম সেখানে রমণ, সেটা মোটামুটি বোঝা যায়—কিন্তু সীতা সেখানে যে লীলাবতী ! তাহলেও কিন্তু তিব্বতের রামায়ণ রামায়ণই।

আরও দেখুন, গত শতাব্দীতে, আজ থেকে একশো বছরেরও বেশি আগে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এডেন থেকে সংগ্রহ করেছিলেন সেখানকার রামায়ণ-কাহিনী। সে কাহিনীও অদ্ভুত ! সেখানে রাবণের নাম দশশির। রাম সেখানে চন্দ্র নন, রাম হায়দার ! হনুমান সেখানে হনুবীত। সেখানে সমুদ্রের উপর

সেতুববন্ধনের ঘটনা নেই. আছে সমুদ্রের তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ। হনুবীত সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে গিয়ে, দশশিরের বন্দিশালা থেকে রাম হায়দারের স্ত্রীকে উদ্ধার করেছিল। এই কাহিনীটি ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর অপূর্ব গ্রন্থ 'এ ভিজিট টু ইউরোপ' বইতে আমাদের জানিয়েছেন। আরও কয়েক ডজন রামায়ণ রয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে নানারকম কাহিনী, নানা মুনি সে-সব রামায়ণে নানা কথা লিখে গেছেন, তার কোনটা সত্যি ?

এত সব কথা বলার কারণ, আমার রামায়ণও যে রামায়ণ হতে পারে—সে জন্য পাঠকদের একটু প্রস্তুত করছি। হঠাৎ আমার রামায়ণ শুরু করলে অনেক পাঠকেরই মনে হতে পারে, কে উনি এলেন যে ওঁর কথা শুনতে হবে, মানতে হবে ? আমার একটিই প্রার্থনা, আমার কথা মানবার প্রয়োজন নেই কেবল শুনুন। মনে রাখবেন, আমি কিন্তু বলছি না রামায়ণে সত্যি সত্যি যা ঘটেছিল তা আমি জানি, সত্যি কথা এই—আমি জানি না। তবে আমার মনে হয় রামায়ণে যা বলব হয়ত সে-সব ঘটেছিল। মাইকেল মধুসূদন যে মেঘনাদ বধ কাব্য লিখেছিলেন সেটি রামায়ণের কোথাও কি আগে ছিল ? রামের জন্মের আগেই রামায়ণ লেখা হয়ে গিয়েছিল, আবার রামের জন্মের পরও লেখা হয়েছে। এটাও সেই রকমই একটা ব্যাপার। তবে, যেহেতু স্থান-সংক্ষেপ সে-জন্য আমি পুরো রামায়ণ-কথা বিশদভাবে এখানে লিখতে পারব না। সংক্ষিপ্ত কথাই এখানে দেওয়া সম্ভব।

অনেকের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত, বিশেষত পণ্ডিতদের বোঝানো দায় যে একদা আমাদের এই ভারতবর্ষ কেবল পশ্চিমী নয়, সারা দুনিয়াই জয় করে-ছিল। "আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়" নিজের নামে দ্বীপটির নামকরণ করেছিলেন। সিংহ থেকে সিংহল হয়েছিল, ঠিক তেমনই অসম্ভব এক প্রাচীন কালে, আমাদের দেশের রাজা রামচন্দ্র ইউরোপ জয় করেছিলেন। এর বহু প্রমাণ প্রক্ষিপ্ত অবস্থায় এখানে ওখানে রয়ে গেছে, কিন্তু যেহেতু আত্মবিস্মৃত হওয়া আমাদের স্বভাব সেহেতু আমরা নিজেরাই নিজেদের কীর্তি কাহিনী ভুলে গেছি। প্রাচীনকালে আমরা যেমন উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলাম ইন্দোনেশিয়ায়, গড়ে তুলেছিলাম বিরাট বিরাট মন্দির বরবুদুরে, তেমনি একদা আমরা ইউরোপও জয় করেছিলাম। কোথায় সেসব পাব ? আছে। প্রমাণ আছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা আত্মবিস্মৃত ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু নিতান্ত মূর্খ ছিলেন না। বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করে নাম রেখেছিলেন সিংহল, তেমনি বহু নামের মাধ্যমে আমি দেখিয়ে দিতে পারব যে আমরাই, অর্থাৎ এই ভারত-বাসীরাই একদিন, যেদিন ভারতের আসন ছিল জগতসভায় শ্রেষ্ঠ, সেই গৌরবের দিনে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাত্রেও জ্ঞাত পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছিলাম। এ ব্যাপারে আমি কোনও সাল তারিখ দিয়ে পণ্ডিতদের কোপানলে পড়তে চাই না। অনেকেই বলবেন, অমুক জায়গার অমুক নাম অমুক সালের আগে ছিল না অতএব অমুক সিদ্ধান্তটি নিতান্তই অমূলক। আমার বক্তব্যের চুল-চেরা বিচার আজই করা হবে আমার পক্ষে অবিচার।

আমার কোনও কোনও অনুমান এবং তজ্জনিত সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত সঠিক নাও হতে পারে—প্রাচীন ইতিহাসের কোন্ প্রমাণটিই বা একেবারে চূড়ান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে ? কিন্তু দু-একটি অনুমান এবং সিদ্ধান্ত পণ্ডিতেরা বাতিল করলেই সবটাই বাতিল হয়ে যাবে এমন কথাই বা কে বলবেন ? আমার অনুরোধ, আমার বক্তব্য বিশ্বাস করে এগিয়ে যান, দেখবেন কোনও গোলমাল নেই।

ভারতবর্ষে রামচন্দ্রের নামেই যে রোম নগরীকে অভিহিত করা হয় এ-কথা শুনলে অনেকেই বলবেন, লোকটি কয় কি ? কিন্তু বিষয়টি কেউই জানেন না তাও তো নয়। অযোধ্যা থেকে রামচন্দ্র যখন চোদ্দ বছরের জন্য বেরুলেন তখন থেকে রামের প্রতিটি পদক্ষেপের কথা কোন রামায়ণেই নেই। রামচন্দ্রের চোদ্দ বছর বন-বাসের কথা আছে, কিন্তু তার মধ্যে যে অনেকটাই ফাঁক। হিসেব করতে গিয়ে দেখবেন রামচন্দ্রের বেশ কয়েক বছরেরই কোনও হিসেব নেই। রামচন্দ্র চোদ্দ বছরের জন্য বনে গিয়েছিলেন এটাও আমরা শুনেছি, এবং ভুল করে দণ্ডকারণ্য এবং অন্যান্য অরণ্য সম্পর্কে মনে করি তিনি এইসব জায়গাতেই বোধ করি ছিলেন।

কিছু সময় হয়তো ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি বন-এ যান। বন যে এখন পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী সেই বন-এই রামচন্দ্র গিয়েছিলেন বলে আমার ধারণা। আমার ধারণা, চলতি রামায়ণে একটা গুরুতর ভুল আছে, সেটা হল রামচন্দ্রকে যখন বনে যাবার আদেশ দেওয়া হয় তখন রামচন্দ্র ছিলেন বিবাহিত ! রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ হয় অনেক পরে, এবং সে সীতাও অন্য সীতা। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন শ্বেতা ! সে-কথা পরে বলছি।

রামচন্দ্র গিয়েছিলেন ইউরোপে। ভারত-সম্রাট দশরথ ইউরোপের প্রথম সম্রাট হন। তাঁর আগেও ইউরোপে ভারতীয় শাসন কিংবা বিরাট প্রভাব ছিল। প্রাচীন ভারতীয়রা ইউরোপ জয় করেন। তখন সমগ্র মহাদেশের নাম কিছু ছিল না। নাম দেওয়া হয় অরূপা। এটাও পূর্ববর্তী নাম 'অপরূপ' থেকে হয়েছে এই অনুমান পণ্ডিতেরা করলে খুবই চমৎকার হয়। আমি পণ্ডিতদের মধ্যে এই নিয়ে কিছু বিতর্ক হক এটা চাই। দু-একজন পণ্ডিত সমর্থন করলেই আমার চলে যাবে। ঐ সময় আলপস্ পর্বত দেখে নামকরণ করা হয় অল্পস্য। কারণটা নিশ্চয়ই ভারতীয়রা হিমালয়ের বিরাটত্বের তুলনায় ইটালির উত্তরের পর্বতকে নিতান্তই নগণ্য মনে করেছিলেন, এবং নাম দিয়েছিলেন এহ অল্পস্য। আবার আগ্নেয়গিরির ভরাবহ অগ্ন্যুৎপাতের পর আমাদেরই পূর্বপুরুষ কেউ বলেছিলেন এতনা ! সেই থেকেই সেটির নাম এটনা। কালক্রমে অপরূপা হয় অরূপা, পরে ইউরোপ। কিন্তু জার্মানি প্রভৃতি দেশে এখনও অয়রোপা বলা হয় ইউরোপকে। রামচন্দ্র কেন ইউরোপে গিয়েছিলেন ? রামচন্দ্রকে দশরথ একদিন ডেকে বললেন, রামচন্দ্র। আমি শুনতে পাচ্ছি আমাদের পশ্চিম উপনিবেশে হূনম্যানগণ বড়ই অত্যাচার চালাচ্ছে। ওরা সংস্কৃতির ধার ধারে না, অপসংস্কৃতির চূড়ান্ত করছে। আসলে, জার্মানি

ইত্যাদি অঞ্চলের হ্নুনম্যান অর্থাৎ হ্নুন মানুষ থেকে হনুমান কথাটি এসেছে। এদের ল্যাজ ছিল না। ল্যাজ মানুষের কল্পনাপ্রসূত—অর্থাৎ, যেহেতু হ্নুনম্যান, বা কেবল হ্নুনরা এপ-সংস্কৃতিক, অর্থাৎ ওদের স্বভাব 'এপ' অর্থাৎ বানরের মতো, সেজন্য বানরের বৈশিষ্ট্য দেখানোর জন্য ওটি পরবর্তীকালে প্রক্ষিপ্ত বলে আমার ব্যক্তিগত ধারণা! 'এপ' সংস্কৃতি থেকেই অপসংস্কৃতি কথাটা এসেছে—এটা মানতে আশা করি পণ্ডিতদের অসুবিধে হবে না। দশরথ আরও বললেন, আমাদের উপনিবেশ রক্ষা ক্রমে আরও একটি কারণে অসম্ভব হয়ে উঠেছে, একদল জংলি আমাদের ভাল ভাল জিনিস ধ্বংস করছে। কিছু করতে গেলেই ভণ্ডুল করে দিচ্ছে। দশরথ বললেন, ঐ-সব ভণ্ডুল মানুষদেরও জব্দ করা চাই। এই মানুষদের বিশেষণ 'ভণ্ডুল' দেওয়ার পর কালক্রমে তাদের নাম উচ্চারণ কিংবা স্বরবিকৃতির ফলে ভ্যাণ্ডাল হয়েছে। কিন্তু রামচন্দ্রকে অরুপা-র দিকে পাঠিয়ে দিয়েই দশরথের দারুণ অনুশোচনা হল। ঐ বিপজ্জনক কাজে রামচন্দ্রকে পাঠিয়ে তিনি এমনই কাতর হয়ে পড়লেন যে তিনি আর মাথা তুলতে পারলেন না। কীভাবে এর মধ্যে প্রক্ষিপ্তভাবে ভরত, কৈকেয়ী, মন্থরা ইত্যাদির কথা এসে গেছে আজ আর তা খুঁজে বার করা সম্ভব নয়। দশরথ যখন রামচন্দ্রকে বন্-এ পাঠান তখন লক্ষ্মণ অযোধ্যাতেই ছিলেন না। তা ছাড়া রাজ পরিবারের কোন্ ব্যক্তি কী করল, কী বলল এসব গোপন কথা যে-সব রামায়ণে দেওয়া আছে সে-সব বাইরের লোকের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সে-কারণে রামায়ণের বহু কাহিনীই কাল্পনিক।

আসলে রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণ দুজনেই ছিলেন বিলাসী। এটাই সম্ভব। সমস্ত অযোধ্যা তখন ঔপনিবেশিক সম্পদে পরিপূর্ণ। রামচন্দ্রের নামই তো হয়ে গিয়েছিল রামবিলাস। একটি সুরার নামও—সে-কারণেই 'রাম' রাখা হয়। রাম যখন ইটালির রামনগর পত্তন করেন তখন তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল রামবিলাস, যা ইটালির ইতিহাসে দেখবেন একটু বিকৃতভাবে দেওয়া আছে রামিউলাস, বা রোমিউলাস হিসেবে। লক্ষ্মণকে আজও ইউরোপীয়রা লেখেন ল্যাক্সম্যান্, অর্থাৎ ঢিলেঢালা বা অগোছাল মানুষ। ল্যাক্স-ম্যান অর্থাৎ লক্ষ্মণের নামও লক্ষ্মণ হয়ত ছিল না। ইটালির লেক অঞ্চল মোরেনা, কোমো অঞ্চলে সম্ভবত লক্ষ্মণ বহুদিন কাটিয়েছিলেন আলস্যে এবং বিলাসিতায়। সে-জন্য রোমিউলাসের ভাইকে লেক্সম্যান বলা হবে কিনা এটাও পণ্ডিতদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। রামচন্দ্র বা রামবিলাসের ভাইয়ের নাম ছিল রেমুস। যমজ ভাই ছিলেন তাঁরা। এঁর কথা কোনও রামায়ণেই নেই। তবে ধরে নিতে হয় রেমুসই ছিল ল্যাকসম্যান, অর্থাৎ অলস মানুষ। রাম ছিলেন বিলাসী আর লক্ষ্মণ ছিলেন অলস। তবে রামচন্দ্র নিজে 'রোম' নাম দিয়েছিলেন কিনা এ নিয়ে ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলে আমি খুশি হব।

রামায়ণের প্রায় সমস্ত ঘটনাই ঘটেছিল অরুপায়, ভারতবর্ষে নয়, এটাই আমার বক্তব্য। এর প্রমাণ সর্বদা যে পুরাতাত্ত্বিকে প্রমাণে পাওয়া যাবে তা নয়—অনেক সময় পুরাতত্ত্বকে অমান্য করতে হয়, অতিক্রমও করতে হয়,—

বিশেষত যেখানে পুরনো কিছুর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও আমাদের পক্ষে সে-সব ধ্বংসাবশেষ নতুন তাত্ত্বিক কোণ থেকে বিচার করা অর্থ ও সময়সাপেক্ষ। সেই কারণেই সাহায্য নিতে হয় নদী, পর্বত, উপত্যকা, শহর, অন্যান্য স্থান এবং মানুষের নামের। তার আগে আমার রামায়ণের মূল বক্তব্য সেরে নিই। যখন রাম অরুপায় রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে যত্নবান হন তাঁর প্রথম কাজ হয় অরুপায় একটি রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা। ইটালির টাইবার নদীর মুখ থেকে সতেরো মাইল দূরের একটি জায়গা তাঁর পছন্দ হয়। সেখানেই তিনি রামরাজ্যের রাজধানী স্থাপনে যত্নবান হন। টাইবার নদীর নাম তখন কি ছিল বলা যায় না। অন্য নামই ছিল। নদীটির তীব্র স্রোত থাকায় নদীটির নাম তীব্র—যা অবাঙালি উচ্চারণে তীব্রা হতে পারে কিনা তা নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকেরা কিছু সময় অতিবাহিত করলে ক্ষতি কি?

ভাষাতাত্ত্বিকেরা সময় কাটাতে পারেন রোমানিয়া নিয়েও। ভারতীয়রা যে আত্মবিস্মৃত চিরকাল ছিল না তার প্রমাণ অনেক। তার মধ্যে একটি হতে পারে রামায়ণকে চিরস্মরণীয় করার জন্য রাম-পরবর্তী শাসকরা অরুপার একটি রাজ্যকে রামায়ণী নাম দিয়েছিলেন। সেই রামায়ণীই ক্রমে ক্রমে রোমানিয়া নামে পরিণত হয়েছিল কিনা কে জানে? এখানেই ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আব্দার ধরতে হয়, হে অতীত কথা কও! অতীত কথা বলে ঠিকই, কিন্তু সে ভাষা বড় দুরূহ। দুরূহ বলেই সেটিকে প্রমাণ বলা যায় না তা নয়। বিশ্বাসের উপরই তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। তবে রোমানিয়ায় যে ভারত সভ্যতা একদা বিরাজ করেছিল তার প্রমাণ আছে (রামচন্দ্রের আগে কিংবা পরে), কিন্তু তার আগে রাম যে প্রদেশে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন সেই প্রদেশের কয়েকটি ভাষাগত প্রমাণ দিই। ইটালির একটি উৎসব আছে, সেই উৎসবের নাম ইংরেজি অক্ষরে Ambar valia, এই উৎসবে চাষবাসের সাফল্য কামনা করা হয়। এর উচ্চারণ অম্বরভালিয়া। এটি হবে অম্বরবলী। অমর (Amor) ইটালির ভাষায় প্রেম। আর এটা তো জানা কথা যে প্রেম অমর। এই কথাটি ইংরেজিতেও এসে গেছে। ফরাসী ভাষাতেও এর দেখা মেলে। এগুলি কোনও আশ্চর্য বা আকস্মিক ঘটনা নিশ্চয়ই নয়। রাম যখন অরুপা দখল করেছিলেন তখন থেকেই বহু ভারতীয় ভাষা সেখানে চালু হয়ে গিয়েছিল—যার কিছু কিছু এখনও বর্তমান। এ-বিষয়ে আরও একটি প্রবন্ধ লেখার ইচ্ছে রইল, কেননা বিষয়টি বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ।

খুব সম্ভবত ভারতবর্ষ থেকে বাঙালিরা জার্মানির এলবে নদীর ধারে বসতি স্থাপন করেছিল, যেমন আজকাল বহু বাঙালি ভারতবর্ষের দণ্ডকারণ্যে স্থান নিয়েছেন। এই লোকদের নাম বলা হয় ANGLI. আসলে এটি বাঙালিই হবে। এই বাঙালিরাই পরবর্তী কালে ব্রতনাড়ু দ্বীপে গেলে তাদের নাম হয় আংলেই। যাদের পরবর্তী যুগের মানুষকে বলা হয় ইংলিশ কিংবা ব্রতীশ। ব্রতনাড়ু (নাড়ু যে ল্যাণ্ড বা দেশ তা তামিলরা জানিয়ে দিয়েছেন, Land= লাঁড়=নাড়ু এভাবেই বাক্যটির বিবর্তন হয়েছিল ধরে নিই।) এই দ্বীপেই দেখা

মেলে রামস্‌গেট, অর্থাৎ রামস্যগত—যে তোরণ দিয়ে রাম গতায়াত করতেন। গত থেকেই গেট কথাটি এসেছে। ওয়েলস-এর নিকটে আজও পাওয়া যাবে রামসে দ্বীপ। এ-সব আকস্মিক যোগাযোগ নয়। ঐ দ্বীপে রামচন্দ্র কখনও ছিলেন, অথবা তাঁকে সম্মান দেখানর জন্য ঐ নাম দেওয়া হয়। কেবল ওয়েলস নিকটবর্তী একটা মাত্র রামসে থাকলেও সন্দেহ কিছু থাকতেও পারত, আকস্মিক ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু ঐ একই নামের জায়গা রয়েছে আইল অফ ম্যান-এও! এবং ইংল্যাণ্ডের হান্টিংডন-এও। রামচন্দ্র তৎকালীন জনমানসে যে কি বিরাট প্রভাব ফেলেছিলেন তার আরও প্রমাণ রয়েছে। ইংল্যাণ্ডের ল্যাংকাশিয়ারের (এর উচ্চারণ নিয়ে পরে বলছি) একটি জায়গার নাম এখনও র‍্যামসবটম। কথাটির অনুবাদ কিছুটা অশ্লীল মনে হতে পারে বলে এখানে দিলাম না, গুণিজন বিষয়টি বুঝে নেবেন। তবে ভেড়াকে কেন **Ram** নাম দেওয়া হয়েছিল সেটা বলা মুশকিল। কেবল যে ইউরোপের প্রধান ভূমিতে রাম নাম ছড়িয়ে রয়েছে তা নয়। ফ্রান্সে একটি জায়গার নাম রয়েছে তার নাম রাম্বারভিলিয়া। এটি যে রাম সম্পর্কিত (রামের বিল?) সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ! এ ছাড়া পূর্ব সিসিলি দ্বীপে রয়েছে রামাক্কা। এটি আমার মনে হয় 'রামকা' কথাটি থেকে পরবর্তী বিকৃতি। ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা একদা অরুপা অধিকার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বাঙালি, তামিল, ওড়িয়া, উত্তরপ্রদেশীয়, অহম এঁরা সকলেই কিছু না কিছু সংখ্যায় ছিলেন।

ফ্রান্সে দেখা যাচ্ছে রয়েছে রামবুলিয়ে। অর্থটি পরিষ্কার—রাম বলিয়ে। অর্থাৎ রামনাম করো! ডেনমার্কের একটি শহর এখনও রামের নামে রয়েছে, রাম্মে। আর রামায়ণীর দেশ—রোমানিয়াতে সন্ধান পাবেন রামনিচু ভালচিয়া এবং রামনিচু শরৎ। এখানে স্পষ্টতই রামকে কিছু হেয় করা হয়েছে, যে কারণেই হক। এই শব্দগুলির কি অর্থ তা পুরো না জানলেও এটা নিশ্চয় অনুমান করাটা অন্যায় হবে না যে এ-সমস্তই রাম সম্পর্কিত। এ ছাড়া আরব দেশেও রাম-এর পরিচয় রয়েছে রামলেখ এবং ইজরায়েলে রয়েছে রামলে। উদাহরণ আরও আছে।

স্কটল্যাণ্ডে পুরোপুরি রাম বলেই একটা জায়গা রয়েছে। খুঁজলে এরকম আরও অনেক নামই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

কেবল রামের নাম থেকেই অরুপায় রামের প্রভাবের প্রমাণ করা যায়—কিন্তু ভারতীয় প্রভাব দেখাতে গেলে আরও প্রমাণ যখন রয়েছে তার কিছু কিছু দেখানো যেতে পারে।

যুগোস্লাভিয়ার একটি জায়গার নাম Monastir (মনস্থির?), ডেনমার্কে রয়েছে Mon (মন), সুইজারল্যাণ্ডে আমার এক শ্যালিকা বাস করতেন, সে জায়গাটির নাম MONTREAUX (মন্ত্র), এমনকি স্পেনেও রয়েছে মন্ত্র নামের একটি জায়গা। ইটালিতে রয়েছে মনডোবি বা মাণ্ডবী। একটা বড় শিল্প-নগর রয়েছে তার নাম মিলান (মিলন?), ঐ দেশেরই আর একটি জায়গার নাম মানতুয়া (পানতুয়া?), নরওয়েতে মণ্ডল শহর, আবার ইটালিতে

দেখছি Mon ferrato. মন ফেরাতো। এসব নাম কি ভারতীয় নয়? আকস্মিক উড়ে এসে জুড়ে বসা? কে এর উত্তর দেবে? যুগোস্লাভিয়ায় রয়েছে মিত্র ভিচা, ইংল্যাণ্ডে মন্মথ, আর ফ্রান্সের Normandy-কে তো নরমুণ্ড স্পষ্ট কোনও বড় রকমের যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। তা ছাড়া নরম্যান কথাটিও ভেবে দেখবার মতো নর+ম্যান। নর কথাটি সংস্কৃতে মানুষ। আবার ম্যান কথাটি 'মানুষ'-এর পরিবর্তিত রূপ ধরে নেওয়া যায়। যাতে সংস্কৃত এবং বাংলা একই সঙ্গে শেখা যায় সেজন্য নরমান কথাটি ফ্রান্সে চালু করা হয়। এরকম মিশ্রিত কথা আরও আছে যেমন Song+গীত= সংগীত। বাংলা 'হারমানি' ইংল্যাণ্ডে সেটাই হারমনি। 'হার স্বীকার করলাম' অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল এ অর্থ এখনও আছে। সম্ভবত জার্মানি কথাটাও এসেছে 'হারমানি' থেকে। কিন্তু এ প্রমাণ কে করবেন? আমি বাংলার প্রভাবই দেখতে পাই নিজে বাঙালি বলে। অন্য রাজ্যের লোকেরা নিশ্চয় অন্য প্রমাণ পাবেন। এই প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক একটি অতি কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ এখানে পরিবেষণ করি—ইংরেজি ভাষার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় তামিল ভাষার আশ্চর্য সাদৃশ্যের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বেশি মন্তব্য করতে চাই না, তথ্যই প্রমাণ করবে আমার কথার সত্য অথবা মিথ্যাত্ব। স্কটল্যাণ্ডে রয়েছে বড়দিন (Aberdeen), বড় দৌড় (Aberdown), ওয়েলসে 'আবার গেলে' (Abergele), চিশায়ার-এ 'অলসগড়' (Alsager), স্কটল্যাণ্ডে অঙ্কুশ (Angus), অনন্য (Annan), বীরনাম (Birnam), মুল (Mull), হারাণ (Arran) সাসেক্স-এর নদীর নাম অরুণ, শহর অরুণদল (Arundel), ইংল্যাণ্ডের ডার্বিতে রয়েছে Ashbourne (অসবর্ণ ? আশাবরণ ?), আয়র্লাণ্ডের বীর (Birr), কর্নওয়ালের নদী ফল (Fal), চিশায়ার-এর হুল (Hoole), সাউথপোর্টের হাল (Hull), হাম্বা (Humber), হনুমানবাই (Hunmanby), মঞ্চেশ্বর (Manchester)। লক্ষ্মণের নামে একটি হ্রদ রয়েছে, লখনেস্ (লক্ষ্মণেশ), ইয়র্কশিয়ার-এ রয়েছে নর্তন (Norton), ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডে রয়েছে সাপ (Shaap), ডার্বিতে রয়েছে স্পন্দন (Spondon), ডারহামে রয়েছে সুন্দরবন! অবশ্য লেখা হয় Sunderland। সারে-তে রয়েছে সুরবিতান (Surbition)। সারে (Surrey) কথাটাও সারে নয়, সুরিয়া, বা সূর্য বলেই আমার মনে হয়। এই প্রসঙ্গে (স্মরণীয় সা-রে জাহাঁসে আচ্ছা!) আর গ্রীসের SYRA, নিশ্চয় শির কিংবা সেরা।

আপনারা এ-সমস্তই মোটামুটি একটি ভাল মানচিত্রে দেখতে পাবেন। বেলজিয়ামে পাবেন Torhout (ত্রিহুত ?), পোলাণ্ডে পাবেন তরুণ, ফ্রান্সে পাবেন তুলোঁ (আসলে তুলো হবে, কিন্তু অনেকের অযথা চন্দ্রবিন্দু দেওয়া অভ্যেস! বেলজিয়াম কথাটির মধ্যেও দুটি ভারতীয় ফলের সন্ধান পাবেন, আর অস্ট্রিয়াতে পাবেন গ্রাণ নদী। অস্ট্রিয়া কথাটাই তো অস্ত্র থেকে এসেছে। ইটালির পিডমণ্ট-এ রয়েছে তৃণ। মস্কোর দক্ষিণে রয়েছে তুলা। এবার দেখুন

রোমানিয়ায় পাওয়া যাচ্ছে Tulcea (তুলসি=তুলচি), বেলজিয়ামে তরুণ হাট (Turnhout)। উষা পাবেন রাশিয়ায়, ফ্রান্সে পাবেন উষান্ত। এ-সব কি সবই মিথ্যে, নাকি কাকতালীয় ? জানেন কি নরওয়ের মধ্যে আছে বরানগর ? (Varanger), বেলজিয়ামে বর্ণা। এটাও ভেবে নেওয়া অন্যায় হবে না রামের রাজধানী রোম নগরীর মধ্যে যে ভাটিখানা ছিল কালক্রমে তা পরিবর্তিত হয়ে ভ্যাটিক্যান হয়েছে। ইটালিতে রয়েছে Viterbo (বিদর্ভ ?), ফ্রান্সে ভৈরঁ (Voiron) ফ্রান্সের পাহাড়ের নাম ভোজ, সুইজারল্যাণ্ডে বেঙ্গেন বা বঙ্গেন অর্থাৎ বঙ্গ সম্পর্কিত।

বিশু বিশ্বাস নামক কোনও বাঙালির নামেই যে আগ্নেয়গিরির নাম হয়েছে ভিসুবিয়াস এ বিষয়ে ক-জনের সন্দেহ হতে পারে আমার জানা নেই। মনে হয় বিশু বিশ্বাস খুবই প্রতাপশালী কেউ ছিলেন, পরে তাঁর পতন হয়। এবং তাঁর মুণ্ডু কাটা যায়। এর প্রমাণ পেতে পারেন জার্মানির ব্রেমেনে Wesermunde (বিশের মুণ্ডু ?)-তে। অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন ভিসুবিয়াস কথাটির মূলে রয়েছে বিষম ভস্ম। পোলাণ্ডে রয়েছে জাগান (Zagan), গ্রীসে জানতে (Zante) এবং সুইজারল্যাণ্ডে যুগ (Zug)।

আমার কাছে একটি বড় তালিকায় আরও চিন্তা যোগানোর মত প্রভৃত নাম আছে। তবে একটি কথা আমার নিবেদন করার আছে। অরূপা মহাদেশে রামের নামের যেরকম প্রচার হয়েছিল, সেরকম বা হয়ত তার চাইতেও বেশি প্রচার হয়েছিল বালীর। বালীর যথেষ্ট ক্ষমতাও ছিল। পুরাণে পাই, বালী একদা রাবণকে জড়িয়ে ধরে এক লাফে আকাশে উঠে একে একে চার সমুদ্রে সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করে নিজের রাজ্য কিষ্কিন্ধায় ফিরে আসেন। বালী এবং সুগ্রীবের কাহিনী আমরা জানি। কিভাবে রাম বালী বধ করেন তা রামায়ণেই লেখা আছে। রামচন্দ্র যতই জনপ্রিয় হন না কেন, তাঁর এই কর্ম সে-কালে অনেকেই পছন্দ করেননি। হয়ত সেই কারণেই বালীর প্রতি সমর্থন জানাতে বালী স্মৃতিতে বহু নগর ইত্যাদির নাম বালীর নামে দেওয়া হয়েছে। এবং এটাও বোধ হয় ঠিক যে বালী ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের (আবীরনন্দ ?) লোক, কেননা আয়ার্ল্যাণ্ডেই বালীর নাম বেশি দেখা যায়। প্রমাণ স্বরূপ এখানে কতকগুলি নামের উল্লেখ করছিঃ বালী লেক, বালী ক্যাস্‌ল, বালীকটন, বালীমনা ইত্যাদি। আয়ার্ল্যাণ্ডের ডোনেগালে রয়েছে বালীস হনন (Ballys hannon)। বালীকে যে হত্যা করা হয়েছিল সেটি এইভাবেই চিরকাল স্মৃতিতে রাখার এই চেষ্টা কোনও সৎ গবেষকের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

অলবানিয়ায় রয়েছে 'বিরাট' নামাঙ্কিত স্থান। সম্ভবত বিরাট রাজার স্মৃতি জাগিয়ে রাখতে। অলবনিয়ায় লবণ পাওয়া যেত না, তা থেকেই সম্ভবত ঐ নাম। স্পেনে রয়েছে বেজার, ইজরায়েলে রয়েছে বীরসেবা, স্পেনে রয়েছে আদ্র (Adra) আর ইটালিতে বহু বাঙালি গিয়েছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় উত্তর ইটালির শহর 'আড্ডা' নাম থেকেই। ইউরোপে গিয়েও আর কোন্ জাত আড্ডা দেবে ? আর বাঙালিরা অঙ্কনপ্রিয় হওয়ায় সম্ভবত ইটালির

একটি শহরের নাম অঙ্কন এখনও রয়ে গেছে। Adriatic Sea আসলে আদ্রঅতিক সমুদ্র—এ যে কেউই বুঝতে পারবেন।

আরও একটি রাম খুঁজে পাওয়া গেল। জার্মানির একটি দ্বীপের নাম দেখা যাচ্ছে আমরাম (Amrum)।

এগুলিই আমার ভূমিকা। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দেওয়া আপাতত আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তার বদলে যে ভাষার প্রমাণ দাখিল করলাম তা থেকে পণ্ডিতেরা কি সিদ্ধান্ত নেবেন জানি না, তবে আমার মনে হয় না যে দু-রকম সিদ্ধান্ত হওয়া সম্ভব। এবার আসি আমার রামায়ণের আরও কয়েকটি ব্যাপারে। আপনারা জানেন রামচন্দ্র এসেছিলেন বন্-এ। সেটি যে জার্মানিতে তা কে না জানে ? এবারে আসা যাক আরও একটি প্রমাণে। বাল্মিকী যে তমসার তীরে বসে রামায়ণ লিখেছিলেন সেটা Thames ছাড়া কিছু হতে পারে না। এ ছাড়া লণ্ডন শহরটাও 'নন্দন'-এরই পরিবর্তিত রূপ। আপনারা জানেন নলেন গুড় কিভাবে ললেন গুড়ে রূপান্তরিত হয়। আর লঙ্কা 'দ্বীপ' কখনই ছিল না। ওটা বহুদিনকার প্রচলিত ভুল। লঙ্কেশ্বরের আধুনিক নাম ল্যাংকাশিয়ার এটা প্রমাণ করার জন্য খুব চতুরতার প্রয়োজন হবে না। আরও একটি মত শীঘ্রই প্রচলিত করা যেতে পারে যে ইংল্যাণ্ডে যে সব শিয়ার অথবা শায়ার আছে সেগুলি ঈশ্বর-এর উচ্চারণ ভেদ। এই ভাবে আরগিলশিয়ার হবে অর্গলেশ্বর, শ্রপশিয়ার বা শ্রপেশ্বর (সম্ভবত সর্পেশ্বর), হ্যাম্পেশ্বর (হ্যাম্পেশিয়ার-এই 'হ্যাম্পে' কথাটি কোন্ ভারতীয় কথা থেকে এসেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না), ওয়ারউইকশিয়ার যে বারিকেশ্বর সে বিষয়ে সন্দেহ কিছুমাত্র থাকা সম্ভব নয়। যেমন তারকেশ্বরকে অনেক সাহেব বলতেন টারকশিয়ার, এ আমার নিজের কানে শোনা! দক্ষিণেশ্বরকে বলতেন ডেকিনেশিয়াব! এ-সমস্ত প্রমাণ তুচ্ছ বলি না। বরাক উপত্যকার মানুষেরা ইংল্যাণ্ডে পৌঁছে যে জায়গায় ঘাঁটি গেড়েছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন বরাকেশ্বর, সেটির নাম এখন বার্কশিয়ার। আবার মতভেদে এটাও বলা যায় যে আসলে বরাকরের মানুষেরাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বরাকরেশ্বর। আরও কত যে নাম বৃটেনে ঈশ্বর দিয়ে শেষ হয়েছে তা কেবল ভগবানই জানেন! এ-সব নিয়ে রীতিমত গবেষণা হয়নি বলেই এই মত প্রতিষ্ঠিত হয়নি, চেষ্টার ত্রুটি রাখলে চলবে না। এই সঙ্গে মনে পড়ে গেল চেষ্টার কথাটি কি ভাবে বৃটেনে গিয়ে স্থায়ী হয়েছে, চেষ্টারফিল্ড, চেষ্টারটন ইত্যাদি নামেই তার প্রমাণ মিলবে। ইংরাজ কথাটাও এসেছে অঙ্গরাজ্য থেকে!

কথায় কথায় অনেক দূর এসে পড়লাম। এবারে রাবণের কথায় আসা যাক। রাবণের নাম ছিল দশশির। দশশির-এর অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু রাবণ কথাটির অর্থ আমাদের পুরাণে যা করা হয়েছে তা সঙ্গত নয় বলেই ঐতিহাসিকেরা নিশ্চয় একদিন প্রমাণ করবেন। আসলে বন ছিল লঙ্কাশ্বরের তালুক। জার্মানি বলতে এখন যা বুঝি তা ছিল রাবণের অধিকারে। জার্মানির নামও তখন জার্মানি ছিল না, ছিল জামদাগ্ন্য। জামদাগ্ন্যই কালক্রমে বিকৃত

উচ্চারণে জার্মানিতে রূপান্তরিত হয়। এটাই স্বাভাবিক, কেন না জার্মানি কথাটার কোনও অর্থ হয় না, সংস্কৃত বা বাংলা অভিধানে এই নামটিই অনুপস্থিত ! তবে 'যমারণ্য' কথাটিও এই প্রসঙ্গে ভেবে দেখা যেতে পারে। বন রাবণের তালুক ছিল বলেই বন-রাজ বন-এর রাজার নাম দেওয়া হয় 'রা' বন। রা কথাটার অর্থ যে সূর্য তা প্রাচীন মিশরীয় বিবরণে পাওয়া যায়। সূর্যের অপর অর্থ রাজা বললে সেটা খুব অন্যায্য হয় কি ?

রাম রাবণকে তুমুল (tumultous) যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন, কিন্তু সে যুদ্ধ কিভাবে শুরু হয়েছিল তা বলার আগে জানিয়ে দিই, অরূপায় রাবণকে অতি সম্মানের আসনেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কয়েকটি প্রমাণ এখানে দিচ্ছি ঃ

ইংল্যাণ্ডের মানচিত্রে এখনও দেখতে পাবেন Ravenglass রাবণগ্রাম কথাটি থেকে পরবর্তীকালে রেভেনগ্লাস কথাটি এসেছে নিশ্চয় ! এ-ছাড়া ইটালিতে রয়েছে Ravenna (রাবণ), জার্মানিতে রয়েছে রাবণসূবুর্গ (Ravens burg). আর কে না জানে যে আসল কথাটা রাবণস্যপুর, পুরই যে Burg এ বিষয়ে বর্তমান ভাষাচার্যরা তাঁদের সুচিন্তিত মত দিয়েছেন। স্কটল্যাণ্ডে রয়েছে রাবণস্যকর (Ravenscraig), বক্রেশ্বরে (Yorkshire) রাবণস্যথর্প (Ravensthorpe)। এই 'থর্প' ব্যাপারটি বিলাতি অভিধানে দেওয়া আছে কয়েকটি বাড়ি নিয়ে গ্রামের বসতি। পুরো অর্থ হবে রাবণের বসতি। রাবণের স্মৃতি রক্ষার জন্য গ্রামবাসীরা ঐ নাম দিয়েছিলেন এটাই ধরে নিতে হবে। যেমন উল্টাডাঙার নাম রাখা হয়েছে বিধাননগর, সেই রকম আর কি ব্যাপারটা।

আর কচকচি নয়। রামায়ণের গল্পে আসি—কিন্তু প্রতিপদে নতুন নতন নামের ব্যাখ্যা দিতে দিতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা এতক্ষণ যাঁরা ধৈর্য ধরে পড়েছেন তাঁদের আরও একটু ধৈর্য ধরতে অনুরোধ জানাই। আশা করি এর পর যা বলব সে-জন্য আপনারা একটু মানসিকভাবে প্রস্তুত হবেন। দুর্বল মন যাঁদের তাঁরা এখানেই ইতি টানতে পারেন, আর যাঁদের দুর্বল হৃদ্‌যন্ত্র তাঁরা উপযুক্ত ওষুধপত্র হাতের কাছে রাখুন।

আপনারা জানেন, রামের বিবাহিতা পত্নী সীতাকে রাবণ চুরি করেছিলেন। চলতি রামায়ণে এটাই লেখা আছে বটে। এটা হাজার হাজার বছরের বিশ্বাস। এ-বিশ্বাস খণ্ডন করা আমার সাধ্য নয়। আসল ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্য।

জনক রাজার কন্যা সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের বিয়ের সম্পর্ক হয়, এটাই সম্ভবত ঠিক কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবাহ হয়নি। বিবাহের সমস্ত যখন প্রস্তুত তখন অপরূপা থেকে খবর এল সেখানে রাবণ রাজা খুবই প্রবল অত্যাচার করছেন, এবং প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে দশরথের সাহায্য প্রার্থনা করাতে দশরথ নিজেই রামচন্দ্রকে বলেন বন-অঞ্চলে গিয়ে রাবণকে হটিয়ে দিতে। এ-জন্য যত সময় লাগে লাগুক কুছ পরোয়া নেহি। কৈকেয়ী, মন্থরা ইত্যাদি এবং দশরথের আদেশে রামের চৌদ্দ বছর বন-বাসের কথাটা পরবর্তীকালের

রটনা। আসলে রামের রাম শহর (রোম) পত্তন করতে এবং সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ করতে সময় লেগেছিল। রামকে সাহায্য করেছিল হনুমান, যে উপজাতিকে রামায়ণে বিনা কারণে ল্যাজ লাগিয়ে হনুমান করা হয়েছে। এছাড়া একদল এপ জাতির মানুষও ছিল, যাদের নিজস্ব পতাকা (Banner) ছিল, তাই তাদের একটি নাম ছিল ব্যানারম্যান। ঐ উপজাতিরই নাম ছিল এপ। ওরা এর বাড়ি ভাঙত, ওর বাড়িতে আগুন লাগাত বলে চারিদিকে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। এপ অর্থই হয়ে গিয়েছিল খারাপ। এপ-এর অন্য রূপ 'অপ' এবং এপ-এর যে সংস্কৃতি তাকেই বলা হত এপ-সংস্কৃতি বা পরবর্তীকালে যা হয়েছে অপ-সংস্কৃতি ! কালা পাহাড়-এর নাম থেকে যেমন হয়েছে কালাপাহাড়ি।

রোম নগর প্রতিষ্ঠার পর রাম হনুমান এবং বানর সৈন্য নিয়ে বন-এ যাত্রা করেন। সেখানে তিনি একটি বড় খাল কাটার জন্য বহু কুলি এবং কামিন নিযুক্ত করেন। কামিন মানে যারা বিনা অনুমতিতে ভেতরে আসতে পারত। অর্থাৎ সর্বদাই যাঁদের বলা হত Come in ! ইংল্যান্ডের শ্বেত চর্ম বিশিষ্ট নারীদেরও রাম এই কাজে লাগিয়েছিলেন। একটি কামিনী ছিল অতি সুন্দরী যাঁর নাম ছিল শ্বেতা। সীতার সঙ্গে নামটির আশ্চর্য মিল, এবং পরে রামের সঙ্গে তার মনের মিল হওয়াতে দুজনের গন্ধর্বমতে বিবাহও হয়। সেটি গোপনই থাকে। কিন্তু রাবণেরও ঐ একই নারীর প্রতি দুর্বলতা হয় এবং রাবণ যখন বুঝলেন কিছুতেই শ্বেতাকে তাঁর দখলে আনতে পারবেন না তখন তিনি তাকে হরণ করেন। একটি বৃটিশ মেয়ের নাম শ্বেতা কেমন করে হয় সে উত্তর দেওয়ার আগে পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ; স্টালিনের মেয়ের নাম শ্বেতলানা-ই বা হয় কেমন করে ? ঐ একই নিয়মে বৃটিশ মেয়ের নামও শ্বেতা হয়েছিল। এর পরবর্তী ইতিহাস রামায়ণে দেওয়া আছে। তবে সর্বদাই সীতার জায়গায় শ্বেতা পড়তে হবে। মাটির ভেতর থেকে সীতার জন্ম হয়েছিল সেটি অতি সাধারণ বুদ্ধির মানুষও স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না। আসলে শ্বেতা ছিল মাটিকাটানি, তবে মেমসাহেব বলে রামের তাঁর প্রতি দুর্বলতা স্বাভাবিক। বহু ভারতীয় পণ্ডিত এবং বহু মূর্খ নীচ মেমসাহেবকে আজও বিবাহ করে থাকেন, আপনারা হয়ত দেখেছেন। অতএব রামচন্দ্র এমন কিছু অভারতীয় কর্ম করেননি।

আরও একটি কথা। রামচন্দ্রের মেমসাহেব বিয়ের সংবাদ পেয়ে প্রাচীনপন্থী অসুস্থ দশরথের হৃদ্‌রোগ হয়। তারই ফলে, এবং বয়সের ভারে দশরথের মৃত্যু হয়। সীতাও নিজের গায়ে কেরোসিন কিংবা পেট্রোল ঢেলে পুড়ে মারা যান। বেচারা সীতা ! রামচন্দ্রের মত লোক তাঁর প্রতি এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন তা তিনি ভাবতেও পারেননি। অবশ্য সে-সময়ে এটিকে বিশ্বাসঘাতকতাও বলা যায় না। রামচন্দ্র একাধিক বিবাহ করলেও কেউ তাঁকে ঠেকাতে পারত না। ঐ সময়ে সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, তা তাঁর পিতার কর্মেই প্রমাণিত। আসলে রাম প্রায় চৌদ্দ বছর দেশে ফেরেননি, সীতার মনোকষ্টের সেটাই প্রধান কারণ বলে আমার মনে হয়। সীতা অতি অভিমানী এবং চমৎকার নারী

ছিলেন। তিনি রামের জন্য বহু বছর অপেক্ষা করে ছিলেন। পরে রামচন্দ্র মেম বিয়ে করে আনাতে তিনি ভয়ংকর রকম বিচলিত হয়ে পড়েন। এবং মনের দুঃখে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে মারা যান। সীতার অগ্নি পরীক্ষা বলে রামায়ণে যা বলা আছে তাও সম্ভবত ঠিক নয়। ওটা প্রক্ষিপ্ত হওয়ারই সম্ভাবনা।

এখানে অনেকেই আপত্তি তুলবেন একথা বলে যে সেই কোন্ মান্ধাতার আমলে কেরোসিন কোত্থেকে আসবে? এর উত্তর এক কথায় দেওয়া যায়, কিন্তু দেব না—কেননা, এক কথা বললে কেউ বিশেষ পাত্তা দেন না। তাই বলি, নারদ মুনি যে ঢেঁকিতে চড়ে দেশ দেশান্তরে যেতেন সেটাতে কি জ্বালানি ব্যবহার হত? রাবণ যে বিমানে করে সীতাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বলা হয় সেটিই বা চলত কেমন করে? পুষ্পক রথ কিসে চলত? হনুমান যে লাফিয়ে লাফিয়ে হাজার হাজার যোজন পার হয়ে যেতেন সেটি ক-জনে এই আধুনিক যুগে বিশ্বাস করবে? হনুমান (যদিও সঠিক কথাটি কি আগেই বল হয়েছে) নিশ্চয় কোনও ব্যোমযান ব্যবহার করতেন, যা চলত কেরোসিন কিংবা পেট্রোলে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? অতএব সীতা যে লিটারখানেক কেরোসিন সংগ্রহ করতে পারবেন সেটা খুব একটা অন্যায় অনুমান নয়। কিন্তু সেটি বড় কথা নয়—তিনি কেরোসিন ব্যবহার করতে পারেন, পেট্রোল ব্যবহার করতে পারেন এবং সোমরস সার অর্থাৎ স্পিরিটও গায়ে লাগিয়ে আগুনে পুড়তে পারেন। এটাও তেমন কথা নয়—কিন্তু রামচন্দ্র যা করেছিলেন তা কি সম্ভব ছিল? রাম কি মেম বিয়ে করতে পারতেন, সেটা কি সম্ভব ছিল তাঁর মত চরিত্রের পক্ষে?

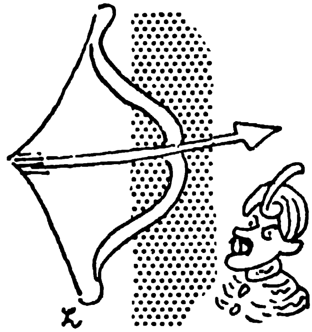
তাহলে একটু কথা বলতেই হয়। রাম যখন বন-এ ছিলেন তখন প্রথম দিকে সীতার জন্য তাঁর মন উতলা হয়েছিল ঠিকই। বিবাহ না করেই তিনি বিরহে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। বিবাহিত স্ত্রীর জন্য বিরহ যত তীব্র হতে পারে বিবাহ যাঁর সঙ্গে হওয়ার কথা তাঁর জন্য বিরহ আরও তীব্র হতে পারে, অন্তত রামের বেলায় তাই ঘটেছিল মনে করা যেতে পারে। একজন প্রসিদ্ধ রামায়ণকার রাজকুমার বসু প্রায় ৯০ বছর আগে মন্তব্য করেছিলেনঃ "রামচন্দ্র পত্নীপ্রেমে একেবারে ডুবিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পত্নীবিরহে একেবারে আত্মহারা হইলেন। ইহাকে প্রেমের বিকার বলা যাইতে পারে। পত্নীবিরহে তাঁহার প্রেমভাব বিকার প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি ক্ষণকালের জন্য আত্মহারা হয়েছিলেন। ইহা কিছু স্ত্রৈণ ভাবের লক্ষণ।"

এই বিকারের সময় যদি তিনি সীতার কাছাকাছি নামযুক্তা কোনও কুমারী মেমকে বিবাহ করেছিলেন একথা বলা যায় তাহলে খুব অন্যায় হয় না। তা-ছাড়া বয়সের চরিত্র এমনই যে তিনি কখনই এমন কর্ম করতে পারেন না যাঁরা বলেন, তাঁদের জানাই আর একটি রামায়ণী ভাষ্যের কথা। এটি আমাদের উপহার দিয়েছেন পণ্ডিত সুকুমার সেন। তিনি একটি জার্নালে অন্য একটি রামায়ণী ভাষ্যে দেখিয়েছেন যে সীতা হরণ ব্যাপারটি চলতি রামায়ণে যা আমরা দেখতে পাই তা মোটেই ঘটেনি। পুরনো শক ভাষায় যে রামায়ণের

কিছু অংশ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে পাঠানই হয়নি। পরশুরামের হাত থেকে বাঁচানর জন্য রাম এবং লক্ষ্মণকে পাতালে লুকিয়ে রাখা হয়। সে-সময় শিকারে গেলে রাম এবং লক্ষ্মণ একসঙ্গে এক মুনি কন্যার প্রেমে পড়ে যান। এই মুনি ছিলেন স্বয়ং পরশুরাম—যিনি আবার ছিলেন দশরথের শত্রু। বিশদ বর্ণনায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই, শেষ পর্যন্ত রাম সীতাকে বিবাহ করে অযোধ্যাতে ফেরার সময় পরশুরাম (তাঁর কন্যা জানকী বা সীতাকে জনক রাজার হেফাজতে রেখেছিলেন) মনে করলেন রাম সীতাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন। এই মনে করে পরশুরাম তাঁর পথ রোধ করেন।

এখানে একটি বিষয় দ্রষ্টব্য। রামের চরিত্র এ থেকে পরিস্ফুট। রাম যদিও সীতাকে বিবাহ করেই নিয়ে যাচ্ছিলেন তবু বিষয়টি কেউই জানত না। এমনকি সীতার পিতা পরশুরামকে (উক্ত রামায়ণ অনুসারে) পর্যন্ত জানানোর প্রয়োজন রাম অনুভব করেননি। পরশুরামও মনে করলেন রাম এমন কাজ করেছে! অর্থাৎ, রামের যা চরিত্র তাতে তাঁর পক্ষে নারী হরণ সম্ভব! তা যদি হয় তাহলে বন-বাসী মেম সাহেবকে রাম গন্ধর্বমতে বিবাহ করবেন এটা খুব অসম্ভব কর্ম নয় বলেই মনে করা যেতে পারে। এই ঘটনা থেকেই রামের চরিত্রের একটি দিক স্পষ্টভাবে জানা যায়।

যাই হোক, আমার রামায়ণই যে চূড়ান্ত বা সঠিক এটা আমার নিজেরও মনে হয় না। এর মধ্যে অনেক ফাঁক-ফোকর রয়ে গেছে, যেমন রামের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ। অনেক কথা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা মনে হয়েছে বলে গেছি। তবে রামায়ণের এই কাহিনী যে বৈপ্লবিক, এবং আমারই সেটা মেনে নিতে কারুর আপত্তি হবে না।



রামায়ণে বাক্যবাণ

রামায়ণের সাংঘাতিক যুদ্ধে কত বাণ বর্ষণ হয়েছিল তার হিসেব কেউ করেছেন কিনা কে জানে—কাজটা যে দারুণ দুরূহ তাতে সন্দেহ নেই। "দুজনে দেখিয়া বাণ যোড়ে দুই জনে।/দুজনে পড়িয়া ঢাকা দুজনের বাণে॥/চারিদিকে পড়ে বাণ নাহি লেখাযোখা।/দুই জনে বাণ ফেলে যার যত শিক্ষা॥/দুজনে বরষে বাণ দুজনে প্রধান।/বাণের তরাসে রাত্রিদিন নাহি জ্ঞান॥" কৃত্তিবাসের রামায়ণে স্পষ্টই লেখা রয়েছে, নাহি লেখাযোখা, আর যা লেখাযোখা নেই তার হিসেব করবে কে? কিন্তু যুদ্ধে ব্যবহৃত বাণ ছাড়াও আর একরকম বাণে রামায়ণ ছেয়ে আছে, সতর্ক পাঠকেরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন রামায়ণে প্রভূত পরিমাণে বাক্যবাণ রয়েছে। এ হিসেবও ঠিকমত লেখাযোখা নেই, তবে আভাস রয়েছে, ইঙ্গিত রয়েছে, আবার স্পষ্টাক্ষরেও অনেকটাই লেখা আছে। আমি একটি রামায়ণ খুলে হিসেব নিতে গিয়ে দেখি এও এক গন্ধমাদন!

প্রথমেই চোখে পড়ে রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বলছেন, ছুঁসনে পাপিনি তুই শরীর আমার।/ছায়াও স্পর্শিতে তোর, নাহি চাহি আর॥" এই বাক্যবাণ এখানেই সম্পূর্ণ নয়। এরপরও আছে, তবে সর্বদা ছন্দে এখানে দেওয়া যাচ্ছে না। এরপর দশরথ কৈকেয়ীকে বলছেন দুষ্ট, পাপ-হৃদয়, ধনলুব্ধ, পিশাচী, ধর্মহীনা, দুঃশীলা, রাক্ষসী! নিজের স্ত্রীকে রাজার শ্রেষ্ঠ দশরথ যে-ভাবে বাক্যবাণ বর্ষণ করলেন তা নিতান্তই ঘরোয়া কোঁদল। কিন্তু আমাদের এইটেই সুবিধে আমরা সে কোঁদলের স্বাদ এই কত বছর পরও পূর্ণানন্দে গ্রহণ করতে পারি। তবে দশরথও বাক্যবাণ থেকে রেহাই পাননি। বাক্যবাণ যিনি ছুঁড়েছিলেন তিনি স্বয়ং রাম! তবে রামের বাক্যবাণ সরাসরি নয়, সামনা-সামনি নয়—বনে গিয়ে তাঁর আক্ষেপ। তিনি পিতাকে বৃদ্ধ বলেছেন। বলেছেন, "...কামের অনুরোধে মহীপতি, কৈকেয়ী দেবীর হয়ে বশবর্তী অতি॥" তিনি বলেছেন দশরথের মতিভ্রম হয়েছে। রামচন্দ্র ভরতের উপর হিংসেও করছেন। স্পষ্ট লেখা আছে—তবে সে অন্য কথা। দশরথ যেমন

কৈকেয়ীকে গাল দিয়েছেন, তেমনি রামচন্দ্রও বনে গিয়ে বলেছেন, "কৈকেয়ী রানী ঘোর নীচাশয়।" কৈকেয়ী অন্যায় আচরণ করেছেন, এমনকি কৈকেয়ী কৌশল্যাকে বিষ পান করিয়ে মেরে ফেলতে পারেন সে ইঙ্গিতও করেছেন।

রামচন্দ্রকে যখন ঋষি জাবালি বলেন, "পিতা-মাতা কেউ কারো নয়, তবে কেন তুমি পিতৃবাক্যে বৃথা দুঃসহ বনবাস কষ্ট ভোগ করে জীবন নষ্ট করবে?" তখন কিন্তু রামের মনের কথাই বলেন, কিন্তু রামচন্দ্র তাতেও ক্রুদ্ধ হন। তিনি বলেন · আমার হিত কামনায় এতক্ষণ যা বললেন তা আসলে অকার্য, আপনার কথা আমি কিছুতেই মানতে পারি না। এটা ঠিক বাক্যবাণ নয়—তবে বাক্যবারুদ বটে, এর উপর সামান্য একটু স্ফুলিঙ্গ পড়লেই জ্বলে উঠতে পারত।

ভরত ভরদ্বাজ মুনিকে তাঁর মা কৈকেয়ীর পরিচয় প্রসঙ্গে যা বলেছেন তাও কম বাক্যবাণ নয়। তিনি কৈকেয়ীকে বলেছেন ক্রোধপরায়ণা, অশিক্ষিত বুদ্ধি, গর্বিতা, ঐশ্বর্যাভিলাষিণী, পাপনিশ্চয়া, অনার্যা-নিষ্ঠুরা ইত্যাদি।

ভরত নিজে সরাসরি কৈকেয়ীকে বলেছেন ঃ

পাপীয়সি! তুই মোর পিতাকে বধিলি।
ভ্রাতারে তাপসবেশে বনবাস দিলি॥

কৌশলাও কম যান না। তিনি ভরতকে বলেন ঃ তোমার মনস্কাম পূর্ণ হয়েছে—কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে "বনে গেলা রাম"। বিরাট কোনও বাক্যবাণ নয়—তবে ইঙ্গিত যথেষ্টই, অর্থাৎ ব্যাপারটা যা হয়েছে তা অন্যের ষড়যন্ত্র হলেও ভরতের ছিল সেটা মনের ইচ্ছে।

ভরতের কাছে পাপীয়সী মন্থরাও। রাজকৃষ্ণ রায়ের রিপোর্টে পাচ্ছি ভরত মন্থরা সম্পর্কে বলেছেন,···এই কুহকিনী আমাদের সকলের অনিষ্টকারিণী। পরে মন্থরাকে পিশাচী বলেও তিনি বাক্যবাণ ছোঁড়েন। কৈকেয়ীর প্রতি বাক্যবাণ প্রয়োগ রামায়ণে স্বভাবতই একটু বেশি মাত্রায়। শত্রুঘ্নও তাঁর প্রতি যথেষ্ট কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করেছেন। এমনই সে কর্কশ ভাষা যে "শত্রুঘ্নের মুখ দেখি শুকাইল বুক"! তবে ভরত কৈকেয়ীকে খুন করতেও চেয়েছিলেন। শত্রুঘ্ন অতটা করেননি। রামায়ণ কেবল রাম-কথা নয় অবশ্যই। রাম প্রধান চরিত্র অনস্বীকার্য। কিন্তু তারপরই স্থান রাবণের এবং আরও কয়েক ডজনের। এঁদের বাদ দেওয়া যায় না। যেমন সীতা, লক্ষ্মণ, রাবণ, যেমন জটায়ু, যেমন বিভীষণ এবং হনুমান। কোন চরিত্রই উপেক্ষণীয় নয়—এবং প্রায় সব চরিত্রই বাক্যবাণ ছাড়তে পটু। সম্ভবত ভারতীয়ত্ব একেই বলে। সমস্ত ভারতের মধ্যে যে একটা অদৃশ্য ঐক্য রয়েছে তার একটা প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে—প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছে। বেশি নয়, আমাদের দেশের সংসদ এবং বিধানসভাগুলির রেকর্ডগুলোয় একবার চোখ বুলালেই তার অজস্র প্রমাণ মিলবে—কিংবা হয়ত কোনও কোনও ক্ষেত্রে মিলবেও না, কেন না, মহামান্য স্পিকার মহোদয়গণ কিছু কিছু তীব্র অংশ বাদও দিয়ে থাকেন।

রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই। কিন্তু সেজন্য লক্ষ্মণের প্রতি বাক্যবাণ ছাড়তে

রামের অসুবিধা হয়নি। শূর্পণখা যখন সীতাকে ভক্ষণ করতে ধেয়ে এসেছিল এবং সীতা ভয়ে কাতর হলেন তখন কিন্তু রাম শূর্পণখাকে বাধা না দিয়ে "ক্রোধভরে" লক্ষ্মণকে বললেন, ইতর স্ত্রীলোক সনে তুমি আর কখনও এমন পরিহাস কর না। আর বললেন, আর দেরি না করে শূর্পণখাকে "বিরূপ করিয়া দাও খর অসি ধারে"। সীতাকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে রাম ফের লক্ষ্মণের উপর বিরূপ হলেন এবং বাক্যবাণ প্রয়োগ করলেন, "তোর জিম্মায় আমি আমার স্ত্রীকে রেখে গেলাম আর তুই কি বলে তাকে পাহারা না দিয়ে অনুপস্থিত থাকলি ?" কৃত্তিবাসের রামায়ণে দেখা যায় যখন রামের 'আর্তনাদ' শুনেও লক্ষ্মণ তাঁকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন না তখন সীতা পর্যন্ত লক্ষ্মণকে গালাগালি দিয়েছেন, অন্য কথায়—বাক্যবাণ প্রয়োগ করেছেন। প্রমাণ ঃ

···তাহা না মানেন সীতা হয়ে উতরোলী।
শিরে ঘা হানেন সীতা যেন গালাগালি ॥

এমন কি, এমনও ইঙ্গিত করলেন যে রামের মৃত্যু হলে লক্ষ্মণ সীতাকে বিবাহ করতে চান—এই কারণেই লক্ষ্মণ রামের আর্তনাদ শুনেও সাহায্য করতে যাচ্ছেন না ! লক্ষ্মণও বাক্যবাণ বর্ষণে পটু ছিলেন। তিনি শূর্পণখার বিবাহ প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন (অনেকটা মাইকেলীয় ঢং-এ) ঃ মম রূপে মজিয়াছ কুলটা কামিনি, মুছে ফেল পাপ-আশা হৃদয় হইতে।

জটায়ু রাবণকে যথেষ্ট গালাগাল দিয়েছিলেন রাবণ যখন সীতাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সীতা রাবণকে গালাগাল তো দেবেনই। সেটা কিছু নতুন তথ্য নয়। শত্রুপক্ষীয় লোকদের গালাগাল দিতেই হয়। সেটাই রীতি। "সীতা যত গালি দেয় রাবণ না শুনে, রথে চড়ি বায়ুবেগে উঠিল গগনে।" এটি ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। উল্লেখযোগ্য হল রাবণকে শূর্পণখার কটূক্তি। শূর্পণখা রাবণকে বলেছে ঃ

·· অমাত্যগণের কাছে মহাক্রোধ করি
কহিল কঠোর বাক্য—শুন দশানন !
তুমি অতি কামোন্মত্ত স্বেচ্ছাপরায়ণ !!

মারীচ রাবণকে বলছেন, "লঙ্কাপুরী···মজিবে তব দোষে"। কিন্তু একতরফা নয়। রাবণও মারীচকে বলেছেন, "কুবুদ্ধি ঘটিল তোর শুনরে দুর্মতি" ! সরমা রাবণকে ক্রুদ্ধ হয়ে বলছেন, সীতাকে তাড়াতাড়ি রামকে ফিরিয়ে দিয়ে এসো, কিন্তু রাবণ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের মাকেই বলছেন "কুড়ি চক্ষু রাঙা করি", মা তুমি ওসব কথা বলো না, সরে পড়ো !

বালী সুগ্রীবকে ধমক দিচ্ছেন, অর্থাৎ বাক্যবাণে ঝালাপালা করছেন। রামায়ণে এজন্য বিস্তর জায়গা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখানে অত সময় নেই, স্থানও নেই। সংক্ষেপে একটু উদাহরণ দিই, সুগ্রীবের কথায় ঃ

পায়ে পড়ি যত বলি বালী নাহি শুনে।
ক্রোধে বলে যা-রে চলি, যেখানে সেখানে ॥

বারে বারে বলি তবু না শুনিস কথা।
একটা চাপড়ে ভাঙি আয় তোর মাথা ॥

রামচন্দ্র বালীকে হত্যার পর বালীর পত্নী তারা ছেড়ে কথা কননি। তাঁর নিজের কথায়—

শ্রীরাম ! তোমারে বলে সবে দয়াবান্।
ভাল দেখাইলে আজ তাহার প্রমাণ ॥

বালীরাজা মৃত্যুর সময়েও রামচন্দ্রকে গালাগালি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমার মৃত্যুর পর সুগ্রীবই রাজা হত, সেটাই তো বিধি এবং ন্যায্য, কিন্তু তুমি আমাকে খুন করলে অন্যায়ভাবে। বারবার বলছি, হে রামচন্দ্র এটা তোমার ভয়ানক অন্যায় হয়েছে ! সব প্রাণীই একদিন মারা যায়, কিন্তু তুমি আমাকে মারলে কেন, এতে তোমার কি লাভ হল ? তবে এ বাক্যবাণ অনেকটাই নরম, স্বীকার করতেই হবে।

লঙ্কায় ঝগড়াঝাঁটির ঝাল কম নয়। রাবণ সীতাকে যেমন গালি দিয়েছেন, তেমনি আগেই বলা হয়েছে মারীচের কথা। রাবণের সঙ্গে বিভীষণের দু-পক্ষেরই কটুবাক্য বর্ষণ মোটামুটি সকলেই জানেন। রাবণের বক্তব্য ছিল পাপিষ্ঠজনকে বধ করলে পাপ হয় না। অতএব হনুমানকে বধ করা এমন কিছু অন্যায় নয়। বিভীষণের ছিল অন্যমত। পরবর্তীকালে বিভীষণের সুবিবেচিত পরামর্শ রাবণের মনঃপূত হয়নি। সেই কারণে বিভীষণ রাবণকে বলেছেন, তোমার কিছুমাত্র বুদ্ধি নেই, বিচার নেই, কার্যজ্ঞান নেই, তুমি যা করছ তাতে শেষ পর্যন্ত তোমার আত্মনাশ হবে। একই কথা আবার ইন্দ্রজিৎ বলেছেন বিভীষণের বিরুদ্ধে ! ইন্দ্রজিৎ আরও যোগ করেছেন, রাজার বিপদে এখনো তোমার "নাহি হল মনে ভাবনা সঞ্চার" !

সুগ্রীব বলেছেন রামের শত্রু যে সে আমারও শত্রু, এবং তার বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না ! বাক্যবাণ চমৎকার ! সমস্ত রামায়ণেই এই উদাহরণ প্রায় পাতায় পাতায় ! সীতা বেশ কয়েকবার গালাগাল দিয়েছেন। লক্ষ্মণকে পর্যন্ত তাঁর বাক্যবাণ সহ্য করতে হয়েছে। আর রাম তো তাঁর বাক্যবাণ সহ্য করতে না পেরেই সোনার হরিণ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন। সীতা যদি একটু চুপচাপ থাকতেন তাহলে রাবণ কি তাঁকে চুরি করতে পারতেন ?

কিন্তু কি হলে কি হতে পারত সে কথা আজ থাক। আসল কথা, রামায়ণে সত্যিকারের ধারালো বাণের যত বর্ণনা পাই, ততই বা হয়ত তার চাইতে বেশিই পাই বাক্যবাণ। যাঁরা পুরো রামায়ণে বাক্যবাণ খুঁজবেন তাঁরা নিশ্চয়ই আরও অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবেন।

[আনন্দবাজার : ১৯৮৬]



যুধিষ্ঠির এলেন কলকাতায়

হঠাৎ যদি আজ আমাদের এই ভাঙা-চোরা এবড়ো-খেবড়ো কলকাতায় মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের আগমন হত তাহলে কি হত? প্রথমত, ব্যাপারটি হতই না, কেননা মৃত ব্যক্তির প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। তবে, যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়েছিলেন সশরীরে, একেবারে দিব্য-রথে করে, অতএব যুধিষ্ঠির ঠিক মারা যাননি। সে হিসেবে, পুরনো আমলের কারুর যদি মর্ত্যে আসবার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেটা একমাত্র যুধিষ্ঠিরেরই পক্ষে মানানসই হয়, কেননা, মহাভারতের অন্য সব মানুষই দেহত্যাগ করেছেন, একমাত্র ব্যতিক্রম যুধিষ্ঠির। এবারে বোধ হয় যুধিষ্ঠিরকে কলকাতায় আনা যেতে পারে।

উনি এলে নানা গোলমালে পড়বেন সন্দেহ নেই। তাঁর আমলে কলকাতা ছিল না। মোটরগাড়ি ছিল না, যদিও রথ ছিল, বিমান ছিল। আরও অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস ছিল। সম্ভবত বেতার, টিভিও ছিল, কিন্তু সে সব নিয়ে তর্ক করবেন পণ্ডিতেরা। যা ছিল না তা হল বাংলা ভাষা, ইংরেজি ভাষা। প্রথমেই তিনি কলকাতায় এসে ভাষার প্যাঁচে পড়ে কাবু হবেন। কিছুই বুঝতে পাববেন না। সমস্তই তাঁর কাছে অর্থহীন প্রলাপ বলে মনে হবে। কিন্তু এখানে ধরে নিচ্ছি, তিনি স্বর্গ থেকে কলকাতায় আসার আগে আধুনিক বাংলা এবং ইংরেজি ভাষাটা মোটামুটি শিখে এসেছেন। একটু হিন্দিও! এবার দেখা যাক যুধিষ্ঠির কলকাতায় এসে কি রকম ব্যবহার করতে পারেন। আগেই জানিয়ে দিচ্ছি, এটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী। এর সঙ্গে বাস্তবের কোনো মিল নেই।

যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই কলকাতায় এসে, হাতিবাগানে হাতি, পাইকপাড়ায় পাইক, লেবুতলায় লেবু, বাদুড়বাগানে বাদুড়, জোড়াসাঁকোয় জোড়া সাঁকো, কদমতলায় কদম. গোলদিঘিতে গোল দেখতে না পেয়ে হতাশ হবেন। দাদাঠাকুরও কলকাতার ভুল হিসেবে এর কয়েকটিকে উল্লেখ করেছিলেন। এ সবের

পর যুধিষ্ঠির লক্ষ করবেন কলকাতার মানুষেরা আরও অনেক বাজে কথা বলে থাকেন। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সেগুলো সহজে পরিপাক করা কঠিন। যেমন, একদিন বৃষ্টিতে কলকাতায় জল থৈ থৈ। খবরের কাগজে লেখা হল, 'কলেজ স্ট্রিটে এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে।' কথাটা পড়েই যুধিষ্ঠির একটু চিন্তিত হবেন। এক হাঁটু কথাটার অর্থ কি? তিনি ভেবে পাবেন না। কার হাঁটু? মানুষের না কুকুরের? যুধিষ্ঠির কুকুরভক্ত। তাঁর কাছে কুকুরই দেবতা, কেননা তাঁর শেষ যাত্রার সঙ্গী ছিল একটি কুকুরবেশী দেবতা। কলেজ স্ট্রিট তার উপর এবড়ো খেবড়ো, ফলে জল সর্বত্র একই গভীরতায় জমে যেতে পারে না। আবার মানুষও কত রকমের। বিরাট মানুষ আছে, বেঁটে মানুষ আছে, শিশু আছে। কার হাঁটু হবে? আর কুকুরও তো নানা জাতের। চি হুয়া হুয়া থেকে গ্রেট ডেন, তাদের হাঁটুও তো নানা উচ্চতার। যুধিষ্ঠির চিন্তিত হলেন। ভাবলেন, হাতি বা জিরাফের হাঁটুও তো হতে পারে।

আবার তিনি এও ভাবলেন, জলের তো পা নেই, তাহলে জল দাঁড়ায় কেমন করে? ঝামেলা বলে মনে হল তাঁর। আবার সেই জলকে যখন কেটলিতে করে উনুনের উপর রাখা হয় তখন লোকেরা কেন বলে জল বসানো হয়েছে? এই সব অর্ধসত্য বা অসত্য কথা তাঁর মনকে ধাক্কা দেবেই। পথ দিয়ে চলতে চলতে তিনি এও শুনে অবাক হলেন যে একজন অন্য একজনকে বলছেন, যান এগিয়ে—কিছু দূরে গেলেই বড় রাস্তায় পড়বেন। যুধিষ্ঠির সেই লোকটির পেছন পেছন অনুসরণ করে এলেন। দেখলেন লোকটি একটা রাস্তায় এলেন, কিন্তু পড়লেন না। আবার অন্য এক জায়গায় তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, ইডেন গার্ডেনে যাবার রাস্তাটা বলে দেবেন? লোকটি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ইডেন গার্ডেন? তা এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান, তারপর দেখবেন রাস্তার উপর একটা তেরো তলা বাড়ি—সেটা হল গিয়ে নিউ সেক্রেটারিয়েট, তারপর খানিকটা গিয়েই পেয়ে যাবেন ইডেন গার্ডেন। যুধিষ্ঠির তখন ভাববেন, লোকটা অতি বাজে কথা বলে—রাস্তা 'ধরতে' যাবেন কেন তিনি? তাহলে তো হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়। আবার চলতে চলতে তিনি নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং দেখে হাঁ হয়ে যাবেন। কই, রাস্তার উপর তো বাড়িটা নয়? বাড়িটা তো রাস্তার ধারে!

যুধিষ্ঠির পথ দিয়ে চলতে চলতে শুনলেন, একজন অন্য আর একজনকে বলছে, আপনার ঘণ্টাখানেক সময় আছে? প্রশ্নটা শুনে বিস্মিত যুধিষ্ঠিরের মনে প্রশ্ন জাগল—সময় কি কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে? সময় কি সম্পত্তি? নইলে একজন কি করে ঐ প্রশ্ন করতে পারে? আবার তার উত্তরটা শুনেও যুধিষ্ঠির আরও অবাক হলেন। উত্তরদাতা বললেন, এক ঘণ্টা কেন, অঢেল সময় আছে আমার! আবার এই সময় নিয়েই আর একটি কথাও তাঁকে ভাবিয়ে তুলল—কে একজন অন্য একজনকে বলছে, ভাই—একটা কথা, অনেক সময় নষ্ট করেছিস, আর করিস না—এবারে পরীক্ষাটা দিয়ে দে! সময় ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না। অনেকটা আত্মার মতই—শ্রীকৃষ্ণের কথা

মনে পড়ল যুধিষ্ঠিরেব—যা অস্ত্র দিয়ে কাটা যায় না, পোড়ানো যায় না, সেই সময় একজন নষ্ট করল কেমন করে! উঃ কলিকালই বটে—লোকেরা কি বলছে তার মানেই তারা জানে না!

সে দিন সকালে পড়ছিল দারুণ বৃষ্টি। কালো মেঘ, ঘন হয়ে আসা বৃষ্টি বিদ্যুৎ মেশানো মেঘ। যুধিষ্ঠির তাঁর হোটেলের ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্টে বসেছেন, এমন সময় একজন ওলন্দাজ এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, গুড-মর্নিং! যুধিষ্ঠিরের কাছে ঐ সকালের মত কদর্য সকাল ভূভারতেও হওয়া সম্ভব নয়। যুধিষ্ঠির মুখ গোমড়া করে রইলেন, আর ভাবতে লাগলেন, লোকটা আচ্ছা বোকা তো? না কি মিথ্যেবাদী?

যুধিষ্ঠির হোটেল থেকে আর বেরুতে পারলেন না। নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে রইলেন। একটা বেয়ারাকে বললেন, লাইব্রেরি থেকে একখানা বাঙলা বই নিয়ে আসতে। বেয়ারা যে বইটা নিয়ে এল সেটা রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র। পাতা ওলটাতে লাগলেন যুধিষ্ঠির। একটা লাইনের উপর চোখ পড়ল, (যুধিষ্ঠির জানেন না, এই কথাটা আমি ব্যবহার করছি, জানলে নিশ্চয় বলতেন, 'চোখ পড়ল' মানে? চোখ মাথা থেকে আলাদা হয়ে পড়ে গেল!) সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয়ে একেবারে পৃথিবীর শেষ রেখার অন্তরালে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

যুধিষ্ঠির ভুরু কোঁচকালেন। এই সব লেখা হয়? এর অর্থ কি? সাধারণ জ্ঞানও নেই এই লেখকের? সূর্য ক্রমেই রক্তবর্ণ হয় না। সূর্য মোটামুটি তো একই থাকে। তার রঙ ঝকঝকে রুপোলি হতে পারে। তাকানো যায় না। পৃথিবী ঘোরার ফলে সূর্য ক্রমশ দিগন্তে অদৃশ্য হয়—সেই সময় ধুলোময় হাওয়ার ঘনত্ব বেড়ে যায়—অর্থাৎ সূর্য এবং দর্শকের মধ্যে যে হাওয়া থাকে সেই হাওয়ার পরিধি বাড়ে, হাওয়ার ধুলোও সেই সঙ্গে বাড়ে, ফলে সূর্যকে অস্পষ্ট দেখায় মাত্র। এবং সেই সঙ্গে সূর্যের রঙ বদলায় না—সূর্য ঠিকই থাকে, কিন্তু সূর্য এবং দর্শকের মধ্যে যে ধুলো, জলকণা ইত্যাদি থাকে তাতে সূর্যকে রক্তবর্ণ দেখায়। যেমন আকাশকে নীল দেখায়—আবার কেউ লালরঙের কাঁচের ভেতর দিয়ে আকাশ দেখলে তখন আকাশকে প্রায় কালো দেখাবে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আকাশের রঙ কালো হয়ে যাবে! আবার, পৃথিবীর শেষ রেখা কথাটাও হয় না। কেননা, পৃথিবীর কোনো রেখাই নেই, অতএব শেষ রেখাও নেই।

আবার, যুধিষ্ঠির শুনতে পেলেন, আজ সূর্য ওঠার নাম নেই। এই কথাটা হোটেলের এক বেয়ারা অন্য একজনকে বলছে। সূর্য ওঠে না। সূর্য অস্তও যায় না। অথচ, এই মিথ্যে কথাগুলো এখনও কলকাতার লোকেরা অম্লানবদনে বলে যাচ্ছে! বইতেও লেখা হচ্ছে, সূর্য অন্তর্হিত হয়ে গেল। এদিকে হোটেলের ক্লার্ক একজনকে বলছে, শুনতে পেলেন যুধিষ্ঠির : শেয়ালদা স্টেশন থেকে বারুইপুরের লাইনের গাড়ি ধরে যান, বালীগঞ্জ স্টেশন এলেই নেমে পড়বেন। এটাও তাঁর কাছে অদ্ভুত মনে হল। গাড়ি ধরতে হবে কেন?

গাড়িতে তো লোকে চড়ে, আরোহণ করে! আবার বালীগঞ্জ স্টেশন আসবে কেমন করে? স্টেশন কি চলে বেড়ায়?

আবার ছিন্নপত্রে মন দিলেন যুধিষ্ঠির। দেখলেন, একটা চিঠিতে আছে, ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালবাসি! পৃথিবীতে কতরকম কোলাহল সত্ত্বেও চুপ করে পড়ে রয়েছে! আবার, 'পড়ে রয়েছে' কথাটাও এমন কিম্ভূত! সে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে তো ঘুরছেই সেকেণ্ডে আঠারো না কত মাইল বেগে, সে নিজেও লাট্টুর মত ঘুরছে। সেটা কি করে চুপ করে পড়ে থাকতে পারে? এ নিশ্চয় ঘোর কলিকাল! আবার ঐ একই বইতে, আকাশে মেঘ ছিল না, চাঁদ উঠেছিল। যুধিষ্ঠিরের মেজাজ আরও একটু বিচলিত হল। উঠেছিল মানে কি? চাঁদ তো পৃথিবীর চারদিকে সব সময়েই পাক দিয়ে চলেছে। সব সময়েই তো উঠে আছে অনেক সময় দেখা যায়, অনেক সময় কম দেখা যায়, অনেক সময় বেশি দেখা যায়। কিন্তু উঠেছিল কথাটা হতেই পারে না। অনেক সময় পৃথিবীর কাছাকাছি দেখা যায়, অনেক সময় উঁচুর দিকে দেখা যায়। আবার দেখা যায়ও না তাও হয়!

এই সব ভাবছেন, এমন সময় একজন বেয়ারা এসে বললো, যুধিষ্ঠিরবাবু আপনার টেলিফোন!

যুধিষ্ঠির বললেন, আমার টেলিফোন? আমার তো কোনো টেলিফোন নেই। এই সময় খবরের কাগজের একজন ফোটো রিপোর্টার এসে বললেন, যুধিষ্ঠিরবাবু আপনার ছবি তুলব। কেন, পড়ে গেছে নাকি আমার ছবি? না-না, ফোটোগ্রাফার বললেন, ক্যামেরায় তুলতে চাই। যুধিষ্ঠির বুঝতে পারলেন না, বললেন, যা পড়েনি তা তোলা যায় কেমন করে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

এদিকে হোটেলের সোফায় একজন বসে আছেন পাগড়ি পরা মানুষ। ফোটোগ্রাফার বললেন, উনি একজন কাবুলিওয়ালা, ওঁর ব্যবসা টাকা ধার দিয়ে সুদ নেওয়া। যুধিষ্ঠির বললেন, কাবুলিওয়ালা, মানে? ফোটোগ্রাফার বললেন, কাবুলের মানুষ তো, তাই কাবুলিওয়ালা। —উঁহু! যুধিষ্ঠির বললেন, কাবুলওয়ালা উনি তাহলে। উনি কাবুলির লোক নন, কাবুলের। অতএব উনি হয় কাবুলি, নয় কাবুলওয়ালা। ফোটোগ্রাফার দাড়ি চুলকে কবুল করলেন, তা হবে।

ইতিমধ্যে হোটেলের ঐ বিশ্রাম ঘরে একজন ডাক্তার তাঁর সহকারীকে বললেন, আমার এক পেশেণ্ট রয়েছেন এখানে—হার্ট-অ্যাটাক, অবশ্য মৃদু ধরনের। ওঁকে আমি কমপ্লিট রেস্ট নিতে বলেছি, আর মদ সিগারেট বন্ধ করতে বলেছি। যুধিষ্ঠির দুম্ করে বলে উঠলেন, খবর্দার না! ডাক্তার বললেন, কী না? যুধিষ্ঠির বললেন, ঐ যে বললেন, কমপ্লিট রেস্ট, ওটি ওঁকে করতে বলবেন না। কেন? ডাক্তার গর্জে উঠলেন, আমার পেশেণ্টকে আমি কি বলব তা আপনি বলে দেবেন নাকি? আপনি কি একজন হৃৎ-স্পেশালিস্ট? যুধিষ্ঠির বললেন, স্পেশালিস্ট ফেশালিস্ট কিছু নই মশাই, তবে ঐ কমপ্লিট রেস্ট কথাটা

ঠিক হয়নি। ওর মানে হল উনি পাশ ফিরবেন না, হাত মুঠো করবেন না, আঙুল নাড়বেন না, তাকাবেন না, বা, তাকিয়ে থাকলে চোখের পাতা ফেলবেন না, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেবেন না। ডাক্তার বললেন, লুন্যাটিক!

যুধিষ্ঠির বললেন, আমি লুন্যাটিক নই, আমি হলাম যুধিষ্ঠির। মহাভারতে পড়েছেন যার কথা, আমিই সেই অধম! আমি জীবনে মিথ্যা বলি না। মিথ্যা আমার সয় না। ঐ যে একবার মাত্র, জীবনে একবার মাত্র বলেছিলাম অশ্বত্থামা হত, ওটাই একমাত্র মিথ্যে। তবু, স্পষ্ট মিথ্যে নয়ও সেটা, অশ্বত্থমা নামের একটি হাতিও মরেছিল। সেটাও বলেছিলাম, কিন্তু আস্তে।

ডাক্তারের চোখ ছানাবড়া! কিন্তু ডাক্তারের সহকারী বেশ পাকা লোক মনে হল। কোনোরকম ঘাবড়ে না গিয়ে তিনি বললেন, বটে? আপনি, জীবনে একবার মাত্র মিথ্যে কথা বলেছেন? তাও আসলে মিথ্যে নয়? এটাই তো মিথ্যে কথা!

যুধিষ্ঠির গর্জে উঠে বললেন, বেয়াদব! আমার প্রতি আপনার এ কি ব্যবহার? আমি মিথ্যে বলেছি এর আগে?

নিশ্চয়। ডাক্তারের সহকারী বললেন, মনে করে দেখুন, আপনারা যখন বারো বছর বনবাস সম্পূর্ণ করে এক বছর অজ্ঞাতবাস করতে গেলেন তখন বিরাট রাজার বাড়িতে গিয়ে আপনি নিজের কি পরিচয় দিয়েছিলেন? শুনবেন সে কথা? আপনি বলেছিলেন, মহারাজ, আমি বৈয়াঘ্র পদ্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, আমার সর্বস্ব বিনষ্ট হয়েছে, জীবিকার জন্য আপনার কাছে এসেছি। পূর্বে আমি যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলাম। আমার নাম কঙ্ক। কেমন, মনে পড়ছে? এটা কি অন্যায় হয়নি?

যুধিষ্ঠির চুপ! ডাক্তার নীরব। অন্যেরা নীরব। এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর যুধিষ্ঠির বললেন, এখানে একটু সোমরস হবে? আমার নার্ভটা কেমন দুর্বল লাগছে।



যুধিষ্ঠিরদার অর্থকষ্ট

যুধিষ্ঠিরদা কলকাতায় এলেই একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যান। উনি অবশ্য সশরীরেই আসেন, কেন না এটায় তাঁর টেকনিকাল বিশেষ বাধা নেই। স্মরণীয়ঃ উনি সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন। অতএব এটাই স্বাভাবিক তিনি সশরীরে মর্ত্যে মাঝে মাঝে আসবেন। গত দশ বারো বছরের মধ্যে তিনি আমার কাছে এসেছেন স্বর্গের সংবাদপত্র মন্দাকিনীর ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি হয়ে অন্তত চোদ্দবার। তিনি আমার কাছে কেন আসবেন, এই প্রশ্ন যদি ওঠে, তাহলে তার উত্তরে জানাই, এই প্রশ্ন সরাসরি যুধিষ্ঠিরদাকে করলেই ভাল হয়। কেন না, কারণটা আমার নিজের কাছেই কেমন কেমন যেন মনে হয়। অবশ্য ওঁকে সরাসরি প্রশ্নটা আমি কখনই করিনি। তবে তিনি এসে আমার বাড়িতে বেশ বহাল তবিয়তেই থাকেন। বেশ চমৎকার দক্ষিণ খোলা ঘরটি ওঁর জন্য ছেড়ে দিই এবং যতদিন তিনি থাকেন ততদিন একটি মোগলাই ভোজনালয় থেকে বাবুর্চি'রা এসে ওঁর খাদ্যের ভার গ্রহণ করেন, পানীয়ের ভার গ্রহণ করেন আর একটি সংস্থা।

অসুবিধে হয় ওঁর কুকুরটিকে নিয়ে। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর অনুগত একটি কুকুরকে সঙ্গে আনেন। এটিই কি সেই বিখ্যাত কুকুর, যিনি ওঁর সঙ্গে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছিলেন? এর জবাব যুধিষ্ঠির দেন না, কেবল মুচকি হাসেন। সত্য কথা যুধিষ্ঠিরদা বলতে ডরান না ঠিকই, তবুও কেন যে তিনি এ রকম প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আমাদের অন্ধকারে রাখেন, তা আমার জানা নেই। যাই হক, যুধিষ্ঠিরদা স্বর্গে কি ভাষায় কথা বলেন, কি ভাষায় লেখেন, তা আমার জানার দরকার নেই, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে যখন কথা বলেন তখন তিনি বাঙলায় বলারই চেষ্টা করেন। তবে সেটা কখনও কখনও অদ্ভুত শোনায় বলে তার নাম দিয়েছি যুধিষ্ঠিরের বাঙলা। এ-রকম বাঙলা আমরা এর আগে

শুনিনি'। তবে বাঙলা বলার চেয়ে সমালোচনার দিকেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক।

তিনি বলেন,—এই গতবার যখন এসেছিলেন তখন বলেছিলেন, তোমাদের বাঙলা ভাষায় লজিক বলে কিস্সু নেই। কেমন করে যে তোমরা মনের ভাব ভাষায় ব্যক্ত কর তা আমি বুঝতে পারি না।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কেন আমাদের ভাষা তো তেমন খারাপ বস্তু নয়। দারুণ ভাষা। এর প্রশংসায় তো বহু দেশের পণ্ডিতবর্গ উচ্ছ্বসিত!

যুধিষ্ঠিরদা বললেন, রেখে দাও তোমাদের পণ্ডিতদের কথা। পণ্ডিতেরা ভাষার কি বোঝেন? তোমাদের ভাষার জন্য আমার দারুণ অর্থ-সমস্যা দেখা দিয়েছে!

—অর্থসমস্যা দেখা দিয়েছে, আমাদের এই ভাষার জন্য—এ কি বলছেন আপনি?

যুধিষ্ঠিরদা চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি ভাব আমি বাজে কথা কইছি?

আমি নিজেকে শুধরে নিই। বলি, সে কি কথা যুধিষ্ঠিরদা, আপনি বাজে কথা কইবার লোক? আসলে আপনার অর্থ-সমস্যার কারণ আমাদের ভাষা, এটাই আমার কাছে কেমন যেন ঠেকেছে। কিছু আশ্চর্যও হয়েছি। তারই জের হিসেবে আমার মনে কিঞ্চিৎ আশ্চর্যের ছিটে লেগেছে। কিন্তু আপনি বাজে কথা কইছেন, এমন কথা কেবল কইব না, মনেও স্থান দেব না। তবে কিনা ব্যাপারটা এখনও আমার হৃদয়ের বাইরে।

—হৃদয়ের বাইরে? সেটা কি? যুধিষ্ঠিরদার পট্পট্ প্রশ্ন।

—অর্থাৎ আমার হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। আমি একটু বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি।

যুধিষ্ঠিরদা বললেন, এই তো এক চোট অর্থকষ্ট দিলে, তুমি বাঙলায় কথা বলে।

—কি রকম? আমার প্রশ্ন।

—হৃদয়ঙ্গম কথাটার অর্থ বোঝা কঠিন নয়, কিন্তু কেউ কোনও কথা হৃদয়ে গ্রহণ করেছে বললে আবার অন্য অর্থ দেখা দেয়। যুধিষ্ঠিরদা বললেন।

আমি বললাম, আপনার কথায় আমি অবাক হয়েছি।

—এই আবার আমায় অর্থকষ্টে ফেললে হে, আবার!

—কেন কি হল? আমি প্রশ্ন করি।

—তুমি আমার কথায় অবাক হলে ভুল কিছু ছিল না,—কিন্তু যখনই প্রকাশ করলে তুমি অবাক হয়েছ, তখনই তো সেটা মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে কথা? আমি ফের অবাক হই। যুধিষ্ঠিরদার কথাটা ধৃষ্টতা বলে মনে হয় আমার।

—মিথ্যে কথাই তো! যুধিষ্ঠিরদা বললেন, তুমি যদি অবাকই হবে তাহলে তোমার বাক্স্ফূর্তি হয় কেমন করে বলো? তুমি অবাক যদি হও সেটা তুমি বলতে পার না, বিশেষ করে বর্তমান কালে তো নয়ই। ভবিষ্যতে বলতে পার

অতীতের কথা, আমি অবাক হয়েছিলাম। কেন না, অবাক মানে হচ্ছে বাক্যহীন।

—আমি এবারে সত্যিই অবাক হয়ে পড়ি। সত্যি যুধিষ্ঠিরদার অর্থকষ্টের অর্থ আমার কাছে আর অকপট থাকে না। কথাটার যাথার্থ্য আমার কাছে দিবালোকের মতো ফুটে ওঠে।

আমার নীরবতায় যুধিষ্ঠিরদা বললেন, এবারে তুমি অবাক হয়েছ—কিন্তু বহু ঘণ্টা বাক্যহীন হয়ে থাকেন, বহু কয়েদি একক বন্দী অবস্থায় মাসের পর মাস প্রায় কথা না বলেই কাটিয়ে দেন, বা দিতে বাধ্য হন। সে-সব ক্ষেত্রে তাঁরাও অবাক। কিন্তু সেটা তোমরা বল না। কেন বল না?

—কী জানি কেন? আমি বলি।

—উঃ! এ আবার কি কথা? যুধিষ্ঠিরদা আর্তনাদ করলেন। বললেন, কী জানি কথাটার অর্থ কি? উঃ! আবার তুমি আমায় অর্থকষ্টে ফেললে। কী জানির অর্থ, আমার যা জ্ঞান তাতে বুঝি, যা জানি। কিন্তু তাতে কি আমার প্রশ্নের উত্তর হল?

আমি বললাম, কি মুশকিল—আপনার মাথায় কি এটাও ঢোকাতে হবে যে···। কিন্তু বাক্য আর শেষ করলাম না। যুধিষ্ঠিরদা আমার বাড়িতে অতিথি, এবং সম্মানিত ব্যক্তিও বটে। তাঁকে চটানর কোন ইচ্ছেই আমার নেই। তাই তাঁকে একটু খুশি করার জন্য বলি, যুধিষ্ঠিরদা—ওসব কথা থাক। বুঝতে পারছি আমাদের বাঙলা ভাষায় জটিলতার জন্য আপনার প্রভূত পরিমাণে অর্থকষ্ট হচ্ছে। আর আমি কোনও অস্পষ্ট ঝাপসা বাক্য ব্যবহার করব না। আপনার কাছে আমাদের একটা আর্জি ছিল।

—কি সে আর্জি? যুধিষ্ঠিরদা বললেন।

—এই আমাদের পাড়ায় একটা গানের জলসা শনিবার বিকেলে, তাই ছেলেরা একটা অন্যায় করে ফেলেছে,—আপনার নাম আমন্ত্রণপত্রে ছাপিয়ে দিয়েছে। এটা খুবই গর্হিত কাজ হয়েছে ঠিকই,—কিন্তু ছেলেমানুষদের কথায় রাগ না করে যদি আপনি ওদের ঐ জলসার প্রারম্ভে একটু প্রধান অতিথি হয়ে আসেন তবে··।

যুধিষ্ঠিরদা বিভ্রান্ত হয়েছেন বলে মনে হল। তিনি বললেন, উঃ, আবার যে অর্থকষ্ট দিলে তুমি!

—এখানে তো কোনও অর্থকষ্ট হবার কথা নয়। তবে হ্যাঁ—অনুমতি যদি না নেয় ছেলেরা তাহলে সত্যিই খারাপ লাগার কথা···

—অনুমতির কথাই ওঠাইনি আমি, যদিও অনুমতি না নেওয়াটা খুবই অন্যায়। কিন্তু প্রধান অতিথির অর্থ আমার মাথায় ঢুকছে না যে? একটা জলসায় কতজন অতিথি থাকেন?

—সাধারণত দু-জন, একদল প্রধান অতিথি, অন্যদল বিশেষ অতিথি। কোন কোন জলসায় এগারোজনও অতিথি হতে পারেন, কোন বাধা নেই। তবে তাঁরা কেউ হন সম্মানিত অতিথি, সবিশেষ অতিথি, মুখ্য অতিথি, ইত্যাদি।

—কে বড় কে ছোট ?

—আজ্ঞে কেউই বড় নন্—কেউই ছোট নন্ ।

—অসম্ভব। যুধিষ্ঠিরদা বললেন, এ হতে পারে না ।

আমি বললাম, ঠিক বলেছেন যুধিষ্ঠিরদা—এ হতে পারে না। দুজন বা দুজনাধিক লোকের মধ্যে সাম্য অসম্ভব। সাম্যবাদীরাও এ-কথাকে কুকথা বলে মনে করেন না। ঠিকই, আপনার মনে হয়েছে, এটি যুক্তিবহ নয়। কিন্তু এর ফলে আপনার অর্থকষ্ট কেমন করে হল বুঝলাম না।

যুধিষ্ঠিরদা এবারে যা বললেন, তার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। উনি হাত মাথা নেড়ে বললেন, ন্যাকা ! বুঝলে না ?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, সত্যি যুধিষ্ঠিরদা, আপনি কিভাবে এই ব্যাপারে অর্থকষ্টে পড়লেন, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে

যুধিষ্ঠিরদা বললেন, বুঝিয়ে বলছি। তোমার পাড়ার দায়িত্বহীন ছোকরার দল ছাপিয়ে দিয়েছে আমি হব গানের জলসার প্রধান অতিথি। অর্থাৎ কয়েক শো কিংবা কয়েক হাজার লোক আশা করে বসে থাকবেন, আমি গিয়ে তাঁদের সামনে হাজির হয়ে দু-কথা শোনাব।

তাবপরই বললেন, এই দেখ আবার এক অর্থকষ্ট। দু-কথা শোনাবার যে অর্থ গালমন্দ করা, সেটা সেদিন জেনে নিয়েছি অর্জুনের কাছ থেকে। অর্জুনও বাঙলা ভাষার কিছু চর্চা করেছিল একদা। কথাটা আসলে বলতে চেয়েছিলাম, দু-কথা বলব, শোনাব না। যদিও শোনাব না কথাটাও প্রাণে ধরে বলতে পাচ্ছিনে।

আমি বললাম, হ্যাঁ দাদা, বলবেন দু-কথা না হয়, ওর সব আশা করে থাকবে।

এবার যুধিষ্ঠিরদা বললেন, আমাকে ওরা কৃতার্থ করবে। আমি যেতাম ঠিকই, কিন্তু প্রধান অতিথি হিসেবে এখন আর যাওয়া সম্ভব নয়।

—কেন ?

—কেন না, কোনও লোক যখন আগে না জানিয়ে হঠাৎ গিয়ে কোথাও উপস্থিত হন তখনই তাঁকে বলা যায় অতিথি। অতিথি, অর্থাৎ যাঁর যাতায়াতের দিনক্ষণ পঞ্জিকা দেখে স্থির করা হয় না। যাঁর আগমনের কথা আগে থেকে জানা যায় না, তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে হাজির হলে তবেই তাঁকে বলা যেতে পারে অতিথি। এখন যদি অতগুলি ছোকরা আমার আগমনের প্রত্যাশায় থাকে এবং আমি যদি সেখানে হাজির হই, তাহলে আমি অতিথি কেমন কবে হতে পাবি ? এ-যে আমার পক্ষে অসম্ভব। আবার প্রধান অতিথি। এর চেয়ে জলসাধিপাত নামটাই বেশি মানানসই !!!

আমি বললাম, সময়ের চাপে এবং প্রভাবে আর্থিক পরিবর্তন হয় বাক্যের। এটাও সেই রকম। অতিথির অর্থ এখন আর · ।

যুধিষ্ঠিরদা বললেন, উঃ এই আবার অর্থকষ্ট শুরু হল। বাঙলা ভাষার এই পরিবর্তনে আমার মত লোকদের বড়ই অসুবিধে।

আমি বললাম, আজ্ঞে স্বর্গের ভাষার কি কোনও পরিবর্তন হয় না ?

যুধিষ্ঠিরদা বললেন, না।

আমি বললাম, তার কারণ, আপনারা যে ভাষায় কথা বলেন সেটা মৃত ভাষা, আপনারাও সকলে ওখানে মৃত। সে ভাষার পরিবর্তন না হওয়ার ওটাই কারণ। আমাদের ভাষা সজীব, গতিশীল এবং সতেজ, তাই···।

যুধিষ্ঠিরদা আমার কথায় মর্মাহত হলেন, বলাই বাহুল্য। তিনি চুপ মেরে গেলেন। একটু পরে তাঁর মন ভোলানর জন্য বললাম, নিন্ দাদা, চান-টান করে নিন্। তারপর দুটো আম কেটে দেব—দারুণ চমৎকার, আর রুই মাছের বড় বড় টুকরো ভাজা দার্জিলিঙ-এর ভুবনজয়ী চা সহ, বেশ হবে।

—না। যুধিষ্ঠিরদা বললেন। আমি অর্থকষ্টে মরে যাব বলেই মনে হচ্ছে! চান করবার ব্যাপারটা বুঝি, কিন্তু টান করব কেমন করে ? চানের সঙ্গে টান এসে জোটে কোত্থেকে, কিসের টানে ? তাছাড়া, তোমাদের যা চালানি সব বিশ্রী স্বাদের আম, মাছও বাসি, মন্দাকিনীর মাছের ধারে কাছে যায় না।

—না দাদা, আমি বলি, বেশ আপনি চানই করুন, টান করবেন না। তবে আমের কথা আর মাছের কথা যখন তুললেনই, তখন সবিনয়ে জানাই, এগুলি খারাপ নয়, চালানি নয়, এগুলি গাছের আম, পুকুরের মাছ।

যুধিষ্ঠিরদা বললেন, ব্যাপার কি তোমার ? আম তো গাছেই হয়। তা আম তো গাছেরই হবে। গাছ ছাড়া আম হয় কি ? আর রুই মাছ পুকুরেই হয়। গাছের আম আর পুকুরের মাছই তো চালান হয়।

আমি বললাম, ঐসব কথার প্রকৃত অর্থ কিন্তু আপনি যে কদর্থ করেছেন তা নয়। অন্য ভাষার মত বাঙলা ভাষাও চর্চার ব্যাপার, মেনে নেওয়ার ব্যাপার। পদে পদে প্রশ্ন করলে কিছুরই হদিশ পাবেন না।

যুধিষ্ঠিরদা বললেন, কিন্তু তাই বলে কোনও প্রশ্নই করব না, তাহলে অর্থ বুঝব কেমন করে ?

আমি বললাম, একটু চুপ করে থাকলে আস্তে আস্তে দেখতে দেখতে শুনতে শুনতেই সব শিখে যাবেন। আসলে হয়েছে কি জানেন, আপনার বয়স হয়েছে, তাই কথাবার্তা বেড়েছে।

—বয়স হয়েছে ? মানে ? যুধিষ্ঠিরদার খ্যাঁক আওয়াজ পেলাম। বয়স কার হয়নি ?

আমি বললাম, বয়স সকলেরই হয়েছে। আপনার একটু বেশি হয়েছে, এই আর কি।

—তা সেটা স্পষ্ট বললেই হয় বেশি বয়স হয়েছে। স্বীকার করলাম আমার বেশি বয়স হয়েছে। কম দেখলাম না, কম শুনলাম না। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি হয়েছে ?

হঠাৎ মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, আজ্ঞে ভীমরতি।

ভীমরতিরই বা কি অর্থ ? যুধিষ্ঠিরদা অগ্নিশর্মা। ভীম এখানে কোত্থেকে এল।

এমন সময় একজন বছর চল্লিশ বয়সের রোগা ধরনের ভদ্রলোক হালকা চশমা এবং বুশ শার্ট গায়ে হাতে ক্যামেরা নিয়ে অকস্মাৎ ঘরে ঢুকে পড়লেন। তিনি ঝটাঝট তিন-চারখানা ছবি তুলে বললেন, যুধিষ্ঠিরবাবু, আমি এই শহরের এক সাময়িক পত্রিকার স্থানীয় সংবাদদাতা…।

—কী বললে ? যুধিষ্ঠির বললেন, সাময়িক পত্রিকার অর্থ কি ?

—আজ্ঞে পত্রিকা, মানে ম্যাগাজিন। যাতে গল্প কবিতা লেখেন লেখক এবং কবিরা, সংবাদ লেখেন সংবাদদাতা। আমি হলাম স্থানীয় সংবাদদাতা। সাময়িক পত্র কোনটা দ্বি-সাপ্তাহিক, কোনটা মাসিক, কোনটা পাক্ষিক, কোনটা দ্বি-মাসিক, ত্রৈমাসিক··

যুধিষ্ঠিরদা বুকে হাত দিয়ে খাটের এক দিকে কাত হয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন, উঃ বড় কষ্ট। বড় অর্থকষ্ট।

বললাম, অর্থকষ্ট ? সংবাদদাতা মনে মনে বললেন, কে অর্থকষ্টে নেই ?—টাটা, বিড়লা, ফোর্ড, রোথ্‌শচাইল্ড, রকেফেলার ··।

যুধিষ্ঠিরদা বললেন, ওঃ ওঃ বেজায় কষ্ট। সাময়িক পত্রিকার অর্থ কিছুই বোঝা গেল না। সবই তো সাময়িক। এই যে আমাদের এই জীবন, গাছ, পালা, মাছ, দেশ, সমুদ্র, পৃথিবী, মন্দাকিনী, বিশ্ব, এর কোনটা সাময়িক নয়—এমন কি সময়ও সাময়িক ! তার উপর ঐ কথাগুলোরই বা কি অর্থ—লেখক বলতে কাদের বোঝায় ? লেখকের অর্থ যিনি লেখেন। তা কেরানিও লেখেন, যেমন গিয়ে আমাদের চিত্রগুপ্ত। তিনি একজন লেখক। কবিও লেখেন, তিনিও নিশ্চয় লেখক। আর সাংবাদিককে কি লিখতে হয় না ? নিরক্ষর ব্যক্তি ছাড়া সকলেই তো লেখক। আর সবই তো স্থানীয়। স্থান ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়।

—না, আমি দুষ্টুমি করে বলি। সকলে লেখক নন্, এবং লিখলেই লেখক হওয়া যায় না।

—আলবত, যিনি লেখেন তিনিই লেখক।

আমি বললাম, হল না। নারী লেখক হন না, তাঁরা হন লেখিকা।

যুধিষ্ঠিরদা এবারে একটু বিব্রত বোধ করেন। এমন সময় পাড়ার জলসা-ওলারা লাউডস্পিকারে ঘোষণা করেছেন,—আগামী শনিবার আমাদের জলসায় প্রধান সভাপতি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী · ।

যুধিষ্ঠিরদা বললেন, একটা বাজে লোককে তোমরা প্রধান সভাপতি করছ কেন হ্যাঁ ?

—বাজে লোক কেন হবেন ? উনি হলেন গিয়ে সম্মানিত, তাম্রফলক প্রাপ্ত । সাংবাদিক বলতে চেষ্টা করেন। আমিও বলতে যাই ঐ এক কথাই। কিন্তু যুধিষ্ঠিরদা আমাদের বাধা দিয়ে বলেন, বাজে লোক নয় তো কি ? স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করলে তাকে খাতির করার দরকার কি। সম্মান দেখানরই বা কি আছে ?

—স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন কেন ? উনি···।

যুধিষ্ঠিরদা বললেন, আমাকে বাজে কথা বোঝাতে এস না। ফায়ারফাইটার

কথাটা ইংরেজি, মানে কি ? মানে যে আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করে, স্বাধীনতা সংগ্রামীও তো ফ্রিডম ফাইটারেরই বাঙলা ? আমার ইং এবং বাং অভিধানে স্পষ্ট লেখা আছে তা। আমাকে বাজে কথা বোঝাতে এসো না। স্বাধীনতা সংগ্রামী সে যে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করে !

যুধিষ্ঠিরদা ফোঁস করে কথাটা শেষ করলেন। আমরা আর কি বলব। ওঁর অর্থকষ্ট কেউ ঘোচাতে পারবে বলে মনে হল না।

উত্তর কলকাতা

দক্ষিণেশ্বর

কলকাতার নতুন ভুল

মরি হায় রে !
কলকাতা কেবল ভুলে ভরা
সেথায় বুদ্ধিমানে করে চুরি
বোকায় পড়ে ধরা ।।

দাদা-ঠাকুর, বা দা-ঠাকুরের গান। সেই গানে একটা ভুলের তালিকা ছিল—কোলকাতার নানা অঞ্চলের নামের সঙ্গে কাজকর্মের মিল নেই দেখে দা-ঠাকুর বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে কলকাতায় যে-সব ভুল ছিল সেগুলি তো রয়েইছে—তাছাড়া নতুন নতুন ভুলও এসে এর মধ্যে যোগ দিয়েছে অনেক। আবার কোনটা পুরনো ভুল যা দাদা-ঠাকুরের নজর এড়িয়ে গিয়েছে বা ক্ষুদ্র গানে স্থান সঙ্কুলান করতে পারেননি। কোনো কোনো জায়গার আবার নাম বদলে গিয়ে সমস্যা বাড়িয়েছে। যেমন, দাদা-ঠাকুর লিখেছিলেন, ভাবলাম কলুটোলায় কলু আছে/আছে তাদের ঘানি··· । কিন্তু এখন কলুটোলা কোথায়? আবার তিনি লিখেছিলেন, ভাবলাম চীনাবাজারেতে শুধু চীনে থাকে খালি,/দেখি ঘরে ঘরে দোকান করে/যত সব বাঙালী! কিন্তু হায় এই চিত্রেরও বদল ঘটে নতুন ভুলের সৃষ্টি করেছে। চীনেবাজারে চীনেরাও নেই, বাঙালীরাও নেই ঠিক নয়, তব দোকানদার হিসেবে তাঁরা 'ঘরে ঘরে দোকান' করেন না, দু-পাঁচটা দোকান এখনও তাঁদের আছে, তবে এটা ঠিকই—চীনেবাজারে প্রভূত পরিমাণে বাঙালীর দেখা মেলে ক্রেতা হিসেবে! জোড়াসাঁকাতে গিয়ে তিনি যে 'দিনে রাতে রবির উদয়' দেখেছিলেন, বহুদিন হল সে দৃশ্যও আর দেখার উপায় নেই।

এবার আমি নতুন ভুলের হিসেব দিই। আগেই বলেছি, এই তালিকায় নতুন ভুল যে সবই তা নয়। আমি কেবল নতুন করে আবিষ্কার করেছি এই পর্যন্ত। অন্যেরাও কেউ কেউ এ-সব আবিষ্কার করেছেন, করাই স্বাভাবিক—কেননা, এগুলির বেশ কয়েকটি এতই সহজ সরল যে আবিষ্কার না করাটাই

আশ্চর্যের। যেমন চিড়িয়াখানা। চিড়িয়াখানার নাম শুনে মনে কি হতে পারে না যে ওখানে কেবলই চিড়িয়া বা পাখির সমারোহ? একবার ভেতরে ঢুকে দেখবেন, শতকরা বোধহয় আশি ভাগই বাঘে ভালুকে বাঁদরে হিপোপটেমাসে বা অন্যান্য চতুষ্পদে ভরা। আবার, চিড়িয়ার মোড়ে গিয়ে দেখবেন সেখানে একটা পুলিশের থানা, এদিক ওদিক কিছু দোকান-টোকান রয়েছে। যা পাখি রয়েছে তা আশেপাশের গাছে—যা কিনা কলকাতার প্রায় সর্বত্রই মিলবে। এটা ঠিকই দা-ঠাকুরের সময় চিড়িয়ার মোড় কলকাতার বাইরে ছিল, এখন ঢুকে পড়েছে। দক্ষিণেশ্বরও এখন কলকাতার মধ্যে এসে গিয়েছে। কিন্তু কলকাতার সবচেয়ে উত্তরের যে জায়গা তার নাম দক্ষিণেশ্বর। ওখান থেকে চলে আসুন ডানলপ ব্রিজ-এ। নাম শুনে মনে হতে পারে ডানলপ ব্রিজ একটা সেতুর নাম, যেমন হাওড়া ব্রিজ। কিন্তু দেখবেন ডানলপ ব্রিজটি ত্রিশ চল্লিশ ফুটের বেশি চওড়া নয়, আসল ডানলপ ব্রিজ হল একটা বিরাট অঞ্চল। হাজার হাজার বাড়িঘর, জনবসতি, সিনেমা হল, বহুতল বাড়ি, বাজার এইসব মিলেই ডানলপ ব্রিজ। কলকাতার ভুল এটাও!

তারপর একটু আগেই উল্লেখ করেছি হাওড়া ব্রিজের নাম। হাওড়া ব্রিজ? ব্রিজটি যতখানি কলকাতার দিকে, হাওড়ার দিকেও ততটাই। আসল নাম হওয়া উচিত ছিল কলকাতা-হাওড়া ব্রিজ কিংবা সংক্ষেপে কেবল কল-হাও ব্রিজ। অবশ্য এ নামটা বদলে করা হয়েছে রবীন্দ্র সেতু। তাহলে তো সমস্যা চুকেই গিয়েছে। কিন্তু তাই কি? হাওড়া ব্রিজ সরকারি খাতা থেকে বাতিল? তার অস্তিত্বই নেই? বেশ কথা, তাহলে দ্বিতীয় হাওড়া ব্রিজটি হচ্ছে কেমন করে? ওটার নাম কি দ্বিতীয় রবীন্দ্র সেতু করা হবে শেষ পর্যন্ত? নাকি সমস্যার সমাধান হবে কোনো মহাপুরুষের নাম আমদানি করে? এইভাবে আবার দেখুন অন্যত্র কিভাবে সমস্যা এসেছে। চিৎপুর রোড ছিল একটাই, কিন্তু তার নাম ছিল দুটো, একটা, আপার চিৎপুর রোড, অন্যটি লোয়ার চিৎপুর রোড। যখন নাম বদলে রবীন্দ্র সরণি করা হল তখন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নামের আগে আপার যা লোয়ার কিছুই বসানো হল না। আবার উল্টোডাঙা রোড স্টেশনের নাম বদলে করা হল বিধাননগর, কিন্তু যে রাস্তার নামে স্টেশনটির নাম দেওয়া হয়েছিল সেই রাস্তার নাম কিন্তু সেই উল্টোডাঙাই রইল। উল্টোডাঙা কথাটাও কিন্তু ঠিক নয়—ওটি আসলে ছিল উল্টোডিঙি। তবে এ-নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না, করব না—কেননা, কলকাতা কেবল ভুলে ভরা।

দা-ঠাকুর বলেছিলেন লালদীঘির রঙ লাল ছিল না, কিন্তু রেড রোড তাঁর মনোযোগ এড়িয়ে গিয়েছিল। রেড রোড অন্য রাস্তার মতই পিচে ঢালা, এবং তার রঙ কালোই বলা যায়। দা-ঠাকুর ধর্মতলায় দেখেছিলেন ধর্ম নেই, সেখানে এক টাকার জিনিস 'তিন টাকা দর হাঁকে'। কিন্তু এ চিত্র ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত। ধর্মতলা নামও বদলে দেওয়া হয়েছে অবশ্য। হয়েছে লেনিন সরণি। জনসাধারণের আফিঙ হল ধর্ম, ইনিই

বলেছিলেন। সেদিক দিয়ে ধর্মস্থানে লেনিন বসে গেছেন, তাঁর মূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেউ কেউ লেনিন পুজোও করে থাকেন বলে শুনেছি, অতএব উপযুক্ত কাজই হয়েছে।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল যেখানকার সেখানেই আছে, নামও কেউ বদলে অমুক মেমোরিয়াল হল করেননি। অথচ এর সামনে থেকে ভিক্টোরিয়ার মূর্তিটিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা একটা ভুল বলেই আমার ধারণা।

গোলদীঘি চতুষ্কোণ, পদ্মপুকুরে পদ্ম নেই, ঝামাপুকুর, শ্যামপুকুর, মনোহরপুকুর এসব জায়গায় পুকুরই নেই। অধিকাংশ বাগানই আজ আর নেই। চালতাবাগান, গোয়াবাগান এসব জায়গায় কেবলি 'ইঁটের পর ইঁট তাহে মানুষ কীট'। এখন আর সেই পুরনো দিনের কয়েকটি বাজারে কলকাতা চলে না। বাগবাজার, শ্যামবাজার—এসব ছাড়াও এখন হয়েছে কত নতুন নতুন বাজার যাদবপুরের বাজার, গড়িয়ার বাজার, গড়িয়াহাটের বাজার —গড়িয়াহাট কিন্তু আর হাট নয় এখন বাজার। কিন্তু শুনতে অদ্ভুত লাগে —গড়িয়াহাট বাজার। পোস্তাবাজারে পোস্তা পাওয়া যায় কিনা জানি না, তবে পেঁয়াজ আদা রসুন এসব খুব মেলে দূর থেকে দেখেছি। এও কলকাতার ভুল এক রকমের। আবার হয়েছে লেক মার্কেট, কিন্তু ধারে পাশে লেক কোথায়? এদিকে তো ঘটা করে সল্ট লেক সিটি নাম দেওয়া হয়েছে একটা নতুন উপনিবেশকে—কিন্তু এর মধ্যে সল্ট লেক আর নেই। পুরো সল্ট লেককে বুজিয়ে দিয়ে তবেই শহরকে বানানো হয়েছে—এটা সল্ট লেক নিবারণী শহর বললে মোটামুটি ঠিক হত। আর কলকাতা বেতার কেন্দ্র নামটাই বা কি রকম? ভেতরে ঢুকে দেখবেন হাজার তারের সমারোহ। যেখানে অত তার সে জায়গার নাম বেতার কেন্দ্র।

বাজারের কথা এখনও শেষ হয়নি—মেছুয়াবাজারের পাত্তা নেই আর। মেছুয়াবাজার স্ট্রিট ছিল এখন বোধহয় সেটারও নাম পাল্টে দেওয়া হয়েছে। আর আগে বলেছি গোয়াবাগান, সেটা আবার কি বস্তু? গোয়া বলে কোনো গাছ আছে? নাকি পশ্চিম ভারতের গোয়ার গাছ আমদানি করে এখানে কেউ বাগান করেছিল? আর ফুলবাগান? সেখানে আজ কত ফুল আছে যে তার নাম ফুলবাগান দিতে হয়?

পার্ক সার্কাস নামটাও ভুল। সার্কাস অর্থে গোলাকৃতি কোনো জায়গা যেখানে অভিনয় বা পশু নিয়ে খেলা, দৌড়ঝাঁপ হয়। কিন্তু পার্ক সার্কাসের একটিই বড় পার্ক, সেটি গোলাকার নয়।

আগে উল্লেখ করেছি চিড়িয়াখানায় চিড়িয়া আছে, তবে অন্য জীবজন্তুও আছে। কিন্তু জাদুঘর? সেখানে জাদুর কোনো অস্তিত্বই নেই যে! এই নামটি একেবারেই ভুল। আর জগুবাবুর বাজার? এটা কলকাতাতেই নেই, আছে যদুবাবুর বাজার, কিন্তু এই ভুলের জন্য যদুবাবু দায়ী নন। লোকেরা কিছুতেই যদুবাবু বলবে না—বলবে জগুবাবু! ঘোরতর অন্যায় এটা, কিন্তু এজন্য পুলিশ ডাকা চলে না যে! আর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এর অজস্র ভাঙচুর

অবস্থা, নোংরা এবং পাতাল রেলের দারুণ দারুণ পথ অবরোধ কারুর চিত্তরঞ্জন করে কি ? আর এই রাস্তায় ক'টা গাছ আছে যে এটাকে বলা হবে অ্যাভিনিউ ?

বালিগঞ্জে কি বালি আছে ? আর টালিগঞ্জে টালি ? মোটেই না। আর খালাসিটোলায় রক্তচক্ষুদের মধ্যে দু-পাঁচজন খালাসি দেখা গেলেও বাকি সবাই যে অখালাসি ! যাক এ-নিয়ে আর কথা বাড়াব না, আমি কেবল ইঙ্গিত দিয়েই খালাস ! এই সঙ্গে যোগ করি বেহালায় কেউ একটি বেহালাও দেখেছেন কি ?

কলকাতার উপকণ্ঠে রয়েছে যশোহর রোড, কিন্তু যশোর যেতে পারবেন না সে রাস্তা দিয়ে। যশোহর বা যশোর এখন আন্তর্জাতিক সীমানার বাইরে। আর. ভি. আই. পি. রোড এখনও সকলের কাছে কাজী নজরুল ইসলামে পরিণত হয়নি। কিন্তু হোক বা না হোক ঐ রাস্তা দিয়ে যাঁরা যাতায়াত করতেন তাঁদের শতকরা এক ভাগও ভি. আই. পি. ছিলেন না।

আবার দেখুন একটা আছে তো অন্যটা নেই। সাউথ সিঁথি আছে, পূর্ব সিঁথি আছে কিন্তু উত্তর সিঁথি নেই। কেন ? এর উত্তর আমার জানা নেই। আবার সিঁথি অঞ্চলে বেশির ভাগ মানুষের মাথাতেই সিঁথি নেই, কারুর কারুর মাথায় আবার বিস্তারিত টাক !

এইবার আসা যাক দা-ঠাকুরের গানের প্রথম কথাতে—হেথায় বুদ্ধিমানে চুরি করে বোকায় পড়ে ধরা, কিন্তু এটি তো পৃথিবীর সমস্ত শহর এবং বসতিতেই সত্য। বুদ্ধিমানেই চুরি করে, বোকারাই তো ধরা পড়বে—এটাই তো দস্তুর। নতুন করে কলকাতার উপর এটা আর কষ্ট করে বলা কেন। কিন্তু কলকাতা শহরের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সর্বত্র বাঙলা চালু করার প্রতিশ্রুতির পরও রাস্তার নাম এখনও স্ট্রিট, লেন, অ্যাভিনিউ ইত্যাদি বলে থাকেন। রাইটার্স বিল্ডিং-এর নাম মহাকরণ যদি বা হয়, কেউ বিশেষ বলেন না। হাইকোর্টের নাম তো বাঙলাই করা হল না। করা যদি বা হয়ে থাকে এই অধম এখনও তা জানে না। এসবও তো একরকমের ভুল।

আর সব চাইতে বড় ভুল বোধহয় কলকাতা নিজেই। কলকাতার নাম কলিকাতা, কিন্তু ইংরেজিতে বলতে গেলেই আমরা নামটাই বদলে দিই। নাম কি বদলানো যায় ? আমরা বলি 'ক্যালকাটা'। সায়েবদের বোঝানোর জন্য আমরা নামটার বিকৃতি ঘটাই। আবার কখনও কখনও বিশেষ সায়েবদের জন্য এই ক্যালকাটার বিকৃতিরও ব্যাপক বিস্তার ঘটাই 'কালকুত্তা' নাম দিয়ে।



হিসেবের কড়ি বাঘেরা খায়

আমি কারুর সাতে পাঁচে নেই, কথাটির মধ্যে কি আছে কে জানে? কারুর সাতই বা কি, কিংবা পাঁচই বা কোথায়, কারুর সাতে কেউ থাকলে লাভই বা কি হয়, পাঁচে থাকলেই বা কি লাভ হয় এ সবের হদিশ কেউ দিতে পারে কি না আমার জানা নেই। আমাদের বাড়ির অভিধানেও কথাটার যা অর্থ দেওয়া আছে সেটা আপনিও জানেন, আমিও জানি, 'সাতে নাই পাঁচেও নাই' অর্থাৎ অভিধানে প্রাঞ্জল করেই বলা আছে 'কোন সংশ্রবে নাই'। বেশ তো এটা তো মেনেই নিচ্ছি—এটা হল প্রয়োগগত অর্থ। কিন্তু কথাটা এল কোথা থেকে। সাতে পাঁচে নেই, কথাটা আটে চারে নেই হল না কেন? হতবুদ্ধি করে দেয়। কিংবা এগারোয় বারোয় নেই বললেই বা কেউ বলবেন কেন, কথাটার কোনও অর্থ হয় না, যেন সাতে-পাঁচে নেই বললেই অর্থ পাওয়া গেল? আর এটা কেবল নেই-এর ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হল কেন, সেটাও চিন্তার কথা। সাতে-পাঁচে নেই কথাটা আছে। কিন্তু কেউ যদি কারুর সংশ্রবে থাকে তখন কিন্তু কেউ বলেন না উনি ওঁর সাতে পাঁচে রয়েছেন! ব্যাপারটা ক্রমশ প্যাঁচালো হয়ে দাঁড়াচ্ছে না কি?

এবার আর একটু গভীরে যাওয়া যাক। পাঠক সাধারণকে অনুরোধ, তাঁরা যেন গভীর বলতে বিষয়ের গভীরতা না বোঝেন। এখন, কথাটির যে অর্থটি আমরা ধরে নিচ্ছি সঠিক, অর্থাৎ প্রয়োগের দিক দিয়ে সঠিক—'কোন সংশ্রবে নাই'। কিন্তু কথাটি কি ঠিক হল? কেউ যদি অন্য কারুর সম্পর্কে বলেন, ওঁর সঙ্গে আমার কোনও সংশ্রব নেই সেটা কি মেনে নেওয়া যায়। বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার যুগে মানুষমাত্রেই পরমাত্মীয় না হলেও আত্মীয় তো বটেই। দূর সম্পর্কের হলেও আত্মীয়ই। আপনার আমার সঙ্গে এক মার্কিন ভাই-এর যেমন আত্মীয়তা তেমনি আফ্রিকার পিগমিরও। এমন কি আমাদের সঙ্গে প্রাণিজগতের যে-কোনও ক্ষুদ্রতমদেরও সঙ্গে আত্মীয়তা রয়েছে, আমি

আপনি স্বীকার না করলেও এসে যায় না। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মনে করতেন আত্মীয়তা কেবল প্রাণীর সঙ্গেই নয়—অপ্রাণীর সঙ্গেও রয়েছে আমাদের। অতএব কারুর সাতে-পাঁচে নেই-এর প্রয়োগার্থ ধরে নিয়েও কথাটার মধ্যে কোনও সত্য খুঁজে পাচ্ছেন কি ? আমাদের সঙ্গে যখন কয়লার টুকরো, পাথরের চাঁই, কুমির, মহাশূন্য, সোনার টুকরো, গুগলি ইত্যাদি প্রতিটি পদার্থ এবং অপদার্থ-র আত্মীয়তা রয়েছে তখন কারুর পক্ষেই অন্য কারুর সাতে-পাঁচে না থাকা কি সম্ভব ?

এ প্রশ্ন থাক। এ-প্রশ্নের উত্তর খোঁজার দায়-দায়িত্ব আমাদের নেওয়ার দরকার কি। কত গোয়েন্দা সংস্থা রয়েছে, এফ বি আই রয়েছে, অগপু রয়েছে, 'র' রয়েছে, সি বি আই রয়েছে, এ-নিয়ে ওঁরা মাথা ঘামান। আসল কথাটা হল, আমরা অস্পষ্ট কথা বলতে অভ্যস্ত, কেননা আমরা অস্পষ্ট চিন্তা করতে অভ্যস্ত, এমন কি যখন সংখ্যা দিয়ে ভাব প্রকাশ করি তখনও অস্পষ্টতা থেকে যায়, আর সেটা আমাদের মনেই হয় না কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার। হিসেবের কড়ি নিয়ে আমরা যত বড় বড়াই-ই করি না কেন হিসেবের কড়ি বাঘে নিশ্চয় খায়। অন্য কোনও প্রাণীও খেতে পারে, কিন্তু হিসেবের কড়ি অভ্রান্ত নয়। মুশকিল হল, সেটা যে অভ্রান্ত নয় সে বোধটুকুও আমাদের নেই।

যেমন ধরুন আমরা বলি, গোবিন্দমাধববাবু সুনীলমাধববাবুকে সাত কথা শুনিয়ে গেলেন। একেবারেই বাজে কথা, কেননা অন্তত কুড়ি মিনিটের তর্কাতর্কি হল আমরা তো দেখলাম এবং শুনলাম ! তার মধ্যে মিনিটে দু-জনে আন্দাজ শ' দুই-এক কথা বললেও হাজার চারেক কথা বলা হয়ে গেল। এর মধ্যে শতকরা আশিভাগ কথাই বললেন গোবিন্দমাধববাবু। তাহলে দাঁড়ায় তিন হাজার দু-শো ! অথচ আমরা বললাম, গোবিন্দমাধববাবু সাত কথা শোনালেন ! আর সুনীলমাধববাবুও তো গাঁই-গুঁই করে আটশো'র মত কথা বললেন সেটা যেন কিছুই নয় ? আমরা কেবল অস্পষ্ট চিন্তা করি না, আমরা তিলকে তাল করি যেমন, তেমন তালকেও তিল করি !

এইসব শুনে অনুযোগকারী কেউ কেউ বলবেন, হ্যাঁ মশাই—অমন খুঁতখুঁতে হলে চলবে কেন। সাত কথা মানে কি সাত কথা ? ওটা একটা কথার কথা—মানে অনেক গাল-মন্দ দিয়ে গেলেন কিনা গোবিন্দ মাধববাবু ? সেটা বোঝানোর ওটা ভাষার একটা কৌশল ! স্পষ্টভাবে সব কথা বলা যায় না। ভাষায় অনেকটাই থাকে উহ্য, অনেকটাই থাকে ভাসা ভাসা। ভাষার কাজ হল বোঝানো। বুঝতে পারলেই হল, নয় কি ?

তা-বেশ, তা-বেশ। ঠিকই কথা। ঠিকই বলেছেন—ভাষা তো ভাসা-ভাসাই। ভেসে চলে, ও থেকেই বুঝে নিতে হয়। সেটা কি আমাদের জানা নেই ? কথাটা হচ্ছিল সংখ্যা নিয়ে। সংখ্যার মধ্যে ভুতুড়ে কারবার ঢোকানোর তো দরকার নেই। সেখানে বারো-ভূতের আমদানি করা ভাল দেখায় ? সংখ্যার তো আর দ্ব্যর্থ থাকতে পারে না। এক তো একই, আর আড়াই আড়াই-ই। সেখানে ভাষার অস্পষ্ট ঝামেলার মধ্যে সত্যবাদী এবং স্পষ্টবাক

সংখ্যাকে এনে মিথ্যে প্রমাণ না করলেই কি চলত না?—কি রকম? সংখ্যাকে কেউ মিথ্যেবাদী বলছে নাকি?

—বলছেই তো। সকলেই বলছে। এই ধরুন, সেদিন শুনলাম কোন্ গ্রামে এক ভদ্রলোককে এক-ঘরে করা হয়েছে। দেখুন কারবার—ভদ্রলোককে আমি চিনি। গিয়ে দেখি একেবারে বাজে কথা। ওঁর বাড়ি রয়েছে দোতলা। প্রতি তলায় আটখানা করে ঘর—ইয়া ইয়া বারান্দা, তার উপর ছাতের উপর একটা নহবতখানার মতো বেশ খানিকটে জায়গা। এখন স্পষ্টই ভদ্রলোক একঘরে নন। তা আন্দামানের 'সলিটারি সেল'-এর কথা আলাদা। সেখানে বোধহয় শ' দুতিন বন্দীকে এক-ঘরে করে রাখা হত। আবার কলকাতা বা বড় বড় শহরের স্ট্যাটিস্টিকস কষে দেখুন—এক এক ঘরে কোথাও সোয়া তিন কোথাও পৌনে পাঁচ জনের বাস। এক-ঘরে হওয়ার জন্য কত লোকের কত প্রত্যাশা! অথচ এক-ঘরে কথাটা নিন্দার বিষয় হল। আরও আছে—এই যে সংখ্যাতত্ত্ব—ওটাও তো মিথ্যে। কোনও এক ঘরে কেমন করে সোয়া তিনজন লোক থাকে? বলো, তোমরা উত্তর দাও। বড় যে জিজ্ঞেস করছিলে সংখ্যাকে মিথ্যেবাদী কেউ বলেছে নাকি? এবারে বুঝলে? কেবল যে দায়িত্বজ্ঞানহীন সাধারণ ব্যক্তিরাই মিথ্যে বলেন তা নয়—অঙ্কভিত্তিক, বিজ্ঞানাশ্রয়ী সংখ্যা-তাত্ত্বিকেরাও মিথ্যের ঝুড়ি নিয়ে বসে গেছেন সব!

—আহা, কি থেকে কি? ওঁরা মিথ্যে বলবেন কেন। ও-সব তো গড়ের হিসেব। গড়ের হিসেবটা অন্যরকম।

—বেশ কথা। ও হিসেব না হয় নাই ধরলাম। গড়ের সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা নিয়ে গড়তাত্ত্বিকরা সুখে থাকুন। কিন্তু আসল কথাটা হল এই মানুষ অস্পষ্ট চিন্তা করে বলেই অস্পষ্ট চিন্তার সমর্থনে স্পষ্ট সংখ্যা এনে আরও ঝামেলা বাধিয়ে দেয়। গোবিন্দমাধববাবু হাজার হাজার কথা শোনালেও বলা হল সাত কথা। ঐ একই পরিপ্রেক্ষিতে দু-কথা শোনানোর কথাও আপনার। শুনেছেন, পাঁচ কথাও শুনেছেন। কোথায় হাজার হাজার কথা আর কোথায় সাত পাঁচ কিংবা দু-কথা? অথচ কেউ বলতে পারবে না আট কথা শুনিয়ে গেল, কিংবা চার কথা। সংখ্যা নিয়ে এই ঝামেলার শেষ নেই।

কোনও লোক হয়ত সাতে পাঁচে নেই ধরে নিলাম, কিন্তু তিনি বহু বিষয় নিয়ে সাত পাঁচ চিন্তা করতে পারেন। প্রথমে বলা হল সাত-পাঁচ মানে সংশ্রব, কিন্তু এবারে চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়িয়ে গেল। কোথায় সংখ্যা বিষয়টিকে পরিষ্কার করবে তা নয়—আরও ঝাপসা করে দিল। এ দোষ সংখ্যার নয় অবশ্যই, তবে পাকেচক্রে তাকেই তো ঠেলাটা সামলাতে হয়! ভাষা নিয়ে যদি নয়-ছয় করা হয় তাহলে সংখ্যারই ঘাড়ে দোষ চেপে বসে!

সংখ্যা নিয়ে কত কথা! সাত ঘাটের জল খাওয়ানো বললেই তার অর্থ আর আমাদের অজানা থাকে না, কিন্তু সত্যি সত্যি কি কেউ সাত ঘাটের জল খাওয়াতে পারে? পারলেও তাতে কারুর অসুবিধে কি হতে পারে? আবার সাত ঘাটের জল খাওয়ানো কথাটির উৎপত্তি দেখতে গেলে দেখবেন আপনার

অভিধানে লেখা আছে ; বালী লেজে বাঁধিয়া রাবণকে যেমন সাত সমুদ্রের জল খাওয়াইয়াছিল তদ্রূপ নাকালের একশেষ করা। কোথায় ঘাট ? সাত সমুদ্রের জল খাওয়ানোর সঙ্গে সাত ঘাটের জলের সম্পর্ক কিছু আছে ? অথচ এইসব ভাষা যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরা তাঁদের ঘাট স্বীকার করবেন না মোটেই। সাত মানে বহু ? সাত চড়ে রা বেরোয় না-র অর্থ একজনকে যতই মারো সে মুখ বুজে সহ্য করে। তা সেটা বললেই হয়, তা নয় সাত চড়ে রা বেরোয় না বলার দরকার কি ? এই সঙ্গে তাহলে মনে হতে পারে সাত চড়ে যার রা বেরোয় না আট কিংবা আটাধিক চড়ে তার রা বেরোতে পারে বা বেরোয় ? এ ব্যাপারে কবিরাও ঝামেলা পাকাতে কম ওস্তাদ নন্। এক প্রাচীন কবি লিখেছেনঃ নিম তেতো নিশিন্দে তেতো তেতো মাকাল ফল। তার চেয়ে অধিক তেতো বোন, সাত সতীনের ঘর ॥ বেশ কথা, কিন্তু দুই, পাঁচ কিংবা দশ সতীনের ঘর কি মিষ্টি ? জবাব কে দেবে ? জবাব নেই।

আপনারা শুনেছেন কারুর এক মাথা চুল ! তা একজনের আর ক-মাথা চুল হতে পারে ? কিন্তু এখানে এক মাথা চুল বলতে আপনি বুঝছেন প্রচুর চুল, অনেকদিন কাটা হয়নি—এবং এর মধ্যে কিন্তু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও আছে যে লোকটি একটু বোধ হয় অগোছাল, অন্যমনস্ক। কিন্তু কখনই শুনবেন না মেয়েটির এক-মাথা চুল ! সেখানে বলা হবে মাথা ভরা চুল। পুরুষদের এক মুখ দাড়ি—কিন্তু প্রশংসার বাক্য নয় মোটেই। কথাটি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, বার্নার্ড-শ, টলস্টয় ইত্যাদি মহাজনদের সম্পর্কে কেউ বলবেন না। এখানে সংখ্যা নিজেও নিরপেক্ষ নয়।

এখনও কিন্তু সাত নিয়ে আলোচনার শেষ হয়নি। হঠাৎ মনে পড়ল সাত-এর এক অদ্ভুত প্রয়োগ-এর কথা। আপনারা জানেন কেউ খুব সকালে বিছানা ছেড়ে উঠলে বলা হয় উনি সাত-সকালে উঠে পড়েন ! এর মানেটা কি ? এর মানে খুব সকাল—সেটা তো বোঝাই গেল। কিন্তু সাত কথাটাকে খামোখা কোত্থেকে আমদানি করা হল ? বেচারি সাত ! সে হয়ত কোথাও বিশ্রাম করছিল —হঠাৎ তাকে এমন একটা কাজে লাগিয়ে দেওয়া হল যা তার পক্ষে অনুপযুক্ত। যদি সাত-সকালে উঠলে খুব সকালে ওঠা হয় তাহলে ছ সকালে উঠলে কি হয় ? আরও সকালে ওঠা ? কিংবা আট সকালে ওঠা মানে কি দেরি করে ওঠা ? হোক না—তাহলে ক্ষতি কি ? বরং ভাষার বৈচিত্র্য বাড়ে, কিন্তু কই কেউ তো বৈচিত্র্য বাড়ান না ? কেউ তো বলেন না, মশাই—আজ পাঁচ সকালে উঠে বড় ক্লান্ত ? সাত সকাল বলতে একজন বললেন বোধ হয় হবে সকাল সাতটা। তা 'বোধ হয়' কেন ? সোজাসুজি তো আরও স্পষ্ট ভাবেই বলা যায়—আজ উনি ঠিক সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠেছেন, কিংবা সাতটা বেজে এগারো মিনিটে ঘুম থেকে উঠেছেন। অস্পষ্ট ভাবে সাত সকালে বলার কোনও অর্থ হয় ? আর সাত সকাল বলতে যদি বোঝায় খুব সকাল, সেই একই যুক্তিতে সাত রাত্রি বলতে কেউ কিন্তু বুঝবেন না খুব রাত্রি ! কিংবা সাত দুপুর খুবই দুপুর ! বুঝে দেখুন কেউ যদি লজিক দেখিয়ে বলতে চেষ্টা করেন, বুঝলেন দাদা,

গতকাল সাতরাত্রিতে আমার ঘুম এল! এই কথা বললে ভদ্রলোককে স্বাভাবিক প্রমাণ করতে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে। সংখ্যাও ব্যবহার করব, আবার লজিকও মানব না এটা একটা কিম্ভূত ব্যাপার নয় কি?

সংখ্যা ব্যবহার আমরা করি কিন্তু খুব বৈচিত্র্য নেই। এক দুই তিন থেকে কুড়ি পর্যন্তই শতকরা বোধ হয় আশিভাগ। আমরা সংখ্যা বেশি ব্যবহার করি না, মনে রাখা সহজ নয় বলে। দু-হাতে দশটা আঙুল ছিল বলেই দশ-এর প্রাধান্য রয়েছে। প্রাচীনকালে, যখন মানুষ প্রথম সভ্য হচ্ছে তখন সংখ্যা ব্যাপারটাই তাদের মাথায় আসত না। হয় এক, নয় একাধিক, বা অনেক! আমরা এখনও প্রায় সেই পর্যায়েই আছি আমাদের চিন্তাধারায়। আমরা বলি দু-তিন কোটি লোক! এখানে কোটি এতই বেশি যে সেখানে দু কোটি এবং তিন কোটির যে বিরাট ফারাক সেটা মাথাতেই ঢোকে না! সহজে বলা যায় কিনা তাই দারুণ সুবিধে বলে মনে হয়। তাতে অর্থ স্পষ্ট হোক বা না হোক। আমরা বলি, বিশুবাবু একাই এক শো! কিন্তু আরও স্পষ্টভাবে বলতে পারা যেত বোধহয় ঐ সংখ্যার সাহায্যেই। যেমন বিশুবাবু একাই দেড় গড় মানুষের সমান কিংবা দু-জনের সমান। গায়ের জোরের ব্যাপারে এটা আন্দাজি হতে পারে, কিন্তু অর্থের হিসেবে হয়ত বলা যায় বিশুবাবু একাই এক হাজার দুশো ছাব্বিশ দশমিক তিন চার। কেননা একজন ভারতীয়র গড় আয় জানা গেলে এ হিসেবটা করা চলে। পকেট যন্ত্র-গণকের যথেষ্ট আমদানি হওয়ার পর মানুষ ভবিষ্যতে হয়ত সংখ্যাগুলিকে আরও সঠিকভাবে ব্যবহার করবেন। বয়সের দিক দিয়ে বিশুবাবু একা কখনই একশো হতে পারেন না। ভারতবাসীর গড় আয়ু যদি হয় ৪৫ বছর তাহলে ৯০ বঝরের বিশুবাবু সম্পর্কে বলা যায় তিনি একাই দুই। আর যদি বিশুবাবুর বয়স যদি হয় ৪০ তাহলে বিশুবাবু একাই একও নন্! কিছু কম। কিন্তু একশো হতে গেলে তাঁর বয়স হতে হয় ৪৫০০ বছর!

সংখ্যা নিয়ে ঝামেলার এক শেষ! হাতের পাঁচ কথাটার অর্থ কি? আপনার অভিধানে যা লেখা আছে তাতে দেখবেন যার উপর আপনার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। যে ব্যাপারে আপনার কোন অনিশ্চয়তা নেই। কিন্তু হাতের পাঁচ কেন? হাতের একশো বিরানব্বুই নয় কেন বা হাতের একত্রিশ নয় কেন এ-সব সঙ্গত প্রশ্নের জবাব নেই! আর হাতের পাঁচটি আঙুল নিয়ে কথা যদি হয় তাহলে সেটা বলে দিলেই তো হয়! আবার দেখুন এই পাঁচ প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে এক ভদ্রলোকের কথা, যিনি প্রশংসায় পঞ্চ-মুখ হন। অর্থাৎ অতিমাত্রায় প্রশংসা করেন, যে প্রশংসা করতে হলে এক মুখে নাকি করা যায় না, পাঁচ মুখ লাগে!

এটা যে সম্পূর্ণ বাজে কথা তা যে-কোনও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিই বলবেন। বুদ্ধিমানও হতে পারেন, তবে খুব বেশি বুদ্ধির দরকার নেই। আপনি যে প্রশংসাই করুন না কেন বা করতে চান না কেন, তা এক মুখেই করতে পারেন, আর না পারলে শ-দেড়েক মুখেও তা পারবেন না। কখনও রাবণ প্রশংসায় দশ মুখ হয়েছেন কি? প্রশংসা করার সময়—(যেমন সীতাকে) তিনি কটা মুখ

ব্যবহার করেছেন ? আর দশ মুখে যদি একই সঙ্গে দশরকম ভাবে প্রশংসা করা হয় তাহলে তো কল-কোলাহল ছাড়া সেটাকে আর কিছুই মনে হতে পারে না। তখন প্রশংসা, না নিন্দা সেটা কেমন করে বোঝা যাবে ? অনেকে নিজের কথা পাঁচ কাহন করে বলেন, কিন্তু আমরা জানি দু-পাঁচজন এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁরা নিজের কথা কেউ সাত, কেউ একুশ কাহন করে বলে থাকেন, কেউ বা আবার তেত্রিশ কাহনও করেন, কিন্তু ভাষার এমনই দৈন্য এবং দুর্দশা যে আমাদের ঐ পাঁচ কাহন পর্যন্ত উঠেই থেমে যেতে হয়। আবার কেউ যদি নিজের কৃতিত্বের কথা মাত্র আধ কাহন বেশি বলেন আমাদের তাও বলার উপায় নেই। বলতে হবে পাঁচ কাহন-ই, নইলে বলাই যাবে না। এ-ব্যাপারে যাঁরা ভাষা সৃষ্টি করেন তাঁদের তীব্র মনোযোগ আকর্ষণ করি। তাঁরা বেরিয়ে আসুন যে যাঁর কোঠা থেকে, এবং এই সব সমস্যার সমাধান করুন !

ভাষা, সংখ্যা আমাদের চিন্তাকে কোথায় ছুটিয়ে নিয়ে যাবে ভাবের দেশে, তা নয় আমাদের সাত পাকে বেঁধে রেখেছে—গুটিয়ে রেখেছে গুটিপোকার মত ! এবং আষ্টে-পৃষ্ঠে ! কোনও লোক একটি গোপন কথাকে ষোল ব্যক্তিকে বলার পরও বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই বলা হয় যে লোকটি, বুঝলে হে, গোপন কথাটিকে পাঁচ কান করেছে। অথচ পাঁচ কান করা ব্যাপারটি কত যে দুরূহ তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন ? কথাকে পাঁচ-কান করতে হলে দু'জন লোক (ধরেই নিচ্ছি মানুষ। বেড়াল কিংবা গাধা নয়) চাই যাঁরা দুটি কানেই শোনেন আর একজনকে চাই যিনি একটি কানে কিছু শুনতে পান না, তবেই কোনও কথাকে পাঁচ-কান করা সম্ভব। অবশ্য কেউ বলতে পারেন তা কেন, তিনজন লোক এক কানে শোনেন এবং আর একজন দু-কানে শোনেন তাহলেও পাঁচ কান করা যায় (আরও উপায় আছে—এখন বুঝতে পারছি), কিন্তু ঐ যে বললাম—লোক যতই হোক তাঁদের সুস্থ কান যতগুলিই হোক বলতে হবে পাঁচ কান। এ কি ফ্যাসাদ-রে বাবা !

আবার দেখুন যেখানে বহু বোঝাতে পাঁচের ব্যবহার শোনার ক্ষেত্রে, সেখানে কাজের ক্ষেত্রে কিন্তু পাঁচ-এ কাজ হয় না। কবি বলেন, 'দশে মিলি করি কাজ, হারি-জিতি নাহি লাজ'। রাজনৈতিক বক্তা বলেন, আসুন কমরেডস—দেশের কাজে এগিয়ে আসুন, দশের কাজে এগিয়ে আসুন। যেন একটা পুরো দেশে দশজনই মানুষ ! আবার দেখুন প্রবাদেও লেখা দশের লাঠি, একেব বোঝা ! দশের লাঠি কেন ? দশটা লাঠিতেই একজনের বোঝা—পঁচিশ-জনের লাঠিও তো একজনের পক্ষে আরও বড় বোঝা ? তা সেভাবে গুরুত্ব অনুযায়ী ভাষা নিজেকে বদলাবে না কেন ? দরকার হলে কেন বলতে পারব না তেরোর লাঠি একের বোঝা ? বোঝা মুশকিল এখানে লাঠির ওজনও যেন ধর্তব্যের মধ্যেই নয় !

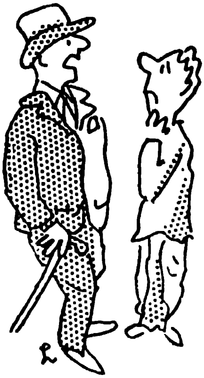
আশীবিষ-ই বা কি বস্তু ? আপনার অভিধান খুলে দেখুন কি লেখা আছে। অর্থ হল সর্প, সহজ কথায় সাপ ! কিন্তু আশীবিষ কেন ? সাপের বিষের তীব্রতা বোঝানোর জন্য ? মোটেই নয়। যেকোন সাপকেই আশীবিষ

বলা যায়। আবার সাপ বিশারদরা বলেন, বেশির ভাগ সাপের একেবারেই বিষ থাকে না। যাদের থাকে তীব্রতা সবার একরকম থাকে না। আবার প্রচণ্ড তীব্র বিষ যে-সব সাপেদের হয় তাদেরও সর্বদা দাঁতের গোড়ায় যে বিষের থলি থাকে তা ফুরিয়ে গেলে আবার তাতে জমা হতে থাকে। সাপের কামড়ে সাপের বিষের ফলেই মৃত্যু হওয়া তাই সর্বদা হয় না। চিকিৎসা না করেই কেবল ওঝার মন্ত্রে ঐ কারণেই বিষ 'নেমে' যায়। এই ব্যাপারে সর্প সমাজ নিশ্চয়ই কুপিত হয়ে রয়েছে। হঠাৎ হঠাৎ যে বিনা কারণে মানুষকে সাপে কামড়ায় শোনা যায় তা বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ বোধ হয় আছে। কিন্তু সাপ হঠাৎ আশী হল কেন? অভিধান বলছে আশী মানে দাঁত। কিন্তু ৮০টা দাঁত তো সাপেরও আছে বলে শুনিনি! কামড়াতে গেলে দুটিই তো যথেষ্ট। তাহলে ৮০টা দাঁতের বিষকে টেনে আনা কেন?

এরপর আসছি আর একটি সংখ্যার ঝামেলায়। এ-কথাটি এর আগেই আসা উচিত ছিল কিন্তু আসেনি। ঐ সময় মনে পড়েনি—কেননা সাত সতেরো চিন্তা করতে করতে কথাটাকে আমি ধরতে পারছিলাম না। সেটা হল, পাঁচ কথার এক কথা! এর অর্থ নাকি অনেক বাজে কথার মধ্যে একটা কাজের কথা। অসম্ভব এই উপস্থাপনা। পাঁচ কথার এক কথার মধ্যে এমন কোনও রকম ভাব আছে কি যাতে পাঁচটা বাজে কথার মধ্যে একটা কাজের কথা রয়েছে বলে মনে হয়? পাঁচটা বাজে কথা যদি হয় তাহলে পাঁচটিই বাজে কথা। তার মধ্যে একটি আবার কাজের হয় কেমন করে? এ-সব নিয়ে আমার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। অবশ্য বারো মাস-ই এ নিয়ে আমি দুশ্চিন্তা করি না (এখানেও দেখবেন বারো-মাস কথাটির অন্য একটি অর্থ করা হয়েছে)।

আমার এই কথাগুলির মধ্যে আসল বক্তব্য আগেই বলার চেষ্টা করেছি—হিসেবের কড়ি বাঘে খায়। বাঘ না হলে অন্য কিছুতে! সংখ্যা দিয়েও আমরা সঠিক কথা বলতে পারি না। এ-নিয়ে আমি কয়েকটি উদাহরণ দিলাম মাত্র। এগুলি যে সবই আপনাদের মেনে নিতে হবে তা বলি না। সবগুলিই যে সঠিক ভাবে বলতে পেরেছি হয়ত তাও নয়। তার কারণ আমি একটু অগোছালো মানুষ। সব ব্যাপারে আট-ঘাট বেঁধে কাজ করতে আমি পারি না যে!

[আনন্দবাজার: ১৯৮৬]



সায়েবী উচ্চারণ

স্থানের নামের উচ্চারণ আমাদের একাধিক। পানিহাটি থেকে পেনেটি করার জন্য আমাদের অবশ্য বৈদেশিক দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার দরকার হয়নি। টিরেটা বাজারকে (কিংবা হয়ত আসল উচ্চারণ হবে তিরেত্তা বাজার) আমরা টেরিটি বাজার করে দিয়েছি নিজেরাই। কৃষ্ণনগর সায়েবদের উচ্চারণ করতে কষ্ট হত বলে তাঁরা বলতেন কৃশ্‌নগর। বাস্‌ আর কথা কি, আমরাও লিখতে শুরু করে দিলাম কৃশ্‌নগর। কৃশ এখন আবার কৃষ্ণ হয়েছেন। বার্ডওয়ানও বর্ধমান হয়েছে, কৃষ্ণ এখনও সর্বত্র বিরাজমান নন যদিও। একই কথা খাটে বর্ধমানের ক্ষেত্রেও! কলকাতা কিন্তু ক্যালকাটাই। বাঙলায় বলার সময় কলকাতা হলেও ইংরেজিতে এরই নাম ক্যালকাটা, এবং অবাঙালী ভারতীয়দের অনেকেই যেহেতু বলেন কলকাত্তা, বা কালকাত্তা সেজন্য তাঁদের সুবিধের জন্য আমরা বাঙালী, যাঁরা এই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে বাস করি—আমরাও নিজের শহরের নাম বিকৃত করে থাকি। আবার জার্মানদের জন্য বলি কালকুট্টা আর ফরাসিদের জন্য স্রেফ কালকুত্তা! শহরের পোশাকি নাম যদি কলিকাতা হয়, এবং তা আমাদের স্বরবিকৃতি বা স্বর সহজের স্বাভাবিক নিয়মে সেটা কলকাতা হতেই পারে, যেমন আগেই বলেছি পানিহাটি হয়েছে পেনেটি, কিন্তু আমরা কেন আমাদের নামের বিদেশী বিকারটাই নিজেরা চালু করব এবং কোনও প্রশ্ন করব না, সেটা আমার কাছে একটু অদ্ভুত বলেই মনে হয়।

অনেক অদ্ভুত বস্তু আমরা মেনে নিই। আমাদের নিজস্বতার বোধ কম বলেই এটা সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ কথাটিই ধরা যাক। আমরা বলি বটে পশ্চিমবঙ্গ, কিন্তু এর নাম আদৌ পশ্চিমবঙ্গ নয়—এর সরকারী নাম ওয়েস্ট বেঙ্গল! আমরা এই ব্যাপারে এত উদাসীন যে এ নিয়ে এমন কি গড়ের মাঠেও কোনও প্রশ্ন তোলা হয় না। বাঙালীদের বাসস্থান কেমন করে সরকারী ভাবে ইংরেজিতে করা হল, কেন করা হল, কে করলেন, এ-নিয়ে কে আপত্তি করলেন,

কেউ করলেন কিনা সেটা আমার নিজেরও মনে নেই। মনে হয় এই প্রশ্নগুলি একবার ওঠা উচিত, এবং ফয়সালা হওয়া উচিত।

এই উদাসীনতা অবশ্য আজকের নয়। কেবল উদাসীনতাও বোধ হয় নয়। যখন সাদা সায়েবরা আমাদের দেশে এসে সর্দারি করেছিলেন তখন ভারতবর্ষ দু বাহু বাড়ায়ে তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেছিল এবং বাঙালীরা সাহেবি ধরনে হাসতেন, কাসতেন এবং সুট, শু, টাই পরে পা-ফাঁক করে সিগারেট খেতে বড়ই ভালবাসতেন। সায়েবদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে তাঁদের উচ্চারণ করার অসুবিধের কথা বিবেচনা করে আমরা নিজেরই আমাদের নামের উচ্চারণ বদলে ফেলেছিলাম। রায়দের তেমন অসুবিধে হয়নি। 'রয়' হয়ে তাঁরা বানান লিখলেন আর ও এবং ওয়াই। এই উপাধি সায়েবদের মধ্যেও রয়েছে। 'রয়' ফরাসিতে রাজা। আবার আর এ ওয়াই-এর সাহায্যে রায় লিখেও অন্য একটি ইংরেজি প্রচলিত শব্দ পাওয়া যাওয়াতে তাঁদের অসুবিধে হল না। লিপ্যন্তরে এ দুটি বানানেই রায় উচ্চারিত হতে পারে। কিন্তু হলে কি হবে, রায়রা উচ্চারণেও 'রয়' হবার চেষ্টা করলেন। টেলিফোনে পরিচয় দিতে গিয়ে কেউ ইংরেজিতে কি বলেন রায় স্পিকিং? বলেন রে স্পিকিং বা রয় স্পিকিং! অনেককেই রায় বলে পরিচয় করিয়ে দিলে ক্ষুণ্ণ হন, কেননা রায় নিতান্তই দিশি। আবার সান্যালরা সাহেবের কাছে হন সানিয়াল, কেননা সায়েবদের জিভে সান্যাল কথাটা সহজ নয় যে!

স্বদেশী ভাষা বিনাই আমাদের আশা পুরে। আদি যুগের ইংরেজ সংস্রবের ফলেই সম্ভবত ঠাকুরগণ টেগোর হয়ে গেলেন। অনেক সিংহ হলেন সিন্‌হা, নইলে সায়েবদের কষ্ট। বাঙালীদের অনেক কষ্টই তখন সহ্য হত কিন্তু সায়েবদের কষ্টটি তাঁরা সইতে পরেতেন না অনেকেই। আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় ঘাঁটি 'ঠাকুরবাড়ি'র বোধ হয় সকলেই বিদেশীদের কাছে টেগোর হয়ে গেলেন। অনেক সময়ে নিজেদের কাছেও! এর মনস্তাত্ত্বিক এবং অন্যান্য দিক নিয়ে বিদ্বানেরা গবেষণা করতে পারেন। বাঙালী নামও ইংরেজি ধরনে কেবল উচ্চারিত নয়, লেখাও হতে লাগল ইংরেজি কায়দায়। আমাদের ডি এল রায়-এর কথাই ধরা যাক। ইনি বাঙালীই ছিলেন, কিন্তু খামোখা নামের আদ্যক্ষর ইংরেজি বর্ণমালার দুটির স্মরণ কেন নিলেন? এ-সমস্তই ইংরেজদের কাছাকাছি যাওয়ার একটা চেষ্টা। অবশ্য আমরা ঠিক যে সায়েবভক্ত হিসেবেই এটা করেছি তা নয়—আসলে আমরা ক্ষমতার কেন্দ্রের প্রবল আকর্ষণে তার কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছি। এখন যেমন আমরা অন্যভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রের দিকে যাবার চেষ্টা করি। আমরা অশোক হোটেলকে বিকৃত করে বলি অশোকা হোটেল, যার কোনই অর্থ নেই। যেমন আমরা হরীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বলি হারীন চট্টোপাধ্যায়—যেহেতু অবাঙালীরা তাঁর নাম হরীন্দ্র বলতে পারেন না! আবার যে-সে অবাঙালী নয় হিন্দী ভাষী অবাঙালী, যাঁদের হাতে জাতির অর্থের সিংহভাগ। এটা যে আমরা সব সময়ে মতলব নিয়ে করি তা নয়—অনেক সময়ে এটা আমাদের

অজান্তেই ঘটে যায়।

অথচ এই আমরাই বাঙালী কেউ ইংরেজি উচ্চারণে ভুল করলেই বলি লোকটা শিক্ষিত নয়—। অথচ একজন জার্মান, ইটালিয়ান, রুশ কিংবা ফরাসী দেশের লোক যখন ইংরেজি উচ্চারণে ভুল করেন তখন সেটাকে আমরা মনে করি সেটা তো হবেই। বিদেশীরা কি ইংরেজি উচ্চারণ সর্বদা শুদ্ধ বলতে পারে? অথচ আমাদের নিজেদের বেলায় মনে করি আমরা সাদা সায়েবের জ্ঞাতি! আবার একজন আফ্রিকার কালো লোক যখন বিকৃতভাবে ইংরেজি বলেন তখন কিন্তু আমরা বলি, অসভ্য তো—কত আর পারবে? একজন ফরাসী যখন লণ্ডনকে বলেন লোদোঁ, তখন আমাদের কিছুই মনে হবে না, কিন্তু একজন কালো আফ্রিকান সেটা বললে হবে সাংস্কৃতিক দৈন্য!

আমরাও ইংরেজি উচ্চারণ ভুল করি—সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা নিজেদের উচ্চারণ যে ভুল করি এবং ইচ্ছে করেই, অনেক সময়ে সেটা আমাদের স্বাভাবিক বলে মনে হয়। আমাদের চট্টোপাধ্যায় আমাদের সুবিধের জন্য হয়ে যায় চাটুজ্জে। এতে কোন খারাপ বা অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটে যে তা নয়। পানিহাটি পেনেটি যেভাবে হয় এটাও তাই। কিন্তু ভারতের এককালীন রাজধানী বর্তমান ওয়েস্ট বেঙ্গলের রাজধানী কলকাতার টেলিফোন ডিরেক্টরি (১৯৮৪)-তে কেউই চাটুজ্জে নন্, এবং চট্টোপাধ্যায় দু রকম বানানে, এবং নটি বিভিন্ন বানানে রয়েছেন চ্যাটারজিরা।

সেদিন দক্ষিণ কোরিয়ার সোল থেকে খেলাগুলির বিশেষ বিশেষ অংশ যখন দেখানো হচ্ছিল তখন সোমা দত্তর নাম তাঁরা বলছিলেন, দুতা সোমা। দুতা? দত্ত তাঁদের উচ্চারণে যে দুতা হয়েছেন সেটা আশ্চর্য নয়। কেননা উক্ত টেলিফোন ডিরেক্টরিতে দেখছি একটি দত্ত'র ইংরেজি বানান DUTTU! দুতা-র জায়গায় দুত্তু বললেও আশ্চর্য কিছু ছিল না।

বাঙলায় দাস উপাধি দু রকম, দাশ এবং দাস। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে তিন রকম, একটির বানান অনুযায়ী উচ্চারণ হওয়ার কথা ড্যাশ! আহা, সাহেবদের মুখে ড্যাশ বড়ই মধুর শোনাতো এককালে! ডিরেক্টরিতে নেই, আমি এক দাস-এর বানান দেখেছিলাম DOSS! এ সমস্তই সায়েবদের নিকটবর্তী হওয়ার প্রয়াস।

চৌধুরীও অনেক প্রকার। লণ্ডনে আমার এক বন্ধু চৌধুরীকে সায়েবরা বলতেন চাউড্রি। আহা, কি আশ্চর্য সুন্দর! আর মিত্ররা বা সর্বদাই মিটার, বা মিটার! মুকুল নামক এক বাঙালী সহকর্মীকে সায়েবরা বলতেন, মুখুল (মুকুল বলা তাঁদের সাধ্য ছিল না), কিন্তু আমরা দু-একজনকে বলেছিলাম উচ্চারণ হবে মাকাল। সায়েবরা মাকাল উচ্চারণ করতে চেষ্টা করেও বলতে পারতেন না, বলতেন মাখাল। আমরা কিন্তু ধরে নিতাম সায়েবরা 'মাকাল'ই বলছেন!

চৌধুরী সব সমেত রয়েছেন সাত রকম। চৌধুরীর তিন রকম বানান। কিন্তু অন্যগুলি ঠিক চৌধুরী নন—তাঁদের বানান অনুযায়ী উচ্চারণ হওয়া উচিত চাউধারী, চৌদেরি, চৌধরী (বা ধারী), চাউড্রির কথা তো আগেই

বলেছ। সাহা তো অকেকেই একেবারে বার্নার্ডের এর মতই Shaw !

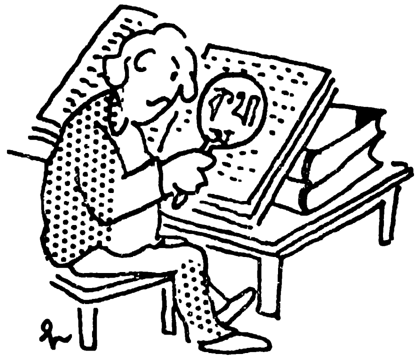
মুকুজ্জে, মুখুজ্জে, মুখুর্জে কেউ নেই, কিন্তু নানা বানানে মুখোপাধ্যায় এবং মুখার্জি। মুখার্জি রয়েছেন আট রকম বানানে, এবং মুকার্জি রয়েছেন তিন রকম বানানে। চট্টোপাধ্যায় চাটুজ্জে কেউ নেই। বাঙালীরা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লিপ্যন্তর এক্ষেত্রে কেন হয়নি সেটা ভাববার কথা। বলার সময় চাটুজ্জে আমরা প্রায়ই বলে থাকি, তাতে কারুর কোন রকম আপত্তিও করতে দেখি না, কেউ তিতো-বিরক্তও হন না, কিন্তু ইংরেজি অক্ষরে তা লেখার রেওয়াজ সৃষ্টি হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রও চ্যাটারজি লিখেছেন তাঁর ইংরেজি রচনায়, চট্টোপাধ্যায় নয়। আমরা ছোটবেলায় শুনতাম লণ্ডনের কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম ডাট্! অবশ্য এটাও ঠিক, কেউ কেউ পুরোপুরি দত্তই বলতেন।

ভৌমিকরা তেরো রকম বানান লেখেন, কিন্তু উচ্চারণে সবগুলোই ভৌমিক। তাঁদের নামের উচ্চারণ-বিকৃতি তেমন হয়নি অতগুলি লিপ্যন্তর হওয়া সত্ত্বেও, যেমন: Bhowmik, Bhaumic, Bhaumick, Bhaumik, এছাড়া রয়েছেন Bhoumic, Bhowmic, Bhowmick, Voumick, Voumic। তবু একেবারে বিকৃতি ঘটেনি বলা যায় না, যেমন—Bhomic, Bhawmic। সায়েবদের জন্য? কে-জানে। ব্যানার্জি এবং বন্দ্যোপাধ্যায়ের বানান ডজনাধিক। এগুলির মধ্যে একটিই সবচেয়ে বেশি সায়েবি, সেটি হল বনার্জি। ১০ রকম আচার্য, এগুলির মধ্যে Acharia নামটিই সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়। জে-র বদলে আই বসিয়ে এটিকে অবাঙালী উচ্চারণে পরিণত করা হয়েছে।

পাঁচ রকম বসাক রয়েছেন, Boseck এবং Bysakh এই দুটিই সর্বোত্তম, সায়েবদের জিভে এবং গলায়। এছাড়া Bysackও কম সুখের নয়।

বসুর চেয়ে 'বোস' বেশি। আবার সায়েবদের কাছাকাছি হবার জন্য ভোসও! কেউ কেউ বলেন বাসু! কত বৈচিত্র্য! উদাহরণ অনেক। আমাদের গোস্বামীও রয়েছেন দু-এক রকম, বেশি নয়। এককালে গোসাঁই কথাটাও চালু ছিল—তবে সায়েবদের মনোরঞ্জনের জন্য নয় বোধ হয়। ওটি সম্ভবত খাঁটি বাঙলার খাঁটি বিকৃতি। এদিকে ভারতীয় অবাঙালী ধনী ব্যক্তিরা বলেন গোসোয়ামী তখন মনটা খারাপ হলেও মেনে নিতেই হয়! কিন্তু সবচেয়ে বিচিত্র বানান চক্রবর্তীদের—এই ডিরেক্টরিতে যতদূর গুনেছি তাতে দেখছি এঁরা বৈচিত্র্যে ছত্রিশ। বর্তীর বানান বি-দিয়ে, ডবলিউ দিয়ে এবং ভি-দিয়ে করা হয়েছে। কেউ উচ্চারণও করেন ইংরেজি কায়দায় চক্রভর্তী! এই দলে অনেকেই ভর্তি হয়েছেন দেখি। সায়েবদের সুবিধের জন্য তাঁরা খুব বিশেষ কিছু করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তবে সম্প্রতি আমরা বি এর বদলে ভি উচ্চারণ শুরু করেছি। অনেকেই বিমলকে, বলেন ভিমল, এবং বিবেকানন্দকে ভিবেকানন্দ!

কিন্তু এ-সব বলে আর কি হবে। যার যেমন খুসি করার অধিকারের নামই তো হল সভ্যতা।



অন্তরের কথা বা কথার অন্তরে

কলমের কি কখনও জোর থাকতে পারে? যেহেতু কলমের প্রাণ নেই সেখানে তার নিজস্ব জোর থাকা সম্ভবই নয়। কিন্তু যা সম্পূর্ণ অসম্ভব তা কিন্তু আমরা আমাদের ভাষায় সর্বদাই ব্যবহার করে চলেছি। এই নিয়ে আমরা পরম নিশ্চিন্তে থাকি। তার কারণ, যা বলা হয় তার সম্পূর্ণ অন্য অর্থ অনেক সময়ে হলেও আমাদের তা গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই কলমের জোর কথাটা সম্পূর্ণ বাঁকা পথ ধরে আসল অর্থের কাছে পেঁাছে দেয়। আমরা যখন বলি অমুকের কলমের জোর রয়েছে তখন কিন্তু এটা মনে করি না অমুকের কলমটা বেশ মোটা সোটা এবং দারুণ শক্ত, যা সহজে ভাঙে না! সেটা তো নয়ই, এমন কি যাঁর কলম, তাঁর গায়ের জোর প্রচণ্ড এটাও কিন্তু বোঝায় না। এই দুটি সহজ অর্থ পার হয়ে তৃতীয় অর্থে পেঁাছুতে হয়—অর্থাৎ, কলমের জোর, যেখানে বোঝায় লেখকের বক্তব্য খুব জোরালো, কিংবা তেজী। তাই, আশি বছর পার হওয়ার পরও দুর্বলদেহ রবীন্দ্রনাথের কলমও ছিল শক্তিশালী। বৃদ্ধ বয়সে ভলটেয়ারের, বা আমাদের কাছাকাছি সময়ের বার্নার্ড শয়ের লেখনীই বা কম ধারালো ছিল? এখানে শক্তিশালী নয়, ধারালো কথাটাব ব্যবহারে আর একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হল ঐ লেখকদ্বয়ের। কিন্তু যেহেতু ভাষার লজিক এবং দর্শন বা কেবল অঙ্কের লজিক ভাষায় চলে না সেজন্য কিন্তু এই একই নিয়মে রাজশেখর বসু বা শিবরাম চক্রবর্তীর কলম হাস্যকর ছিল কিংবা কৌতুকপূর্ণ ছিল বলা হয় না। কথার অর্থ যা হওয়া উচিত তা অনেক সময়েই হয় না। কথার একটা বাইরের দিক আছে—সেটাই শতকরা নব্বুই ভাগ, সেগুলোর অর্থ সরাসরি। আঁকাবাঁকা পথ সে-সব কথা ধরে না। যেমন গোলাপ ফুল, বাঘ, বটগাছ, রাস্তা। এগুলো সহজ সরল—এঁদের মধ্যে বাঁকা কিছু নেই।

'মৈত্র মহাশয়'-এর সঙ্গে সাগর সঙ্গমে গিয়েছিলেন একদল তীর্থযাত্রী। এঁদের মধ্যে একজন নারী তাঁর শিশুকে বলেছিলেন, 'চল্ তোরে দিয়ে আসি

সাগরের জলে !' কথাটা সরল এবং সহজ যতটা মনে হয়, ততটা কিন্তু নয়। কোনও মা একথা বলেন না, বলতেই পারেন না। বললেও তা তাঁর মনের কথা তো হতেই পারে না। এবং পরে যখন ঝড়ের তোড়ে পড়ে নৌকো ডুবে প্রায় যায় তখন মায়ের ঐ কথাটি আক্ষরিক অর্থে নিয়ে কি তার পরিণতি হয়েছিল তা নিশ্চয় রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকেরা সকলেই জানেন। এবং প্রায় শেষ দিকে, শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা ? শোননি কি জননীর অন্তরের কথা ? বলায় আসল কথাটি বলা হল—যে যা বলা হয় তা সর্বদা সত্য নয়। মুখের কথা এক রকম, অন্তরের কথা আর এক রকম আমাদের চোখের সামনে অহরহ ঘটে চলেছে। আমরা অম্লান বদনে বলি দিশী মদ—যখন আমরা আসলে বলতে চাই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তৈরি মাটির হাঁড়িতে ভরা চোলাই মদ। দিশী মদ-এর আর একটা অর্থও থাকে—কম দামি, অথচ আমাদের দেশে যে সব মদ তৈরি হয় তার শতকরা একশো ভাগই দিশী এটা আমরা ভুলে যাই। এই প্রসঙ্গে চোলাই কথাটাও আমরা এমনভাবে ব্যবহার করি যেন চোলাই কথাটা একটু যেন বেআইনি অর্থও জানিয়ে দেয়। অথচ মদ তৈরি করতে হলে যে চোলাই করতেই হয়—সে অর্থে সব মদই চোলাই। হ্যাঁ, হুইস্কি, ভডকা, জিন, রাম -এসবই চোলাই মদ, এবং আমাদের দেশে তৈরি এই সব মদও দিশী ! কিন্তু কে বলবে সে-কথা ! ধরা যাক্ আমাদের অমুক বন্ধু ভারতের অমুক বড় মদ প্রস্তুত-কারকের তৈরি এক বোতল হুইস্কি পঁচানব্বুই টাকা দিয়ে কেনেন এবং পান করেন। কে বলবে যে তিনি দিশী মদ পান করেন ? বলতেই হবে তিনি বিলিতি মদ পান করেন বা টানেন। আবার দেখুন টানেন কথাটাই কেবল মদ, সিগারেট ইত্যাদি ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়। কেউ কিন্তু জল টানেন না। ঘোলের সরবতও টানেন না। এক একটা কথা এক একটা অঞ্চলে থাকে এবং বিশেষ অর্থ বহন করে। সে অঞ্চল থেকে তার বেরিয়ে আসা সহজ কাজ নয়। এই একই কথা 'দিশী' কথাটা সায়েবদের কাণ্ট্রি কথাটার এককালীন অনুবাদ। ফলে কাণ্ট্রি বোট, কাণ্ট্রি লিকার, কাণ্ট্রি গান এর অনুবাদ দিশী মদ, দিশী নৌকো, দিশী বন্দুক ইত্যাদি এমনভাবে চেপে বসেছে যে এর যে সরল অর্থ তা লোপ পেয়ে গেছে ! ভারতের ডজন খানেকেরও বেশি অস্ত্র কারখানায় আজকাল যে অতি আধুনিক বন্দুক তৈরি হচ্ছে, সেগুলিকে কেন দিশী বন্দুক বলা যাবে না সে তর্ক তার্কিকের, ভাষার নয়। ভাষার পথ আলাদা।

এই কারণে সূর্য ওঠে, রামধনু ওঠে, বেলুন ওঠে, আবার কথা ওঠে ! প্রথম তিনটি মোটামুটি বোঝা যায়—কিন্তু 'কথা ওঠে' বোঝা যায় না। তার্কিকেরা তর্ক করতে পারেন, বলতে পারেন, ওর কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু অর্থ হয় না বললেই তো হয় না, সে জবর-দখল করে বসে রয়েছে, ওকে হঠানোর সাধ্য কারুর নেই। ওকে স্বীকার করে নিতেই হয়, আর উপায় নেই। আবার বাজারে কপি উঠেছে বলি। কপি কিংবা ইলিশ কিংবা টমাটো। এটার অর্থ, বাজারে কপি বিক্রির জন্য বিক্রেতা কিছু কপি এনেছে। কপি বাজারে উঠল কেমন করে কে বুঝিয়ে দেবে ? বাজারে উঠেছে অতএব বাজারে এসেছে, জাঁকিয়ে বসেছে বা

বসতে যাচ্ছে। কিন্তু যখন গ্রীষ্মের প্রথমদিকে বলা হয় বাজার থেকে ফুলকপি উঠে গেছে, তখন বুঝি, আর ফুলকপি পাওয়া যাচ্ছে না। তেমনি ভাড়াটে যখন ওঠে, সে কিন্তু একতলা থেকে দোতলা কি তিনতলায় ওঠে না—সে সরে যায়। একটা নতুন ধরনের জুতো কিংবা জামা বহু দোকানে পাওয়া যাচ্ছে, অনেকের পায়ে গায়ে দেখা যাচ্ছে, তখন বলা হয় নতুন ধরনের জামা কিংবা জুতো 'বেরিয়েছে'। কিন্তু এগুলি কোথায় ঢুকেছিল তা কেউ জানে না। তারা বেরোয়ই বা কেমন করে সেটাও কারুর খেয়াল থাকে না। আবার যখন কোনও কিছুর উপর কারুর চোখ পড়ে তাতেও কেউ আশ্চর্য হয় না।

ভাড়াটের উঠে যাওয়ার কথা হয়েছে, কিন্তু কোনও ভাড়াটেই কিন্তু নামে না। উঠেই যায়। বা, ওঠানোর চেষ্টা করা হয়। তবে নামার অন্য ব্যবহারও যথেষ্ট। নিচের দিকেই নামা হয়—কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নয়—ব্যবসায়ে লোকে নামে। সেটা তো কোনওভাবেই খারাপ বলা যায় না, কিন্তু লোকটা নেমে গেছে বললে এক রকম মানে হয়। এর অর্থ লোকটা [নিচে] নেমে গেছে অবশ্যই, কেননা উপরে নামা যায় না। এটার সরল অর্থ মারাত্মক নয়। একটা ঘটনা। একজন লোক [ধরা যাক] ওভার ব্রিজের উপরে ছিল সে নিচে নেমে গেছে। চমৎকার ব্যাপার—কারুর কিছু বলার নেই, কিন্তু সরল অর্থটি কেবল যদি বলা যায় অমুকবাবু নিচে নেমে গেছেন তখন কিন্তু সরল অর্থটি আর থাকে না। অবশ্য বলার ভঙ্গিও এর সঙ্গে অর্থ আরও স্পষ্ট করতে পারে। এই কথাটিই একটু ফিস ফিস করে বললে তো একেবারে সোনায়-সোহাগা! আবার দেখুন কেউ সিনেমায় নামে, থিয়েটারে নামে··· । কেমন করে সে নামে, সে কোথায় উঠেছিল, এটা কিন্তু জানা যায় না। জানার দরকারও হয় না। এখানে যদিও স্পষ্ট করে বলা নেই অভিনয়ের কথা, কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই বোঝায় কেউ সিনেমা বা থিয়েটারে অভিনয় শুরু করেছে পেশা হিসেবে। উনি এখন খুব উঠছেন কথায় আবার বোঝায় উন্নতি হচ্ছে।

কথা কেউ ভেবে ব্যবহার করে না। ভেবে ব্যবহার করার অনেক বিপদ। আবার ভেবে ব্যবহার না করারও যে বিপদ আসতে পারে সেটা দেবতার গ্রাস-এ দেখা গেল। মৈত্র মহাশয়কেও শেষ পর্যন্ত জলে ঝাঁপ দিতে হয়েছিল কথার অর্থ ঠিক মত বোঝা কিংবা না-বোঝার জন্য।

ওঠার দু তিন রকম অর্থ এর আগে দেখানো হয়েছে। বসার অর্থও কিন্তু সর্বদা স্পষ্ট নয়। হরিবাবু বসে আছেন কথাটা ঠিক আছে। কিন্তু হরিবাবু বসে গেছেন কথাটা কিন্তু অতটা সরল নয়। উনি তখন নিশ্চিতই কর্মহীন, বেকার। আবার তিনি যখন পথে বসেন তখন ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়ায়। রামবাবুর দুটি ছেলেই বি. এ পাশ করে বসে রয়েছে, কথাটা কিন্তু আক্ষরিক নয়। দ-জন সর্বদা বসেই থাকে এটা ভাবাও যায় না। ওরা দুজনে শুয়েও থাকে, দাঁড়িয়ে থাকে, দৌড়য়ও নিশ্চয়, অনেক কিছুই করে। আবার রামবাবুর দুটি ছেলেই দাঁড়িয়ে গেছে মানে অর্থ রোজগার করছে নিয়মিতভাবে। কিন্তু ঐ দুটি ছেলে যখন ভিড় বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাকরির সন্ধানে বেরুত তখন

কিন্তু কেউ বলত না ছেলে দুটি দাঁড়িয়ে গেছে। অথচ কথাটা তো আক্ষরিক অর্থে সত্যিই ছিল ? আবার যখন জল দাঁড়িয়ে যায় রাস্তায় তখন জলের উন্নতি না বুঝিয়ে শহরের অবনতিই বোঝায়।

আপনি আমি যখন সিঁড়ি ভাঙি সেটা এক ব্যাপার, রাজমিস্ত্রীরা যখন ভাঙে তখন তা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। অপারেশন টেবিলে যখন ডাক্তাব কোনও রোগীর মাথা খোলেন, তখন ঘটনাটা একরকম, কিন্তু কোনও একটা সমস্যার কথা ভাবতে ভাবতে যখন কোনও গোয়েন্দার মাথা খুলে যায় সেটার অর্থ অন্য রকমই দাঁড়ায়। আবার দেখুন আপনার চিঠির জবাবে বন্ধুর চিঠি পেয়ে আপনি খুশি। কিন্তু কোনও ডাক্তার জবাব দিলেই বা আপনার মন খারাপ হয় কেন ? উকিল বন্ধু চিঠি লিখেছে পুরী থেকে, চলে আয় এখানে—দারুণ মজায় আছি। কিন্তু এ চিঠি উকিলের চিঠি হলেও এটাকে উকিলের চিঠি বলা যাবে না।

আপনি ড্রিংক করেন ? করেন। ড্রিংক না করলে জীবনই থাকে না। কিন্তু কথাটার যে অন্য অর্থ হয়ে গেছে। ইংরেজীতেও ঐ একই সমস্যা রয়ে গেছে। একই কথার নানা অর্থ হলেও কোনও একটা কথার দু-রকম বা আরও একটি অর্থ প্রধান হয়ে অন্য অর্থগুলিকে দাবিয়ে রাখে। আবার একই কথার দু-রকম বা আরও বেশি রকম অর্থ থাকে, ঘটনার বা পরিবেশের উপরই তার অর্থ নির্ভর করে। কেউ রাস্তায় পড়ে গিয়ে হাড় ভেঙে শয্যাশায়ী থাকেন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, আবার অন্য একজন রোজই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও দিব্যি হাঁটাচলা করেন ! বাঘের হাত নেই, কেন না বাঘ চতুষ্পদ—কিন্তু সুন্দরবনে বাঘের 'হাতে' মানুষ মরার খবর আমরা বছরে দু একবার দেখতে পাই, তাতে আমরা মোটেই আশ্চর্য হই না। ঘটনাটাকে অসম্ভবও মনে করি না। কেননা, সেখানে হাতের অর্থেরই বদল ঘটে গেছে। এমন কি কেউ কেউ সাপের হাতেও মরে থাকেন সংবাদপত্রে দেখে থাকবেন। এখানে বলি, সাপেরা কামড়ায় বটে, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই বলা হয় সাপে কেটেছে। বাঘ, সিংহ, বেড়াল, কুমির এরা কামড়ায়। কিন্তু সাপেরা মাঝে মাঝে কামড়ায়, মাঝে মাঝে কাটে। মানুষও কাটে। মানুষ বাঁশ কাটে, কাঠ কাটে, ঘাস কাটে, (ডাক্তার হলে) রোগী কাটে, এবং গোলমাল দেখলে কাটে। শেষেরটায় কিন্তু আর অস্ত্রশস্ত্র দরকার হয় না, দুখানি পায়ের সাহায্যেই সে তা করতে পারে।

এইভাবে ভাষা তার নিজের পথে চলে, কোনও তত্ত্বকথায় কান দেওয়ার তার সময় নেই। 'পথিক চলেছে' কথাটা বললেই আমাদের মনে হবে একটি বয়স্ক মানুষ (পুরুষ) পথ দিয়ে সম্ভবত ক্লান্তভাবে হেঁটে চলেছে। কেউ বলবেন পায়ে হেঁটে চলেছে, কিন্তু 'পায়ে' কথাটা দরকারই হয় না—কেননা কেউ হাত দিয়ে বা মাথা দিয়ে হাঁটে না। এখন, তাত্ত্বিকেরা বলবেন, পথিক পুরুষ হতেই হবে তার কোনও অর্থ নেই। নারীও হতে পারে। আবার বালক, বালিকা কিংবা শিশুও হতে পারে। কিংবা গরুও হতে পারে কিংবা পিঁপড়ে। পথ দিয়ে চলে যে সেই তো পথিক ? কিন্তু ভাষা তা মানে না। আবার একটু

আগে ব্যবহৃত বয়স্ক কথাটাও আমরা বেশি বয়স্ক বলে ধরে নিই। কম বয়স্ক মানুষও 'বয়স্ক', এমনকি শিশুও বয়স্ক।

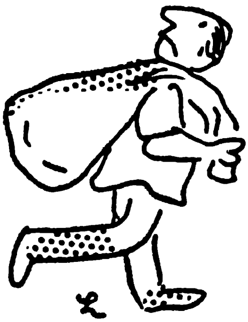
অনেকেই জিজ্ঞেস করেন কটা বেজেছে? কিন্তু প্রচুর বাজে ঘড়ি থাকলেও আজকাল কি ঘড়ি বাজে? প্রশ্নকর্তা জানতে চান কত সময় হয়েছে ঘড়িতে, অর্থাৎ দুটো পঁয়ত্রিশ মিনিট না দুটো আটত্রিশ মিনিট এই রকম সঠিক সময়। এর মধ্যে বাজবার কোনও ব্যাপার নেই। ঘড়ি এখন টিক টিক করে, আবার কোয়ার্টজ এবং ব্যাটারিচালিত ঘড়ি টিক্ টিক্ও করে না। সেই কোনকালে ঘণ্টা বাজানো হত, সেই থেকেই 'বাজা' কথাটা সময়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে! এককালে ঘণ্টা বাজত, বাজত কোয়ার্টারও, কিন্তু দুটো পঁয়ত্রিশ কিংবা আটত্রিশ বাজত না। তা হলে হবে কি, এখনও, এই আধুনিক সব ঘড়ির যুগেও ঘড়ি বাজে। আক্ষরিক অর্থে নয়, বাস্তব অর্থেও নয়, কেবল ভাবার্থে!

ধরাধাম ত্যাগ কবা মানে মৃত্যু, কথাটা এই সেদিন পর্যন্ত ঐ অর্থেই ব্যবহৃত হত। এখন কিন্তু কেউ ধরাধাম ত্যাগ করলেও মৃত বলা যাবে না। ধরাধাম ত্যাগ করে ফিরে এসেছেন অন্তত দুশো নভশ্চর। তাঁরা মরেননি। তেমনি মহাকাশ অর্থ প্রচণ্ড রকমের কাশি এই কথাটা কেউ আর বলতেই পারবেন না, কেননা মহাকাশ এখন পৃথিবীর অনেক দূরের মহাশূন্য বোঝায়।

খবরের কাগজেও নতুন নতুন কথা, ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। সবটা ঠিক অর্থ বহন না কবলেও কাজ চলে যাচ্ছে। আমরা প্রায়ই 'উন্নতিকামী দেশ' বলতে বুঝি গরীব দেশ। কিন্তু কেন বুঝি সেটাই বোঝা যায় না, কেননা, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রগুলি—যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন, জার্মানি, বৃটেন এ-সব রাষ্ট্রও তো উন্নতিকামীই? কেবল বার্মা আর শ্রীলঙ্কা কিংবা ভারতের মতো দেশই উন্নতিকামী হবে কেন। রাশিয়া, চীন এরাও কি কম উন্নতিকামী? অথচ ভাষার নিজের লাইনে সে বেপরোয়া চলেছে। ঠেকাবার সাহস কারুর নেই। আবার কেউ যখন কোনও প্রচণ্ড কাজের লোক বোঝাতে বলেন, লোকটি অক্লান্ত পরিশ্রমী, তাতে কি প্রমাণিত হয়? যিনি কাজ করেন অথচ ক্লান্ত হন না তাই তো? কিন্তু ক্লান্ত যিনি হন না তাঁকেই বেশি প্রশংসা করব, না যিনি প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়েও পরিশ্রম করে চলেন তাঁকে? বলা বোধহয় প্রয়োজন নেই যে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই অক্লান্ত পরিশ্রমী—অর্থাৎ ক্লান্ত হলেই আর পরিশ্রম করতে চান না। এই অর্থটাও করা যায়—কিন্তু করব না। খুশিমতো যা-খুশি অর্থ করার অধিকার আমাদের নেই। আবার আমাদের ভাষায় কেবলি অকথ্য অত্যাচার রয়েছে। অকথ্য আদরও হতে পারে, কিন্তু তা আমরা কখনই বলি না!

স্বেচ্ছায় রক্তদানের জন্য আজকাল কত শিবির খোলা হয় তার হিসেব নেই। খবরের কাগজে কতবারই তো কথাটা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ-যাবত স্বেচ্ছায় ছাড়া ক-জন লোক রক্ত দিতে যান এই সব শিবিরে? সকলেই স্বেচ্ছায় যান, কেননা কথাটা যখন রক্ত'দান' (দান তো লোকে স্বেচ্ছাতেই করে, নয় কি?) কাউকে কি ধরে বেঁধে জোর করে তার শরীর থেকে রক্ত বার করে নেওয়া

হয়েছে কোনও প্রতিষ্ঠানের বা হাসপাতালের জন্য এ-যাবত? তাই 'স্বেচ্ছায়' কথাটা বাহুল্য হলেও আমরা ব্যবহার করি। ভাষায় তাই আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও অনেক অর্থ থাকে। সেটা জেনে নিতে হয়, বুঝে নিতে হয়। প্রচণ্ড শক্তিধর লেখক ভাষার অসঙ্গতি কিছু দূরও করতে পারেন হয় তো—কিছু না করলেও কারুর কোনও মাথাব্যথা নেই। আবার 'আক্ষরিক অর্থ' কথাটাও কেমন যেন? অক্ষরের কি অর্থ থাকে? থাকলেও তা যৎসামান্য। অন্তঃস্থ 'য'-এর কি অর্থ, বর্গীয় জ, এই অক্ষরেরই বা কি অর্থ? হওয়া উচিত ছিল তাহলে আক্ষরিক অর্থ নয়, বাক্যার্থ। কিন্তু আক্ষরিক অর্থ কথাটা যখন চলছে তখন চলবে।



অশোধিত বাক্যাবলী

ভদ্রতা করে বলা হয় ধার, কিন্তু অনেক সময়েই আর শোধ করা যায় না। পাঠক এবং পাঠিকাবর্গ নিশ্চিত থাকতে পারেন এই অধম আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে নাক গলাতে চাইছে না। আমি বলতে চাই না, হে অমুক বাবু আপনি যে ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে সাত দিনে ফেরত দেব বলে দু-খানা বই নিয়েছিলেন সে দুটি বই আজও এই ১৯৮৮ সালের গোড়াতেও ফেরত পাই নি। কিংবা হে অমুক বিবি, যে বইখানা আমার হেফাজত থেকে আপনি দু-দিনের জন্য নিয়ে ফেরত দিচ্ছেন না আজও (সেও তিন বছর হয়ে গেল) তা নিয়েও আমার তেমন কোনও বলার আকাঙ্ক্ষা নেই। আজ আমি সম্পূর্ণ অন্য মার্গে বিচরণ করব, ফলে আপনাদের কারুরই ক্ষুব্ধ, লজ্জিত বা ব্যথিত হাওয়ার কারণ নেই। তাছাড়া, হিসেব করে দেখেছি, আপনারা যেমন আমার বই নিয়ে ফেরত দিচ্ছেন না (মেরে দিয়েছেন এ-কথা অবশ্য বলছি না) তেমনি আমিও আপনাদের অনেকের কাছ থেকে কিছু কিছু বই যেমন ধার করেছি তেমনি নগদও নিয়েছি, একবার একজনের কাছ থেকে তিন শো গ্রাম সরষের তেল ধার করেছিলাম, এ-সবই অশোধিত রয়ে গেল, এমন কি সরষের তেলও অশোধিত থাকার ফলে এখন তার দাম বেড়েছে না কমেছে ঠিক বুঝতে পারছি না, শুনতে পাই আন্তর্জাতিক বাজারে আজকাল নাকি অশোধিত তেলের দাম কমে গেছে।

আজ আমি বলতে চাই এমন একটা জিনিসের কথা যা লোকেরা দুমদাম ধার নিচ্ছে, কিন্তু একেবারেই শোধ দিচ্ছে না। শোধ দেবার ইচ্ছে থাকলেও শোধ দেওয়া সম্ভব নয়, যেমন বিদেশী কথা। বিদেশী কথা ধার নেওয়া ধার দেওয়া এবং শোধ না দেওয়া হামেশাই চলছে। এই সব ধার যে কখন নেওয়া হয় কখন দেওয়া হয় তার সূক্ষ্ম হিসেব কিন্তু সর্বদা পাওয়া যায় না। অমুক বাবুর বই, তমুক বাবুর সরষের তেল, কিংবা অমুক বিবির কাছ থেকে নেওয়া বিবিধ বস্তুর হিসেব মিললেও মিলতে পারে, কিন্তু কথা যে কখন কি-ভাবে ধার নেওয়া হয়, কখন ধার দেওয়া হয় তা জানা বেশ মুশকিলই হয়ে পড়ে। কথা অনেক সময়েই অবশ্যই ধার করতে হয়, উপায় নেই বলেই। যেমন ধরুন

পুলিস। কথাটা আমরা নিয়েছি ইংরেজ সাহেবদের কাছ থেকে। অবশ্য কথাটা এমন একটা দিশী চেহারা পেয়েছে যাতে এই পুলিসকে ফেরত দিতে গেলে ইংরেজরাও নেবে কিনা সন্দেহ! আর যদি আমরা ইংরেজদের মতো উচ্চারণ বজায় রেখে ফোলিস (ইংরেজরা অনেক সময়েই পি-এর উচ্চারণ ফ-এর মতো করেন।) ইংরেজদের ফেরত না দিলেও চলত, কেননা কথাটা ইংরেজদের নয়। এটা তাঁরা পেয়েছেন ফরাসিদের কাছ থেকে। ফরাসিরাও দাবি করেন না এটা তাঁদেরই কথা, এটি আরও আগে ছিল ল্যাটিন কথা—পলিটিয়া, তাহলে কথাটা ফেরত দিতে হয় ল্যাটিনকেই, কিন্তু তাতেও যে গোলমাল, ল্যাটিনের আগে কথাটা ব্যবহার করতেন গ্রীকরা! তখন কথাটা ছিল পলিটাইয়া। আরও যদি অতীতে যাওয়া যায় তাহলে হয়ত দেখা যাবে কথাটা এসেছে সংস্কৃত পুর থেকে। হয়ত পুর+রক্ষক থেকে নানাভাবে কথাটা ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিল কবে, কোন্ যুগে, গ্রীস, ইতালি এবং ফ্রান্স পেরিয়ে এখন আমরা বাংলায় সেটা গ্রহণ করেছি। ফেরত তাহলে কাকে দেব?

শোধ দেওয়া যাবে না 'কেন্দ্র'ও। সংস্কৃত এই কথাটা গ্রীসে গিয়ে হয়েছে কেন্ট্রো। ফরাসিতে একটা ন শেষে যোগ হয়ে হয়েছে কেন্‌ট্রন। 'কেন্দ্র' কথাটা সংস্কৃত তাতে কারুর তো সন্দেহ নেই, এমনকি রাজ্য সরকারও এতে আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না। কিন্তু হায়, এর উল্টোটাও সত্যি যে। কেন্দ্র কথাটি এসেছে গ্রীক থেকে, হ্যাঁ, সংস্কৃতও গ্রীসের কাছে ঋণী। ইতিহাসের কোন সময়ে কোন পথে মানুষ তার সংস্কৃতি নিয়ে এসেছিল বা নিয়ে গিয়েছিল তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায় না, অনেক সময়ে পাওয়া অসম্ভব হয়েও দাঁড়ায়। তদুপরি নানা সমস্যারও সৃষ্টি হয় মানা বা মানা নিয়ে। দন্ত কথাটিও কি আমরা কম ব্যবহার করি? সংস্কৃত এই কথাটিও কিন্তু এসেছে ল্যাটিন থেকে। কিন্তু এমন লোকও আছেন যাঁরা নিশ্চিত মনে ধমক দেন, "থুয়ে দাও তোমাদের ল্যাটিন, গ্রীক—ও সবই সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন।"

কোনটা যে কোত্থেকে এসেছে তা নিয়ে অলোচনা করতে বসিনি, কথাটা হচ্ছে ধার শোধ করার ব্যাপারটা। আজ যদি বাঙলা ভাষা থেকে ধার নেওয়া সব শব্দ ফেরত দিতে হয় তাহলে কি দাঁড়াবে ব্যাপারটা দেখা যাক। এ ব্যাপারে স্বর্গত সুধীরকুমার চৌধুরীর একটি রচনা থেকে কিছু উল্লেখ করছি। তিনি প্রথমেই এই ছড়াগুলোর উল্লেখ করেছেন ঃ

১॥ খোকা ঘুমোল, পাড়া জুড়োল বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরোল, চাল ফুরোল খাজনার উপায় কি?
একটু খানি সবুর কর, রসুন বুনেছি।

২॥ বাপ ধন ধন ধনা,
স্যাকরা ডেকে মোহর কেটে গড়িয়ে দেব দানা৷
তোমারা কেউ করো না মানা।

৩॥ দাদার হাতে বাজুবন্ধ ছুঁড়ে মেরেছে।

৪ ॥ খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে ?
বাড়িতে আছে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে
আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় যেতে যেতে।

৫ ॥ আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মউ,
কথা কওনা কেন বউ ?

৬ ॥ ধিনতা ধিনা পাক নোনা,
ডালভাতে ভাত চড়িয়ে দে না।

সুধীরকুমার চৌধুরী অতঃপর বলেছেন, ছড়াগুলিতে বর্গী, বুলবুলি, খাজনা, সবুর, স্যাকরা, মোহর, দানা, মানা, বাজুবন্ধ, কোমর, বাগান, তোতা, —এই শব্দগুলি ফারসী ; আতা ও নোনা পর্টুগীজ।

বুঝুন কাণ্ডখানা। ধার নিতে নিতে আমাদের আ-মরি বাঙলা ভাষা কি পর্যায়ে চলে গেছে ! কোনও এক সময়ে আমরা ফারসী থেকেই সবচেয়ে বেশি বিদেশী শব্দ নিয়েছি। বা নিতে হয়েছে। নইলে আয়না কথাটা অজানা থেকে যেত। মুকুর দিয়ে কাজ চালাতে হত। আসবাব কথাটা না থাকলে কি করতাম কে জানে। চশমা ব্যবহার করতে পারতাম না, জামা গায়ে দিতে পারতাম না, তামাশা দেখতে পারতাম না, বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারতাম না, নকল করতে পারতাম না, ইস কথাটা ভাবতেই গা শিরশির করে ওঠে, তাহলে পরীক্ষায় পাশ করতাম কেমন করে ? পেয়ালায় চা খেতে পারতাম না। পোশাক পরতে পারতাম না, বাজার করতে পারতাম না, বাজারে ফর্দ পর্যন্ত নিতে পারতাম না। আমরা মজা করতে পারতাম না, মাইনে পেতাম না, রসিদ দিতে বা নিতে পারতাম না, রাজি হতে পারতাম না, এমনকি মেজাজ পর্যন্ত দেখাতে পারতাম না। শিকার কথাটাও অসম্ভব হত। আমরা কোথাও হাজির হতে পারতাম না, সবুজ রঙ ব্যবহার করতে পারতাম না, সব্জি কিনতে পারতাম না, এমনকি হামলা পর্যন্ত চালানো যেত না ! বসে বসে যে খুশিমত তাস খেলব তারও উপায় ছিল না। তা এই কথা, ধার করা কথা কে বলবে ? কিন্তু আসলে এগুলি ধার নেওয়া এবং মেরে দেওয়া কথা। অর্থাৎ, যে কথা ধার নেওয়ার পর অশোধিতই থেকে যায়।

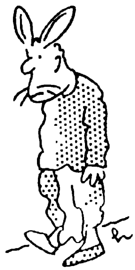
ইংরেজি এক আভধানে দেখছি ওঁরাও কথা কম মারেননি। অন্তত পঞ্চাশটি বিভিন্ন ভাষা থেকে ওঁরা সংগ্রহ করেছেন শব্দসমূহ। এইসব শব্দ নিঃশব্দেই সংগৃহীত হয়। আমরাও বহু ইংরেজি শব্দ ধার দিয়ে শোধ দিতে পারিনি। এখনও রোজই ধার করে চলেছি, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক বা কারিগরী কথা। চেয়ার, টেবিল, টেলিফোন, সোফা (এটাও আবার ইংরেজরা মেরেছেন আরবী থেকে)। যাই হোক, আমরা বোধ হয় ইংরেজদের কাছ থেকে প্রয়োজন নেই এমন অনেক শব্দ গ্রহণ করেছি—যেমন ওয়াইফ, ফাদার-ইন-ল, ব্লাড-টেস্ট (এ সব কথার বাঙলা বেশ ভালই আছে) আজকাল যেকোনও আলোচনায় বিনা প্রয়োজনে অনেক ইংরেজি শব্দ ব্যবহার হচ্ছে। টেলিভিশনে যখনই আলোচনায় কয়েকজন বসেন তাঁরা বহু সময়েই অকারণ ইংরেজি কথা ব্যবহার করেন বোধহয় তাঁরা ইংরেজি জানেন এটা বোঝাতে।

ইংরেজরা আমাদের দেশে এতদিন কাটিয়ে গেলেন, তাঁরাও কি আমাদের কিছু কিছু কথা ধার করে শোধ করেন নি ? হ্যাঁ তাও আছে। এখন ওঁদের অভিধানেও আমাদের অনেক কথা ঢুকে গেছে। অক্সফোর্ডের একটি অভিধানে দেখছি অদ্বৈত কথাটি ওঁরা নিজেদের করে নিয়েছেন, যেমন নিয়েছেন অহিংসা, আলপনা এবং আলু। তবে এই কথাগুলি 'অহিংসা' ছাড়া তাঁরা অভিধানের প্রধান বিভাগে ঢোকাননি, সম্ভবত ভারতবর্ষ সংক্রান্ত রচনার মধ্যে এঁরা ভারতীয় কথাগুলো ঢুকিয়ে দেন। সম্প্রতি অবশ্য গুরু কথাটি ওঁদের খুব প্রিয়। আশ্রম কথাটিও নতুন নতুন গুরুর কল্যাণে নানা দেশে চালু হয়ে গেছে। বাবু কথাটা অনেকদিনই ইংরেজিতে চালু হয়ে গেছে, কখনো সদর্থে, কখনও ব্যঙ্গার্থে। তবে অভিধানে ব্যাংকশাল কথাটি দেখে অবাক লাগল। ব্যাংকশাল কথাটি বেশ ইংরেজি-ইংরেজি বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে নাকি কথাটা বাঙলা। অন্তত অক্সফোর্ডের অভিধানে তাই দেওয়া আছে। এর অর্থ দেওয়া আছে গুদাম-ঘর, শুল্ক দফতর। অথচ কথাটি সুবলচন্দ্র মিত্র বা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে পাওয়া গেল না। অক্সফোর্ডের এই অভিধানে চারশো বিশ কথাটাও দেওয়া আছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে পড়ল, লণ্ডনে ৫০-এর দশকেই এই কথাটি পেঁছে গিয়েছিল। আমাদের পরিচিত চেকোশ্লোভাক বন্ধু মাইকেল স্ট্যানার্ড হঠাৎ একদিন আমাদের কোনও এক পরিচিত ব্যক্তি সম্পর্কে বলল, ওকে বিশ্বাস করো না, ও হচ্ছে একজন ফোরটুয়েণ্টি। অবশ্য, সে সব কথাই বলছিল ইংরেজিতে। মাইকেল তার অন্য কোনও ভারতীয় ছাত্র-বন্ধুর কাছ থেকে কথাটা সংগ্রহ করেছিল এবং কথাটা বেশ চালিয়ে দিয়েছিল।

একবার আমিও একটা কথা ইংরেজদের মধ্যে চালিয়ে দিয়েছিলাম। অন্তত কিছুদিন কিছু লোক কথাটা শিখে গিয়েছিল। একদিন ফিঞ্চলি রোডের কাছে একটি মাংসের দোকানে গিয়ে পরম নিশ্চিন্তে বলেছিলাম, প্লীজ, আই উড লাইক টু হ্যাভ এ পাউণ্ড অভ কিমা ! মাংসের কিমাকে যে ইংরেজিতে বলে মিন্স্ড মীট সেটা আমার জানা ছিল না তা নয়, তবে সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে মনে হয়েছিল কিমা কথাটা ইংরেজি। দোকানদার অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল কিমা ব্যাপারটা কি ? আমি আশ্চর্য হয়ে বলেছিলাম, কিমা জানো না ? কিমা হচ্ছে ঐ বস্তুটি বলে কিমা যেদিকে ছিল সেদিকটা দেখিয়ে দিলাম। দোকানদার বলল, ওটা তো মিন্স্ড মীট। তখন আমার খেয়াল হল, তাই তো বেশ ভুলই তো হয়ে গেছে আমার ! আমি বললাম, আমাকে মাপ করবেন, আমার ভুল হয়েছিল। দোকানদার বলল, না-না কথাটা তো বেশ ! (বলেছিল খীমা !) কথাটা মনে রাখব।

দোকানদার কথাটা মনে রেখেছিল কেবল নয়, চালুও করে দিয়েছিল। এরপর যতবারই ঐ দোকানে গিয়েছি দোকানদার আমাকে দেখলেই বলত, ওয়াণ্ট সাম খীমা ? কেবল আমাকে নয়, তার ক্রেতাদের প্রত্যেককেই কথাটা শিখিয়ে দিয়েছিল। এই ভাবেও কিছু কথা বোধহয় এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় !

[যুগান্তর : ১৯৮৮]



মানুষের মত মানুষ নেই !

মানুষের মত মানুষ কাকে বলা যায়—এ যাবত তার হদিশ আমি খুঁজে পেলাম না। মানুষ তো লাঙুলহীন দ্বিপদ স্তনাপায়ী যার সঙ্গে বিশালাকৃতি বাঁদরদের কিছু আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। এরকম মানুষ, স্ত্রী-মানুষ এবং শিশুর সংখ্যা সম্ভবত চারশো কোটি—সঠিক হিসেব আমার জানা নেই। এদের মধ্যে সকলেই অবশ্য মানুষের মত মানুষ নয়—কেননা, কোনও বিশেষ ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখানর সময় বলা হয় উনি একজন যে-সে ব্যক্তি নন্, উনি মানুষের মত মানুষ। যিনি মানুষের মত মানুষ তাঁকেও কিন্তু তাঁর গুণাবলীর জন্য জন্তু, জানোয়ার, কীট, পতঙ্গর উপর নির্ভর করতে হয় নইলে তাঁকে বোঝানো দুষ্কর। আর যিনি অতি বদ তাঁর পরিচয় দিতেও ঐ একই মনুষ্যেতর প্রাণীদের সাহায্য নিতে হয়। মানুষ ভাল হন খারাপ হন মানুষ কখনই মানুষের মতন নন, কেননা কোনও কোনও মানুষের থাকে গণ্ডারের চামড়া। এ আমি নিজের কানে শুনেছি, হরিহরবাবু ? ওঁর কথা আর বলবেন না, ওঁর মান-অপমান বোধই নেই, ওঁর যে গণ্ডারের চামড়া। আপনারাও নিশ্চয় শুনেছেন কথাটা। আমিও কথাটার প্রতিবাদ করিনি, আপনারাও করেননি. কেননা—আমিও কথাটা মেনে নিয়েছি, মেনে নিয়েছেন আপনারাও। বেচারা হরিহর-বাবুর গায়ের চামড়া তাই খাঁটি মানুষের হলেও বলা হল তাঁর গণ্ডারের চামড়া। ভাগ্যিস তিনি কথাটা শোনেননি তাই রক্ষে।

হরিহরবাবুর কেবল গণ্ডারের চামড়াই নয় ওঁর আরও অনেক গুণ। উনি আবার গভীর জলের মাছও ! ডাঙায় বিচরণকারী মানুষ হরিহর কেমন করে গভীর জলের মাছ হন, সেটা আমার ঠিক মাথায় ঢোকে না। ওঁর আসল চরিত্র নাকি বোঝা যায় না। কিন্তু সে জন্য সহজ করে বললেই হয়—ওঁর চরিত্র বোঝা দুষ্কর। হঠাৎ একটা গভীর জলের মাছের সাহায্য নিতে হয় কেন ? এই হরিহর অফিসের ছুটির পরও নাকি দু ঘণ্টা কাজ করেন। ওঁর স্ত্রী সরমা দেবী বলেন, উনি গাধার খাটনি খাটেন। অথচ আপনারা সকলেই জানেন, কোনো গাধা অফিসে কাজ করেন না। আবার হরিহর যখন ছোট ছিলেন তখন

ওঁর পিতা প্রায়ই বলতেন হরিহর এক নম্বরের বাঁদর। বাঁদরামিতে ওর জুড়ি নেই। এখানে কতকগুলি প্রশ্ন জড়িত। বাঁদর যা করে হরিহরও তাই করে (কিংবা, তাই করত) তাহলে বাঁদররাই বা কেন মানুষেমি করতে পারে না ? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, বাঁদরদের কি নম্বর দিয়ে রাখা আছে যে কেউ এক নম্বরের বাঁদর, কেউ দু নম্বরের বাঁদর ? কেউ আবার অন্য নম্বরের ? তৃতীয় প্রশ্ন হল —যদি তাই থাকে তা হলে সর্বদা কেন বলা হবে কেবল এক নম্বরের বাঁদরের কথা ? এ পর্যন্ত কেউ শুনেছেন কি হরিহর কিংবা অন্য কেউ দু নম্বরের বাঁদর ? এবারে প্রশ্ন—যদি কেবল এক নম্বরের বাঁদরই থাকবে তা হলে নম্বর দেওয়ার আদৌ প্রয়োজন আছে কি ? কেবল হরিহর একটি বাঁদর বললেই তো হয় ! আরও প্রশ্ন—হরিহর যদি বাঁদরই হবে তা হলে সে মানুষ কদাচ নয়। তা হলে হরিহর কেবল যে বাঁদর তাই নয় তা হলে সে অমানুষ।

এবারে এর পরবর্তী সোপানে পেঁছিনো দরকার। হরিহর অমানুষ এবং বাঁদর একাধারে দুই-ই। এতে অসুবিধে হচ্ছে না, কিন্তু সে কেমন করে মানুষের ইস্কুলে ভর্তি হয়। মানুষের মত কথা বলে, মানুষের মত ইয়ার্কি দেয়, চিড়িয়াখানায় গেলেও কেউ খাঁচায় পোরে না। তাহলে হরিহরের বাবার কথা একেবারেই মিথ্যে ? এবারে প্রশ্ন—বাবা নিজের ছেলে সম্পর্কে মিথ্যে কথা বলবেন কেন, এবং আমরা তা মেনে নেব কেন ? হরিহরের লেজ নেই, হরিহরের গায়ে বড় বড় লোম নেই, সে হুপ-হাপ করে না, গাছে বসবাস করে না, দু পায়ে চলে, পোশাক পরে। আর হরিহরের বাবা মাও তো বাঁদর নয় ! এ প্রশ্নের বা প্রশ্নাবলীর জবাব চাই।

এই হরিহরের ঠাকুর্দা ব্রজহর ছিলেন আবার টাকার কুমির ! এই কথারও একটা বিহিত হওয়া দরকার। টাকার মানুষ না হয়ে ব্রজহর কেন টাকার কুমির হলেন তার ঠিক মত জবাব দেবে কে ? টাকার কুমির বলতে যদি মনে করা হয় অগাধ টাকার মানুষ তা হলে সেটা বলতে বাধা কোথায়, কে আপত্তি করবেন কথাটার ? আবার টাকার কুমির সবচেয়ে বড় হয় কেমন করে। টাকার তিমি বললে বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হয় না কি ? কিংবা, টাকার তিমিঙ্গিল, কিংবা টাকার তিমিঙ্গিল-গিল-গিল-গিল ? কিন্তু আমাদের ভাষা টাকার কুমির পর্যন্ত গিয়েই কেন থেমে গেল তা নিয়ে রীতিমত কেন্দ্রীয় তদন্ত হওয়া দরকার।

হাতির নাকি অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। কোন এক জমিদার কবে এক হাতিকে অপমান করেছিলেন হাতির সেটা বত্রিশ বছর মনে ছিল। তাতেই হাতির স্মৃতির দারুণ পাবলিসিটি হয়ে গেল। কিন্তু কোনও হাতি অ-আ-ক-খ পর্যন্ত মনে রাখতে পারে না, সাধারণ অঙ্ক জানে না, একটা কবিতা মুখস্ত করতে পারে না তবু হরিহরের কাকার নাকি ছিল হাতির মত স্মৃতি ! এটা আবার প্রশংসা। (আবার মূর্খকেও হাতি বলা হয় যেমন হস্তীমূর্খ !) যদি হাতির আকার থেকে স্মৃতির পরিমাণ ধরতে হয় তা হলে আরও বড় জন্তুর কথা ওঠে না কেন ? তিমির কথা আগেই বলেছি, ঐ জলজন্তুকে

এখানে দ্বিতীয়বার হাজির করতে চাই না—তার চাইতে আরও বড় জন্তু (অধুনা লুপ্ত) ডায়নোসরের সাহায্য নিই না কেন। বলি না কেন ডায়নোসরের মত স্মৃতি ? এ দিকে আমরা জানি অনেক মানুষ আছেন যাঁরা আশি বছর আগেকার কথাও বেশ মনে রাখতে পারেন। তা হলে, মানুষের মত স্মৃতি বলাই বা হবে না কেন ? একবার গাধার কথা হয়ে গেছে। আর একটা কথা মনে পড়ল—হরিহব একবার, সাতবার চেষ্টা করতে একটা সাধারণ অঙ্ক কষতে পারেনি, মাস্টারমশাই বলেছিলেন, হরিহর একটা গাধা ! এর অর্থ একটাই, গাধা যেমন অঙ্ক করতে পারে না তেমনি হরিহরও অঙ্ক করতে পারে না। কিন্তু কেবল গাধা কেন ? ঘোড়াও তো অঙ্ক করতে পারে না ! ইঁদুর, ব্যাঙ, জিরাফ, হাঙর—অঙ্ক কে করতে পারে ? কেবল গাধার নামে এই অপবাদ দেওয়া কেন।

হরিহরের মামা শিবুকে বলা হত বকধার্মিক। কিন্তু বকধার্মিক কথাটা নিন্দার্থে হবে কেন ? ধার্মিক বক হওয়া কি খারাপ ? মনে আছে মহাভারতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে বকরূপী ধর্মের কথা ? কই সেখানে তো নিন্দার বাষ্পও দেখা যায়নি ? এই কথা এসেছে বককে এক পায়ে একাগ্র মনে চুপচাপ থাকতে দেখে। আসলে, চুপচাপ থাকার উদ্দেশ্য—মাছ ধরায় মনঃসংযোগ করা। দেখে মনে হচ্ছে ধ্যান করছে, আসলে মাছের দিকে নজর। কিন্তু ব্যাঙ যখন পিঁপড়ে খায়, তখন কি ব্যাঙ নাচানাচি করে ? সেও চুপ করে বসে থাকে কখন পিঁপড়ে সামনে আসবে আর সঙ্গে সঙ্গে সড়াৎ করে জিভ বার করে দু-পাঁচটা পিঁপড়ে নিযে মুখে পুরবে। এটা সহজে বোঝা যায় না—অনেক লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। আমরা বিষয়টি গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের লেখার মাধ্যমে জেনেছি বহুদিন আগে। তখন থেকেই মনে হয়েছে বকধার্মিক না বলে ব্যাঙ-ধার্মিকও তো বলা যায় ? অন্তত নতুনত্বের খাতিরে করা কি একেবারেই সম্ভব নয় ? বিদ্বোৎসাহী জনগণ এ নিয়ে একটুও কি চিন্তা করবেন না ? আবার বেড়াল-তপস্বী বলেও একটা কথা আছে। আরামপ্রিয় বেড়াল কেমন করে তপস্বী হয় ?

আজও কি মানুষকে তুচ্ছার্থে চুনোপুটি বলা সঙ্গত ? আজ এই উনিশশো ছিয়াশি সালে ? সেদিন বাজারে গিয়ে দেখি কাতলা মাছ আস্ত এক কেজি সাইজের দাম কেজি প্রতি চব্বিশ টাকা, আর চুনোপুঁটির কেজি বাইশ টাকা ! চুনোপুঁটির চাইতে কম দামী মাছ খোকা ইলিশ ষোল টাকা, পমফ্রেট পোনের টাকা, ছোট মৃগেল চোদ্দ টাকা। তা হলে তুচ্ছার্থে বা ক্ষুদ্রার্থে পুঁটির ব্যবহার কি অত্যাবশ্যক ? এখন চুনোপুঁটির বদলে খোকা ইলিশ বলা যায় না কি ? কিংবা ছোট মৃগেল।

কিন্তু এ সব প্রায় আমার মূল বক্তব্যের কিছুটা বাইরের। আমার মূল বক্তব্য হল মানুষের বর্ণনায় জীবজন্তুর ব্যবহার হবে কেন ? ইংরেজিতেও তাই দেখতে পাই। প্রিয় রাজাকে ওঁরা, অর্থাৎ ইংলণ্ডীয় সায়েবরা নাম দিয়েছেন লায়ন হার্টেড। সিংহের হৃদয় কি খুব উদার ? কে জানে, খিদে পেলে

তারা নিরীহ মানুষও খায়—নিরীহ পশুদেরও খায়। বরং মোটামুটি নিরীহ গরুরা তুলনায় অনেক বেশি লায়ন-হার্টেড।

মানুষ যখন আরামপ্রিয় হয় সে মানুষের চরিত্রেরই একটা দিককে উদ্ভাসিত করে—কিন্তু সে জন্য একটা বেড়ালকে টেনে আনার কোনও অর্থ হয়? বেড়ালের মত আরামপ্রিয় বলতে তো খুব শুনি। বেড়াল আরামপ্রিয় হতেই পারে, আপত্তি নেই, কিন্তু আরশোলা কি আরামপ্রিয় নয়? অথচ হাজার হাজার উদ্বৃত্ত আরশোলাকে এই কাজে লাগিয়ে দেওয়া যেত! বেড়ালরা তবু তো নিজের খাদ্যের জন্যই হোক, বা স্পোর্টের জন্য হোক ইঁদুর ধরে, কিংবা ইঁদুরদের অন্তত ভয় দেখায়। ঐ থেকেই হরিহরের এক মামা শিবভদ্রবাবু অফিসের এক অপ্রীতিকর বিষয় বড়বাবুকে জানানোর প্রস্তাবে বললেন, না বাবা, আমি বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে পারব না। এখন ইঁদুর, এবং বেড়াল নিয়ে এক কাল্পনিক কাহিনীর সঙ্গে বাস্তবতার মিল জোর করে খুঁজে দিব্যি ঘুরিয়ে বললেন, যে কাজটার কথা বলা হচ্ছে সেটা খুবই সাহসের কাজ। এদিকে বড়বাবুও বেড়াল নন আর শিবভদ্রও ইঁদুর নন, অথচ কথার মধ্যে বেড়াল এবং ইঁদুরের আমদানি করা হল। এ সবই মানুষের ভাষার কিংবা উপলব্ধির দৈন্যই প্রকাশ করে। অহি-নকুলকেও মানুষের ব্যবহারের ক্ষেত্রে টেনে নামানো হয়—দরকার ছিল না তার।

বাঘ নিয়েও কত আদিখ্যেতা। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তো নামই হয়ে গেল বাঘ! যে সে বাঘ নয়, বাঙলার বাঘ। বক্তব্য বোধ হয় এই যে, আশুতোষের রাহস ছিল বাঘের মতো। কিন্তু বাঘ সর্বদা সাহসী হয় তা নয়—আমি একবার বাঘ শিকার করতে গিয়ে দেখেছিলাম বাঘের প্রাণভয়ে পলায়ন। পলায়নপর বাঘই বেশি দেখা যায় এ কথা শিকারীরা বলেন। তা হলে বাঘের সাহসটাই তার চরিত্র, তার পলায়নপরতা অথবা পলায়ন তৎপরতা? বাঘকে যদি গুণী বলতে হয়, তা হলে বাঘ মারাকে নিশ্চয় সৎ কাজ বলা যায় না—কিন্তু বাঘকে মারতে পারলে শিকারীকে বীরের সম্মান দেওয়া হয়। প্রচণ্ড খাতির করা হয়। এর প্রমাণ মিলবে জিম করবেট ইত্যাদি শিকারীদের বর্ণনায়।

মানুষ যখন চতুর হয় তখন দেখা যায় সে তখন আর মানুষ থাকে না, বলা হয় সে শেয়ালের মত চতুর। শেয়াল চতুর ঠিকই, কিন্তু মানুষের চাইতেও চতুর?

কেউ ধীরেসুস্থে কাজ করলে বলা হয় অমুকের শম্বুক গতি। শম্বুক মোটেই ধীরগতি নয়। ওদের পক্ষে যতখানি গতি সম্ভব ততখানি সে দ্রুত চলে। দেহের ওজনের তুলনায় শামুককে ধীরগতি বলে মনে হতেই পারে। তবে বিরাট আকার অথচ ধীর গতি এমন ব্যাপার কেবল শামুকেরই রয়েছে তা নয়। একটি হিমবাহ বিরাট আকারের হতে পারে, এবং কখনও কখনও এর গতি বছরে কয়েক ইঞ্চিও হতে পারে! এর চেয়েও ধীরগতি হল মহাদেশ! এক কালে পৃথিবীর সমস্ত জমি এক ছিল—অর্থাৎ ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা,

অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার মধ্যে ছিল না ব্যবধান, এই মহাদেশগুলির মধ্যে ছিল না সমুদ্র। পরে আস্তে আস্তে ভেসে ভেসে বিচ্ছিন্নতাবাদী মহাদেশগুলি দূরে চলে যায়। বহু ভূতাত্ত্বিক এই বিষয়টি প্রায় প্রমাণই করে ফেলেছেন। মনে হয় বস্তুর তুলনায় এর চেয়ে ধীরগতি আর কিছু হতে পারে না। বছরে হয়ত কয়েক সেণ্টিমিটার!

পুঁটিমাছের প্রাণ দুর্বল মানুষ সম্পর্কে প্রযোজ্য হয়—জল থেকে ডাঙায় তুলবার কিছুক্ষণ পরেই পুঁটি মাছ মরে যায়। কিন্তু দুর্বল মানুষও অনেক-দিন নয়, অনেক বছর বেঁচে থাকে। আবার শক্তসমর্থ মানুষকেও তো জলে ডোবালে কিছুক্ষণের মধ্যেই অক্কাপ্রাপ্ত হন, তা হলে কেবল পুঁটিকে দোষ দিয়ে লাভ কি? গড়ে একজন ভারতীয়র আয়ু বোধ হয় পঞ্চাশ বছর। পুঁটি মাছের প্রাণের সঙ্গে মানুষের প্রাণের তুলনা করা চলে কি?

মানুষ যদি কম খায় তা হলে বলা হয় স্বল্পাহারী। তুলনা করা হয় পাখির সঙ্গে। পাখিরা কম খায়, এটা একটা ধারণামাত্র। এর মূলে বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই। চড়ুই পাখির মত পাখিও ক্রমাগত দানা খেতে থাকে, হজম করতে না পারলেও একজন আশি কেজি ওজনের মানুষের আধ কেজি খাদ্য খেলেই পেট ভরে যেতে পারে, সেখানে একটি আশিগ্রাম ওজনের চড়ুই পাখি দশ পনের গ্রাম শস্য খেয়ে নিতে পারে। ঐ একই কৃতিত্ব দেখাতে একটি মানুষকে খেতে হয় অন্তত দশ পনের কেজি! তা হলে কম খাওয়ার সঙ্গে পাখির খাওয়ার তুলনা করা অন্যায় নিশ্চয়। কোনও মধ্যপন্থী বলতে পারেন, তা কেন—একটি পাখি এবং একটি মানুষের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে। একটি চড়ুই যে পরিমাণ খায় সে পরিমাণে যদি কোনও মানুষ খায় তা হলেই বলা হয় পাখির আহার।

কিন্তু পাখি বলতে চড়ুই ধরব কেন। একটা ময়ূরের কথাও তো মনে হতে পারত। ময়ূর নাকি সাপ খেয়ে নেয়—কিংবা শকুন! সেও তো পাখি! শকুনে কি খায় সেটা বলার দরকার নেই, অনেকেই দেখেছেন। কেজির পর কেজি পচা মাংস খেতে তাদের জুড়ি নেই। আর উটপাখি? একটি উটপাখি যা খেতে পারে তার হিসেব পাবেন চিড়িয়াখানায়—আন্দাজে বলছি, একটি খাইয়ে বলে নামকরা পূর্ণ স্বাস্থ্য যুবক একটি পূর্ণ স্বাস্থ্য উটপাখির সঙ্গে খাওয়ার প্রতিযোগিতায় হেরে যাবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি পাখির কথা মনে হচ্ছে। সম্পূর্ণ শান্তশিষ্ট পাখি ঘুঘু, কিন্তু কোনও বদমায়েশ এবং চতুর ব্যক্তিকে কেন বলা হবে ঘুঘু?

বাদুড়ের মত অন্ধ? একেবারে বাজে কথা। বাদুড়েরা অন্ধকারে যেভাবে উড়ে বেড়াতে পারে তা প্রায় ভৌতিক কাণ্ডই বলা যায়। বাদুড়েরা দিনের বেলাতেও অন্ধ নয়। ওদের নাইট ডিউটি থাকে বলে ওরা দিনের বেলায় ঘুমিয়ে নেয়। সব বাদুড়েরই নাইট ডিউটি থাকে। এ কথা কেতাবে লেখা আছে। আরও লেখা আছে আমার পুরনো এক বিশ্বকোষে "দি ভিসনারি সেন্স ইজ রিমার্কেবলি স্ট্রং"! কেবল তাই নয় ঐ কেতাবে আরও বলা হয়েছে বাদুড়ের ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং স্বাদ নেওয়ার ক্ষমতাও খুবই বেশি। তা হলে

বাদুড়ের মত অন্ধ বলার দরকার কি, কেবল অন্ধ বললে কি কথাটা বোঝা যায় না নাকি ?

আরও একটা অতিশয় বাজে কথা প্রচলিত আছে সঞ্চয়ী মানুষ সম্পর্কে। বলা হয়, হরিহরের পিসেমশাই গোপেশবাবু মৌমাছির মত সঞ্চয়ী। গোপেশবাবুর ডাকঘরে এবং ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রয়েছে, মাসে মাসে সেখানে তিনি টাকা জমা রাখেন ভবিষ্যতের জন্য। কোনও মৌমাছি ডাকঘরকে বিশ্বাস করে না, ব্যাঙ্কেও তারা টাকা জমা রাখে না। তারা কেবল মধু জামায়, তাও নিজেদের তৈরি ঘরে। গোপেশবাবু যদি বাড়িতে মধু জমাতেন তা হলে হয়ত বলা যেত মৌমাছির মত সঞ্চয়ী ! সঞ্চয়ী বহু পতঙ্গও। পিঁপড়েরাও "বৃষ্টির দিনের জন্য" চিনি জমায়—আরশোলার ঠ্যাংও জমায়, দেখে থাকবেন। এ-সবই কিন্তু কয়েকটা মাসের জন্য। মানুষ জমায় কেবল নিজের শেষ বয়সের জন্য নয়—পরিবারের সকলের জন্য। সেই কারণে কোনও মানুষর সঙ্গে পিঁপড়ের তুলনা করা নিতান্তই বেমানান। দুরকম জীবের দুরকম জীবন-যাত্রা। মানুষদের পেনশন থাকে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থাকে। পিঁপড়েদের থাকে না। হরিহরের পিসেমশাই মানুষের মতোই সঞ্চয়ী, মৌমাছির বা পিঁপড়ের মত নয়।

এ সব কথা মনে আসছে। বাদ পড়ে যাবে অনেক কথাই, কেননা আমি সব কথা এক সঙ্গে বসে মনে আনতে পারি না। আমার এক বন্ধু এই লেখা পড়ে অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, এ লেখা কেমন হয়েছে ? উনি আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, ঘোড়ার ডিম হয়েছে !



সংক্ষেপে বলিতে গেলে

আলস্যের চরম নিদর্শন দেখাতে গিয়ে এক গল্পকার কবে এক গল্প ফেঁদে-ছিলেন, তাতে দুই অলস যখন দিবানিদ্রায় শুয়ে রয়েছেন তখন বাড়িতে লেগেছে আগুন। সকলে, কেউ প্রাণবক্ষায় ব্যস্ত, কেউ আবার মূল্যবান জিনিসপত্র সামলাচ্ছেন, কিন্তু দুই অলস গোলমালে জেগে উঠলেও গা ওঠাচ্ছেন না, শুয়েই রয়েছেন। আগুনের বিস্তার যখন ব্যাপকতর তখন আগুনের আঁচ এসে লাগছে। একজন শুয়ে শুয়েই বললেন, পিপু, উত্তবে অন্য জনেব সংক্ষিপ্ত উপদেশঃ ফিশো। এর মর্মার্থ সকলেই জানেন, তবু বলি, প্রথম জনের বক্তব্য ছিল পিঠ পুড়ছে। অন্য অলস বললেন, ফিরে শোও! অলসদের নিয়ে এই জাতীয় ব্যঙ্গেব দৃঢ় প্রতিবাদ জানাই, কেননা, ঐ ব্যঙ্গের আঁচ আমার গায়েও যে লাগে! তা ছাড়া, আলস্য একটা দোষ হিসেবে তার বিরুদ্ধে নানা নিন্দা শোনা যায়—কিন্তু আলস্য একটা যে গুণও, সেটা অনেকেরই মনে থাকে না, কিন্তু সে অন্য কথা।

সংক্ষেপে বলার ব্যাপারটা কিন্তু অলসদেব উদ্ভাবন নয়। অলসদের সাধ্য নেই সংক্ষেপ করাব জন্য কষ্ট স্বীকার করা। এ ব্যাপারে কারুর সন্দেহ উপস্থিত হলে দ্রঃ রবীন্দ্রনাথের হিং টিং ছট্ কবিতাটি। তাতে গৌড়ীয় সাধু এক প্রহর ধরে বললেন, নিতান্ত সরল অর্থ অতি পরিষ্কার, বহু পুরাতন ভাব নব আবিষ্কার···এর পর আরও বললেন, ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ, শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ, বিগুণ এবং আরও কয়েক লাইন পর তিনি ঘোষণা করলেন, সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট্। এগারো লাইনকে তিনটি বাক্যে প্রকাশ করাকে কেউই অলস ব্যক্তির কর্ম বলে মনে করবেন না নিশ্চয়। আইনস্টাইনের বহু বছরের গবেষণার ফলও তিনি অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করেছিলেন, যার ফলে বিজ্ঞান জগতে একটা বিরাট বিপ্লবই হয়ে গেছে।

ফর্মুলাটি আজ অতি পরিচিত, কিন্তু আমার মনে নেই। এটি এখন বোধ হয় কে. জি.-র ছাত্ররাও জানে। যাই হোক, আসল কথা হলো, সংক্ষেপ করা খুব সহজ কর্ম সর্বদা নয়।

টেলিগ্রাফ যখন চালু হল, কিংবা বোধ হয়, তার আগে থাকতেই, ছাপাখানার প্রয়োজনে বাক্য সংক্ষেপ করার প্রয়োজন দেখা দিল। পাঁচ কথা তারে পাঠাতে যত খরচ, দশ কথা পাঠাতে তার চাইতে খরচ বেশি, দ্বিগুণ। তাই, খরচ কমানোর জন্য বাক্য কমাও। আড্ডায় যে-ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি কথা বলেন, এবং 'বললে কথা থামায় কে' তিনি আবার টেলিগ্রাফ করার সময় পোনেরটি বাক্যকে কত কমানো যায় সে জন্য দু ঘণ্টা নীরবে কাগজের উপর কাটাকুটি করেন। ছাপাখানাতেও অক্ষর কমানোর সমস্যা দেখা দিল, তাই বি. দ্র. লেখা হতে লাগল বিশেষ দ্রষ্টব্য লেখার বদলে। বিশেষণের জায়গায় বিণ, বিশেষ্যর জায়গায় কেবল বি, প্রাদেশিকের জায়গায় প্রাদে, অব্যয়-এর জায়গায় অঃ, অসমাপিকা ক্রিয়ার জায়গায় অসঃ ক্রি, এবং ইত্যাদির জায়গায় ই.। এ ছাড়াও উঃ পুঃ লেখা হল উত্তম পুরুষের জায়গায়, অ্যাং স্যা লেখা হল অ্যাংলো স্যাক্সন-এর বদলে। বৌ বাং দেখে প্রথম প্রথম কেউ কেউ চমকিত হলেও যখন বুঝলেন বাঙাল বৌ-এর কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে বৌদ্ধযুগের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য, তখন একটু স্বস্তি পেলেন। এবং এর পরই ম বাং দেখে অনুমান করলেন ওটি মধ্য যুগের বাঙলা। তা অনুমান সঠিক! ঐ একই মেজাজে থাকার সময় লিথু দেখে লিথুয়ানিয়া ভাষার কথা মনে আসবেই, অসুবিধে তেমন নেই। স্ত্রীং কথাটা এখন আর অপরিচিত নয়। কেউ কেউ বলেন স্ত্রীকে ছোট করা যায় না—করা অবশ্য উচিতও নয়, সেই কারণেই স্ত্রীর সঙ্গে একটু 'ং' এর সংযোজন করা হয়েছে, তাঁদের মান বাড়ানোর জন্যই। আবার পণ্ডিতেরা বলেন, তা কেন—স্ত্রীলিঙ্গ কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ হল স্ত্রীং। তাই বোধ হয় হবে।

কে যেন স্টিম ইনজিন আবিষ্কার করেছিলেন, তাঁর নাম বইয়ে লেখা আছে বলে আর কষ্ট করে দিলাম না, কিন্তু তারপর থেকে মানুষকে, অন্তত বেশ কয়েক কোটি মানুষকে সেই ইঞ্জিন দারুণ ছুটিয়ে মারছে। এমনকি অলস লোকদেরও অনেক সময় পরিত্রাণ থাকে না। কারখানা চলছে, ট্রেন চলছে, স্টিম দিয়ে যেমন কারখানা চলছে, আবার কারখানায় বিদ্যুৎ তৈরি করে সেই বিদ্যুৎ দিয়ে মানুষকে ছুটিয়ে মারছে! ছুটতে ছুটতে মানুষ ভাবছে সংক্ষেপ, সংক্ষেপ, সংক্ষেপ! মন্ত্র জপ করছে কম সময়ে বেশি কেমন করে করা যায়। অলস লোকেরাও এর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। যেন ইঁদুরের দৌড় প্রতিযোগিতা! বাঙলায় কথাটা তেমন অর্থবহ নয়, ইংরেজিতে বললে নাকি ভাল বোঝা যায় র‍্যাট রেস্! এরই পাল্লায় পড়ে বড় বড় কথাকে ছোট করার এক বিশ্ব প্রতিযোগিতা চলছে।

বাঙলায় বিশেষ কাজ হয় না—আমাদের গল্প-গাছা, আড্ডা এসবে বাঙলা চলে, কিন্তু টেলিগ্রামে পর্যন্ত বাংলার ব্যবহার প্রায় নেই। হায়রে পঃ বঃ

সরকার ! বহুবার ঘোষণা সত্ত্বেও ফাইলের গায়ে এখনও ইং গং লেঃ অর্থাৎ কিনা ইংরেজি গন্ধ লেপটে রয়েছে। এই কারণেই বাঙলায় সংক্ষেপ করার প্রয়োজন তেমন হয় না। তবু, কথা মেপে যে সব জায়গায় দাম দিতে হয়, সে সব জায়গায় সংক্ষিপ্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে, এবং চালুও হয়ে যাচ্ছে। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সময় হিসেবি লোকেরা দেখেছেন দশ লাইনের জায়গায় ছ লাইনে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারলে খরচ কমে যায় প্রায় শতকরা চল্লিশ (আঃ)। এই আঃ কোনও খোঁচা খাওয়ার পরবর্তী আর্তনাদ নয়, এর পূর্ণরূপ হল আনুমানিক ! এই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠাগুলিতেই দেখা যায় নানা আশ্চর্য সব সংক্ষিপ্ত বাক্য। যেমন ওঃ এড়ুঃ এটির আসল বক্তব্য বুঝতে একটু সময় লাগতে পারে প্রথম প্রথম, কিন্তু অভ্যেস হয়ে গেলে আর এটিকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। তাই একটু খটকা লাগলেও ডা-হা-রোড যে ডায়মণ্ড হারবার রোড সেটা দু-একবার দেখলেই চালু হয়ে যায়। বাঙলা অধিকাংশ সংক্ষিপ্তসার কিন্তু সবই দ্রঃ অর্থাৎ দ্রষ্টব্য, উঃ নয় অর্থাৎ, উচ্চারিত নয়। কেউ বলেন না ডা-হা রোড, বলবার সময় কিন্তু পুরো ডায়মণ্ড হারবার রোড।

বিয়ের বিজ্ঞাপনে সংক্ষেপ ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে এসেছে। একটি বিজ্ঞাপনে দেখি ঃ পুত্র হাঃ সেঃ কেঃ সঃ কঃ পঃ বঃ কাঃ, এর পুরো কথাটা নিশ্চয়ই ঃ পুত্র হায়ার সেকেণ্ডারি, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, পশ্চিমবঙ্গের কায়স্থ। ২৯টির জায়গায় ১০টি (যুক্তাক্ষরকে এক ধরা হয়েছে), খারাপ কি ? পঃ গঃ অর্থাৎ পরগনা, কাঃ হচ্ছে কাঠা, জায়গা বুঝে। জমি বিক্রয়ে কাঃ কায়স্থ নয়। বিয়ের বিজ্ঞাপনে প্রায়ই দেখা যায় পাত্র চাই সঃ অঃ/ব্যাঃ অঃ/ইঃ/ডাঃ-এর অর্থ প্রাঞ্জল করার দরকার আছে ? যাঁরা বিজ্ঞাপন দেখেন না তাঁদের অবগতির জন্য জানাই, এর অর্থ হল সরকারি অফিসার/ব্যাঙ্ক অফিসার/ইঞ্জিনিয়ার/ডাক্তার। সুখের কথা, এই সংক্ষেপ করার ব্যাপারটি সংবাদ বিভাগে তেমন হানা দেয়নি। হানা দিলে পিস্তল সহ ডাঃ ধৃত এমন কথাও চলবে কোনও দিন, এবং এই ডাঃ ডাকাত না ডাক্তার তা নিয়ে একটুখানি তদন্তের প্রয়োজনও হবে। এবার আসা যাক অন্য একটি কথায়—কেঃ সঃ/আঃ মানে কি ? কেন্দ্রীয় সরকারী কথাটা ঠিক আছে, কিন্তু এই আঃ ব্যাপারটা কি ? এখানে কথাটা আনুমানিক হবে। না, হবে আধা। অর্থাৎ আধা সরকারি কর্মচারি।

ভেলে কঃ রঃ মানে কি ? মাথা একটু খাটালেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ভেল-তো জানা, ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস্ লিমিটেড-এর ইংরেজি সংক্ষিপ্ত বিবরণের বাঙলা উচ্চারণ। বাঙলায় লিখতে হলে লিখতে হত ভাহেইলিঃ। বেশ কথা, কিন্তু কঃ রঃ, অর্থ ? কর্মরত নিশ্চয়ই (যদিও সুপারভাইজার না থাকলে ইনি সর্বদা যে কর্মরত নাও থাকতে পারেন সেটা অনুমান করে নিতে হবে। সব কথা তো লেখা যায় না ?) কেঃ সঃ চাঃ ইউঃ ডিঃ কলিঃ-এর অর্থ এখন আশা করি তেমন সময় নেবে না। এর মধ্যে ইউঃ ডিঃ কথাটা নতুন। কথাটা আপার ডিভিশন। আঃ ডিঃ-ও চলতে পারত। পরিবারের আঃ নিঃ

পূঃ বঃ-এর অর্থ বোঝা খুব শক্ত নয়। আদি নিবাস পূর্ববঙ্গ, এই কথাটা বোঝানোর জন্যই এই সংক্ষিপ্ত ভাষা। আর কো-চা-র সঙ্গে কোঁচার কোনও সম্পর্ক নেই, এই এটি হল কোম্পানি চাকুরে। কেউ কেউ লেখেন কোং চা। মিঃ মিস্টার নিশ্চয়ই, কিন্তু বিয়ের বিজ্ঞাপনে এটা মিটার। এখনও কখনও সে. মি. অর্থাৎ সেণ্টিমিটারও।

উঃ মাঃ যে উচ্চ মাধ্যমিক সেটি আমরা এতদিনে ভাল করেই জেনে গেছি। কিন্তু অসুবিধে একটু হয় মিউস. কে মিউজিক ধরে নিতে! আর নাঃ মাঃ বিবাহ বুঝতে আমাদের এগারো মিনিট সময় লেগেছিল। এর অর্থ নামমাত্র বিবাহ। এর আসল ঘটনা কি হতে পারে তা নিয়ে ঘণ্টা দেড়েক আমরা কথা বলেছি। নাম মাত্র বিবাহ? বিবাহ করার পর কত দিন একসঙ্গে থাকলে সেটা নাম মাত্র হয়? না কি এর অন্য কোনও ব্যাপার আছে যা আমাদের পক্ষে অঃ করাও সম্ভব নয়? মাঃ ফেল কথাটি বুঝতে কষ্ট না হলেও ব্যাপারটি করুণ।

ব. ফু.—বর্গ ফুট আর ব. মি. বর্গ মিটার—এগুলির দেখা পাওয়া যাবে জমি, সম্পত্তি কেনা বেচা বিভাগে। রেঃ অর্থাৎ রেভারেন্ড, কিন্তু ডেঃ কথাটার অর্থ? কেবল ডেঃ বললে বোঝা শক্ত। কিন্তু শিক্ষক (ডেঃ) বললে দুরকম অর্থ দাঁড়ায়। ডে স্কুলের শিক্ষক বোঝায়, বা শিক্ষক ডেপুটেশনে রয়েছেন তাও বোঝায়। টেঃ অপারেটর বলতে বোঝায় টেলিগ্রাফ অপারেটর, এবং রাঃ সঃ চাঃ বললে বোঝাবে রাজ্য সরকারি চাকুরে।

বললে বোঝা যাবে, কিন্তু এই কথাগুলি কেউ বলেন না, লেখেন। তাও সর্বত্র নয়—কেবল বিজ্ঞাপনের পাতাতে। ব্যাঃ কঃ অর্থ ব্যাংক কর্মী। উঃ মানে কেবল উত্তর নয়, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের কলমে এর অর্থ হতে পারে উচ্চ, উকিল, উদার। জায়গা বুঝে অর্থ বদলে যায়। আমরা ইংরেজির সংক্ষেপ নিজেরা কথায় বলতে অনভ্যস্ত নই, কিন্তু বাঙলার সংক্ষেপ বিশেষ বলতে চাই না। তবে ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে। মনে পড়ছে বি বা দী বাগের এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জায়গায় দ-পূ-রে-র কথা এবং হাওড়া ফায়ার সার্ভিসের জায়গায় হাঃ ফাঃ সাঃ। বাঙলার সব সংক্ষিপ্ত বাক্য অবশ্য উচ্চারণীয় নয়। অনেক-গুলিকে সাবধানে বাদও দিতে হতে পারে। ধর্মতলা পাঁচালি সংঘকে ধঃ পাঁঃ সঃ লিখলে না হয় একরকম চলে যাবে, কিন্তু বললে? কিংবা ধর্ম সংঘ? নাঃ এটি লিখতেও ইচ্ছে করছে না। কে কোথায় খঃ হঃ হয়ে বসে আছে কে জানে? সংক্ষেপ করা ব্যাপারটি আমাদের সময়ের অভাব যত হবে ততই জনপ্রিয় হবে। এখনও আমাদের কাছে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের গালভরা নামই ভাল লাগে, কিন্তু দেশ একটু এগুলেই এই সব নাম ছোট হয়ে যাবে!

সংক্ষেপ করার ব্যাপার নিয়ে অনেক লেখা হল। এই কথাগুলোও হয়ত এর অর্ধেক কাগজে লেখা যেত চেষ্টা করলে, কিন্তু চেষ্টা করতে যে আরও কষ্ট! আঃ চঃ (এটার অর্থ পরিষ্কার না হলে বলতেই হয় এর অর্থ আজ চলি!)



কপোত-কপোতী কথা

কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
বাঁধে নীড়, থাকে সুখে·········

এটা আর বলে দিতে হবে না, এই বিখ্যাত উক্তিটি কার রচনা থেকে নেওয়া। আজ থেকে একশো বছর আগে এটি লেখা হয়েছিল, ঠিক বছরটির খোঁজ করিনি। কয়েক বছর এদিক-ওদিক হয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমার বক্তব্যের তাতে বিশেষ বাধা সৃষ্টি হবে না। লেখকের নাম তবু বলা ভাল, ইনি আমাদের বাংলা ভাষার অসাধারণ এক কবি এবং নাট্যকার মধুসূদন দত্ত। এঁর জীবন-কাহিনী যাকে বলে ঝটিকা সমৃদ্ধ। এ রকম বেপরোয়া বোহেমিয়ান শিক্ষিত প্রতিভা বাঙলা সাহিত্যেই দুর্লভ। যাই হোক, বাঙলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করা আমার আওতার বাইরে, এ নিয়ে মত প্রকাশ করা আমার দ্বারা সম্ভব হলেও তা গ্রাহ্য হবে না। তবে কেন উপরোক্ত লাইন দুটি আমি উদ্ধার করেছি,—ভয়ের কারণ নেই, আমি সাহিত্য নিয়ে উচ্চবাচ্য করব না, নিম্ন-বাচ্যও করব না। আমি পায়রা, কবুতর, পারাবত ইত্যাদির কথা ভাবছিলাম। এই যে যাদের নাম করলাম, যথা পায়রা, কবুতর, পারাবত এবং কপোত-কপোতী এরা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে নীড় বেঁধে সুখে থাকে, এইটে জানতে পারলাম মধুসূদনের কথায়। বেশ কথা—কপোত-কপোতীরা সুখে থাক।

কিন্তু এখানেই আমার গুরুতর একটি প্রশ্ন মনে জাগছে। পাঠকগণ লক্ষ্য করে থাকবেন প্রশ্নগুলো ঘুমিয়েই থাকে অধিকাংশ সময়ে, মাঝে মাঝে দু-একটা জেগে ওঠে। কেন জেগে ওঠে, কখন জেগে ওঠে, জেগে উঠে ঐ সব প্রশ্নের কি লাভ হয়, আমার জানা নেই। তবে প্রশ্নটা যে জাগে সে বিষয়ে দ্বিমত না থাকারই কথা। যাই হোক, গুরুতর প্রশ্ন যেটি জেগেছে, সেটি হল কপোত-

কপোতীরা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে যে বাসা করে সে সব কপোত-কপোতী কোন প্রজাতির ? আমরা ছোট বেলায় যে সব কপোত-কপোতীকে দেখেছি তাদের একটিকেও গাছের একেবারে ডগায় বাসা বাঁধতে দেখেনি। যখন পূর্ববঙ্গের গ্রামে থাকতাম তখন বহু গাছ আমাদের নজরে এসেছে, গাছের মাথাও আমরা দেখেছি, কিন্তু কপোত-কপোতীদের দেখতে পাই নি বাসা করে বসবাস করতে। বেশির ভাগ সময়ে তাদের দেখেছি টিনের ছাদে কিংবা ধান বা অন্য ক্ষেত্রে। তার অর্থ এই নয় যে, কপোত-কপোতীরা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে বাসা বাঁধে না, আমার বক্তব্য হল বাসা বাঁধতে পারে, কিন্তু আমি দেখিনি।

কপোত-কপোতীদের আমি দেখেছি বরং মানুষের বাড়ির কাছাকাছি ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে বাসা বাঁধতে। গত পঁচিশ বছর বহুবার মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে ঘুরেছি, সেখানেও বড় বড় বৃক্ষ চূড়ায় কোনও পায়রার বাসা দেখিনি। এর কারণ বোধ হয় এই যে, বাসা করার পক্ষে বৃক্ষ চূড়া খুব নিরাপদ স্থান নয়। ঝড় এলে বৃক্ষ চূড়াই সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত হয়, এবং কপোতকপোতীদের কিংবা অন্য পাখিদের তাতে দারুণ অসুবিধে হওয়ারই কথা, বিশেষ করে তাদের বাসা থেকে ডিম মাটিতে পড়ে গিয়ে ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। সে ক্ষেত্রে পাখিদের সহজাত বুদ্ধি অনুযায়ী তারা গাছের এমন জায়গায় বাসা বানাবে যে, জায়গাটা ঝড়ে কম আন্দোলিত হয়। আরও কথা আছে। গাছের মাথায় বাসা করলে সেটি থেকে পাখির ছানাদের ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাওয়া চিল, বাজ বা ঐ জাতীয় শিকারী পাখির পক্ষে অনেক সহজ। এবার দেখা যাক কপোত-কপোতীদের বাসা সম্পর্কে জ্ঞানী সাহেবরা কি বলেন। আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে প্রকাশিত একটি বিলাতি বিশ্বকোষে পাচ্ছি, স্টক ডাভ (Stock dove) এক ধরনের পায়রা, এরা সাধারণত ফাঁপা গাছের মধ্যে বাসা করে। এদের আবার খরগোশের গর্তের মধ্যেও বাসা করতে দেখা গেছে। কোনও কোনও সময় এরা অত্যন্ত ঘন ফার্জ ঝোপের মধ্যেও বাসা করে থাকে। অভিধানে দেখলাম লেখা আছে ফার্জ হল মটরশুঁটি জাতীয় এক রকম গাছ। তা মটরশুঁটিকে উচ্চ বৃক্ষ কিছুতেই বলা যাবে না।

অতঃপর আর এক ধরনের পায়রা রক-ডাভ-এর বিবরণ পড়লাম। এর নামেই এর পরিচয়। তবু বলি, বিশ্ব-কোষে লেখা আছে, ইউরোপীয় সমুদ্র উপকূলের পাহাড়ের যেখানেই গুহা আছে, ফাটল বা ফোকর আছে, সেখানেই ওরা বাসা করে। এদেরও উচ্চ বৃক্ষ চূড়ার প্রতি কোনও লোভ নেই। এর পর দেখি টার্টল-ডাভ-এর বিবরণ। আমাদের দেশের পায়রা, মধুসূদন যাঁদের বলছেন কপোত-কপোতী, মনে হয় এরই আত্মীয়। এ সম্পর্কে সাহেবের লেখা বিবরণই দেওয়া যাক ঃ

The turtle-dove, the emblem of tender love, is found in many parts of England. It frequents Woods, specially those in which the trees grow close. It...builds...nests a framework of little twigs often placed quite low down in a bush or

small tree......

বাঙলায় বলা যাচ্ছে, সূক্ষ্মপ্রেমের প্রতীক এই পাখিকে দেখা যায় ইংল্যান্ডের বহু স্থানেই। জঙ্গলে, বিশেষ করে যে জঙ্গল ঘন সেখানে তাদের দেখা যায় বেশি। এরা বাসা বাঁধে নিচের দিকে, ঝোপে কিংবা ছোট গাছে ··।

না উচ্চ-বৃক্ষচূড়ে নয়। এবার দেখা যাক গ্রীন-পিজিয়ন-দের ব্যাপার স্যাপার। সাহেবী বইতে দেখতে পাচ্ছি, ওদের দেখা যায় বর্মার গভীর জঙ্গলে। এরা বাসা বাঁধে গাছের বাইবের দিকে বিস্তৃত ডালে। মালয়ের এক জাতের পায়রার কথা জানা গেল, এরাও গভীর জঙ্গলে থাকতে ভালবাসে, বাসা বাঁধে খড়কুটো দিয়ে সাধারণত মাটি থেকে দশ ফুট উপরে। আরও একটু উঁচুতে বাসা বাঁধে নিকোবর নাট-মেগ পিজিয়ন, নারকেল গাছের মাথায়—তবে খুব উচ্চ-বৃক্ষে নয়। মাত্র ২০ ফুট উঁচু নারকেল গাছে। আমেরিকার উড-পিজিয়নরা গাছে মোটেই বাসা বাঁধে না। ওরা বাসা বাঁধে সোজাসুজি মাটিতে। নেপালের পায়রা-কুকু-পিজিয়ন বাসা বাঁধে গাছের নিচের দিকেই। সায়েব বলছেন, at no great height from the ground. এককালে প্যাসেঞ্জার পিজিয়ন খুব বিখ্যাত ছিল, আমেরিকায় এক সাহেব মিশিগানে দেখেছিলেন এরা বিরাট দল বেঁধে থাকে এবং আজ থেকে একশো বছর আগে এক সঙ্গে শয়ে শয়ে পায়বাকে দেখা যেত দল বেঁধে থাকতে। কিন্তু এদের আর কেউ বেঁচে নেই, এরা সকলে মানুষের শিকার হয়ে নির্বংশ হয়েছে। ১৯২০ সালে তাদের শেষ দেখা গিয়েছিল।

মোর্নিং-ডাভস্ জাতের পায়রাদের বাসা বাঁধার জায়গা নান রকম। তবে প্রধানত ওরা বাসা করে মাটিতে। ওরা আবার অন্যের বাসায় গিয়েও নাকি ডিম পেড়ে আসত। সিনামন-ডাভ-এর কথাতেও দেখছি ওরা মাটির উপরই বাসা করত। অতঃপর আসা যাক কেপ-ডাভ-এর কথায়। কেপ-পায়রারাও মাটির কাছাকাছি থাকত, হয়তো কখনও-সখনও ছোটখাট গাছেও তাদের দেখা যেত, "But rarely in larger trees". অর্থাৎ বড় গাছে প্রায় দেখাই যেত না। হার্লেকুইন-ডাভ, এরা বাসা করত any low bush-এ। অর্থাৎ যে কোনও ছোট ঝোপ ঝাড়ে। টুথ বিল্ড (tooth billed) পায়রাদেব বাসা। খুঁজেই প্রায় পাওয়া যেত না, তবে মনে করা হয় বড় গাছের দুটি ডাল যেখান থেকে বেবিয়েছে সেই কোণায় তারা বাসা করত। ক্রাউন্ড-পিজিয়ন, বা ঝুঁটিওলা পায়রারা অধিকাংশ সময় মাটিতেই থাকে—উদ্দেশ্য খাদ্যের সন্ধান।

আমি দুটি বিশ্বকোষ এবং একটা পুরনো জীব-জন্তু সংক্রান্ত বই থেকে এমন কোনও তথ্য পাইনি যাতে মনে করা যেতে পারে যে পায়রারা উচ্চ-বৃক্ষ চূড়ে বাসা বাঁধে। এটি মনে হয় পায়রাদের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। তাহলে ধরে নিতে হচ্ছে মধুসূদনের কবিতা তাঁর মনের খেয়ালে রচিত, তাঁর ধারণা পায়রারা উঁচু গাছের মগডালে বাসা বাঁধে। এটা ঠিক নয়।

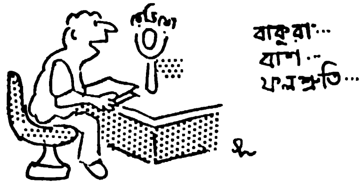
কিন্তু তাতে এসে গেল কি ? ঐ কবিতাকে কি তাহলে বানের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে ? না, দরকার নেই। একবার যখন ছাত্ররা এবং অন্যান্যরা মুখস্ত

করে ফেলেছেন এখন বানের জলে ভাসিয়ে দিতে বললেও শুনবেন না কেউ। কেউ প্রশ্ন করবেন, এ-রকম খুঁত ধরার মানেটা কি? এত বড় একজন কবির তাতে কচু হবে।

ঠিক তাই। আমার এই লেখায় মধুসূদনের কিছুই হবে না। তাঁর আমলে তিনি যে-রকম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাতেও যখন তিনি দমেননি, তখন আমি আর কিই বা করতে পারব। আমার ইচ্ছেও নেই।

আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে যোগ করা দরকার। কপোত-কপোতীরা ধরা যাক উচ্চ বৃক্ষ চূড়াতেই বাসা বেঁধেছিল—ধরে নেওয়াই না হয়ে গেল অমন একটি জোড়াকে মধুসূদন দত্ত বাসা বাঁধতে দেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিতা থেকে তা তো মনে হয় না। মনে হয় যেন সব কপোত-কপোতীই উঁচু ডালে বাসা বেঁধে থাকে। সেটা যে ঠিক নয়, সে প্রমাণ আশা করি আমি সাহেবদের বক্তব্যের মাধ্যমে দিতে পেরেছি। এবার আসি আমার দ্বিতীয় বিষয়ে। এটি এতক্ষণ বলিনি। সেটি হল এই কথা·· বাঁধি নীড় থাকে সুখে।

থাকে সুখে? কোথায় সুখ? পায়রার ইতিহাসে নিষ্ঠুর খুন জখমের কথাই যে শতকরা নিরেনব্বই ভাগ। এর আগে বলেছি, প্যাসেঞ্জার পিজিয়নরা তো ১৯২০ সালেই নির্বংশ হয়ে গেছে। পায়রার বহু প্রজাতি বিলুপ্ত। এখন বলা হয় ২৯০ রকম প্রজাতির পায়রা রয়েছে, অথচ প্রায় একশো বছর আগে প্রকাশিত একটি প্রামাণ্য বইতে দেখতে পাচ্ছি, পাঁচশোরও বেশি প্রজাতির পায়রা তখন ছিল। একশো বছরে তাদের সংখ্যা ২৯০তে দাঁড়িয়েছে। বহু প্রাচীনকাল থেকেই পায়রা এক চমৎকার খাদ্য বলে পরিগণিত। পুরনো গ্রন্থে এই পাখিকে ধর্মস্থানে জবাই করার বিবরণও আছে। নানা কারণে বর্তমানে তাদের মোট সংখ্যা যে হাজার ভাগের এক ভাগও এখন নয় তাও তো সত্যি। তাহলে তারা সুখে আর নেই। এমন কি মধুসূদনের সময়েও তারা খুব সুখে ছিল না, সে প্রমাণও আছে বইয়েব পাতায়। তবে তাদের একটি সান্ত্বনা আছে, আজকালকার এই মার মার কাট কাট যুগেও পায়রাদের ধরে উড়িয়ে দেওয়া হয়, তাদের নাম দেওয়া হয়, শান্তির পারাবত!



আমাদেরই বাংলা রে !

রেডিওতে আজকাল চমৎকার একটা অনুষ্ঠান হয়, সেটা হলো লেট্স্ স্পিক ইংলিশ। অর্থাৎ আসুন আমরা ইংরেজিতে কথা বলি। ভাল কথা, এ-রকম একটি অনুষ্ঠান শুনতে ভাল লাগে, ইংরেজি উচ্চারণে কায়দা, বাক্য গঠন রীতি এসব বেশ সুন্দর বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানটি তৈরি করেছেন বি বি সি। অবশ্য যে সব ব্যক্তি অফিসে থাকেন কিংবা স্কুলের ছেলেমেয়েদের পক্ষে এ অনুষ্ঠান শোনা সহজ নয়, কেন না একটি হয় বেলা এগারোটায়। বাড়ির গৃহিণীরা এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এই অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। এছাড়া হিন্দি শেখানোও চলছে আমাদের এই কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে—স্বাধীনতার পর থেকেই। আর টিভি অনুষ্ঠানের প্রায় সবটাই হিন্দিতেই প্রচারিত। এখনও টিভিতে হিন্দি শেখানোর বন্দোবস্ত করা হয়নি ঠিকই, তবে বোধহয় সেটাও হয়ে যাবে। সবচেয়ে করুণ অবস্থা বাংলার। যে বাংলার রাজধানীতে আমরা থাকি সেই বাংলার বেতার কেন্দ্রে এ পর্যন্ত বাংলা শেখানর তো ব্যবস্থা করা হয়ইনি, বরং ভুল বাংলা প্রচার করে করে যাঁরা বাংলা কিছু জানতেন তাঁদেরও বিভ্রান্তি এসে যাচ্ছে। আর শিশুরা সেই ভুল বাংলা শুনে শুনে মনে করছে ওটাই ঠিক বাংলা। ফলে অসুবিধে আরও বাড়ছে। বেতারে এক বাংলা ঘোষক আছেন, যিনি বোধহয় ছোটবেলা থেকেই চন্দ্রবিন্দু ব্যাপারটা জানেন না। এটা কার দোষে হয়েছে সেটা জানা যায় না, হয় তো তিনি যে 'পাঠ্যপুস্তক' পড়েছিলেন তাতে চন্দ্রবিন্দুর উল্লেখ ছিল না, কিংবা তাঁর শিক্ষক এটা তাঁকে শেখাননি। এটা অবশ্যই তাঁর দোষ নয়। তিনি বাঁকুড়াকে বলবেন বাকুড়া, বাঁশকে বলবেন বাশ। এই রকম উচ্চারণ করায় তাঁর হয়ত কিছু করার নেই, কিন্তু বেতার কর্তৃপক্ষ এঁর উচ্চারণ ঠিক করে দেন না কেন—কিংবা তাঁকে ঘোষণা করা থেকে অব্যাহতি দেন না কেন? বাংলায় অবশ্য অঞ্চলভেদে নানা রকম উচ্চারণ হয়েই থাকে, সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যে শিক্ষিত উচ্চারণ গ্রহণীয়, যে উচ্চারণ করা উচিত সেটা শেখানরও একটা কর্তব্য আছে এই বেতার কর্তৃপক্ষেরই। এই জন্য সপ্তাহে প্রতিদিন না বলেও প্রতি সপ্তাহে তিনদিন নানাপর্যায়ে বাংলা শেখানো চলতে পারে। কিভাবে বাংলা কথা বলতে হয়, কোন কথা ভুল, বা অপপ্রয়োগ, কোন উচ্চারণ সঠিক এবং কিভাবে বলতে হয় এগুলো শেখানোর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি কলকাতা শহরে নিশ্চয় কয়েকশো পাওয়া যাবে, তাঁদের মধ্যে যাঁরা এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে

ইচ্ছুক তাঁদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করে বাংলা ভাষাকে প্রকাশ একটা স্ট্যান্ডার্ড-এ নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা খুবই জরুরি বলে আমাদের মনে হয়।

দু-একটা উদাহরণ দিই। প্রতি বছরে গরম পড়লেই খবরের কাগজ, রেডিও এবং টিভিতে একটি কথা শোনা যাবেই, তা হলো "গ্রীষ্মের দাবদাহ" হওয়ায় শহরের লোক খুব কষ্ট পাচ্ছে। এখন মুসকিল হচ্ছে দাবদাহ হচ্ছে জঙ্গলের আগুন বা দাবানল। এ-রকম আগুন জ্বলতে পারে একমাত্র জঙ্গলেই, শহরে কদাপি নয়। কথাতেই তার অর্থের সীমানা টেনে দেওয়া হয়েছে। এর অন্য অর্থ হতে পারে না। তবু এই কথাটা বলাও হচ্ছে লেখাও হচ্ছে। এই ভুল কথাটি অবশ্য ক্রমশ বেতারের টিভির এবং সংবাদপত্রের অসতর্ক সাংবাদিকরা চালু করে দিচ্ছেন, এবং সাধারণ লোকেরা এই কথাগুলিই সঠিক মনে করে তাঁরাও চিন্তা না করেই বলতে থাকবেন, এই দাবদাহ আর সহ্য হচ্ছে না! তবে দাবদাহ কথাটা যদি ব্যবহার করতেই হয় তাহলে এভাবে বলা যায় প্রচণ্ড গরম হলে, "উঃ সহ্য হচ্ছে না এই গরম, মনে হচ্ছে দাবদাহ চলছে কাছাকাছি কোথাও!" অবশ্য দাবদাহ কথাটা ব্যবহার করতেই হবে এমন দিব্যি কেউ দেয়নি। ভয়ঙ্কর গরম, অসহ্য গরম, প্রবল গরম এইসব কথাও অতি অনায়াসে বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ঐ যে গল্প আছে না "কতিপয় বাবা" ব্যবহার করেছিল এক ছাত্র বাবাকে লেখা চিঠির খামের উপর। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কতিপয় কথাটা ওখানে ঠিক হয়নি তো! তা সে ছেলেটি জবাব দিয়েছিল, "ঠিক হক না হক শুনতে চমৎকার।"

খবরের কাগজে কাজ করার সময় আমার এক সিনিয়র সহকর্মী-লিখলেন, "বিমান আক্রমণের ফলশ্রুতিতে সাত ব্যক্তির মৃত্যু"। আমি তাঁকে বোঝালাম যে ফলশ্রুতি কথাটা এখানে আদপেই খাটে না। ফলশ্রুতির অন্য অর্থ আছে, আর সে অর্থ হল তীর্থক্ষেত্র থেকে ফিরে সেই তীর্থের বর্ণনা শুনে যে পুণ্য হয় তাহ হলো ফলশ্রুতি। সহকমী কিন্তু আমার কথায় ঘাবড়ালেন না। তিনি ফলশ্রুতি কথাটা বদলালেন না। বললেন, "আপনি যা বললেন সেটা ঠিক, কিন্তু ফলশ্রুতি কথাটা শুনতে ভাল যে।"

চমৎকার সওয়াল। "কতিপয় বাবা"র মতোই! জেনে শুনে অনেকে ভুল লেখেন। একটি কথা আজকাল প্রায়ই ব্যবহার করা হয় সেটা হলো রুশী! কেন রুশী তা কিন্তু স্পষ্ট নয়। রাশিয়া থেকে রুশ কথাটা এসেছে তারপরও একটি অতিরিক্ত দীর্ঘই-কার দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কে কার কথা শোনে? যে মনোভাবে মার্কিন মার্কিনী হয় এটাও সেই মনোভাবেরই পরিচয়! যে কারণে মার্কিনী কথাটা ভুল ঠিক সেই কারণে রুশী কথাটাও ভুল। পোর্তুগীজকে আমরা কি পোর্তুগীজী বলি?

দু-একজন পণ্ডিত পই পই করে বাংলায় এইসব ভুল প্রয়োগের কথা বলছেন কয়েক যুগ ধরে, কিন্তু এই ভুল প্রয়োগ চলছে তো চলছেই, এর আর বিরাম নেই। বিরাম নেই, কেন না এ নিয়ে কারুর কোনও উদ্বেগ নেই। উদ্বেগ থাকলে বেতারে টিভিতে সংবাদপত্রে এই রকম ভুল বারবার হতো না। এ

আমাদের চরিত্রের একটা দিক। আমরা কোনও ব্যাপারেই আগ্রহ প্রকাশ করি না। তবু মনে হয় টিভি এবং বেতার পরিচালকরা যদি একটু চেষ্টা করেন তাহলে এই জাতীয় ভুল প্রচার বন্ধ হতে পারত।

আমি এককালে খুব নিয়মিতভাবে টিভি দেখতাম। টিভি দেখে সে সম্পর্কে একটি পাক্ষিক পত্রিকায় লিখতাম। সেই সময় (প্রায় এক বছরের উপর) কত রকম ভুল যে চোখে পড়ত তার ঠিক ঠিকানা নেই। অনেক দর্শকও দর্শকের দরবার-এ ভুল নিয়ে চিঠি লিখে থাকেন, কিন্তু যিনি উত্তর দেন তিনি তা নিয়ে একটু মুচকি হেসে রসিকতা করেন। যেন ব্যাপারটা এতই তুচ্ছ যে ও নিয়ে আর মন্তব্যের প্রয়োজন নেই। ঐ সময় দেখেছিলাম বাংলা কথা বলার সময় আলোচনা যাঁরা করেন তাঁদের বেশিরভাগই কথার মধ্যে প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করেন, যার প্রায় সবগুলোই বাংলাতে বললেও চলত। অবশ্য এই ঝোঁক কেবল বাংলায় নয়, হিন্দিতেও বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যাই হোক, বহুবার এ নিয়ে লিখলেও টিভি কর্তৃপক্ষ ছিলেন নির্বিকার। এমন কি যে-সব কথা বাংলায় লেখা থাকে তাতেও থাকত ভুল, যা এখনও থাকে। একটু সতর্ক হলেই এইসব ভুল সংশোধন করা যায় অথচ তা করা হয় না, অর্থাৎ, সংশোধন না করলেও কারুরই কিছু এসে যায় না। অবশ্য সতর্ক হতে হলে একটু চিন্তার দরকার হয়, একটা অভিধানেরও দরকার হয়। দুর্গা বানানও টিভি-তে ভুল লেখা হয় দেখেছি। এই রকম দুর্গতি বোধহয় আর কোনও ভাষায় হয় না। অবশ্য ভারতবর্ষে সবই হতে পারে, কেন না এমন আজব দেশ পৃথিবীতেই হয় না যে!

আমি পণ্ডিত নই, এ-সব কথা লেখার অধিকারও নেই সেটা জানি, এবং আমার এই লেখা পড়ে সকলে মেনে নেবেন তাও নয়। কিন্তু আমার একটিই সান্ত্বনা, সেটি এই যে পণ্ডিতদের কথাও কেউ শোনে না! যাই হোক, তবু আমি বলে যাব, আমার বাক্যাবলী বন্ধ করব না।

আসলে আমরা বাংলাকে ভালবাসি না। আমরা বলি আ-মরি বাংলা ভাষা, কিন্তু বাংলা আমরা শিখি না, শেখানর ব্যবস্থাও করি না। আমাদের এবং ওপার বাংলা মিলে লোকসংখ্যা এখন ষোল কোটির উপর। এতগুলি লোক হওয়া সত্ত্বেও একটি প্রবন্ধের বই হাজার কপি বিক্রি হতে কয়েক বছর লেগে যায়! তাও এই সৌভাগ্য (!) সব বইয়ের বেলায় হয় না। অনেক বইই গুদামে নষ্ট হয়ে যায়। তবে বাংলা বইয়ের বিক্রি অন্য ক্ষেত্রে বেড়েছে। যেমন কবিতার বই। এককালে কবিতার বইয়ের ক্রেতা ছিল কম। এছাড়া উপন্যাসও এখন ভাল বিক্রি হয় বলে শুনেছি। কিন্তু সব সমেত বাংলা বই (পাঠ্যপুস্তক ছাড়া) এই বাংলায় বিক্রি হয় বছরে মাত্র কুড়ি কোটি টাকার মতো। মনে হয় ইংরেজি বইয়ের বিক্রি এর চাইতে অনেক বেশি! এ বাংলার লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি ধরলে মাথাপিছু চার টাকা! বইয়ের গড় দাম পনের টাকা হলে বই বিক্রি হয় এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ। এই বাংলার এই অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায় হিন্দির। হিন্দি প্রচার করার জন্য কেন্দ্র সরকার কয়েকশো কোটি টাকা

খরচ করেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা প্রচার করার জন্য ঠিক কত খরচ করেন জানি না। আমি জানি অনেক বিদেশি বাংলা শেখার জন্য আগ্রহী। ভারতেরও বহু জায়গায় মানুষ বাংলা শিখতে চান কিন্তু তাঁদের সুযোগ নেই শেখার। অনেক বাঙালি মাদ্রাজ বোম্বাই দিল্লি লন্ডন বন বা ওয়াশিংটনে সপরিবারে থাকেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা বাংলা শিখবার সুযোগ পায় না। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা শেখানোর জন্য কিছু ভিডিও ক্যাসেট তৈরি করতে পারেন নিশ্চয়ই। এক একটি সেটের সঙ্গে সহায়ক পাঠ্য-পুস্তক থাকলে ইংরেজির (বা অন্য অনেক ভাষার) মাধ্যমে অনেকেই বাংলা শিখতে পারেন। এমনকি এই ভিডিওর সাহায্যে গ্রামে গ্রামেও বাংলা শেখানর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এটি এমন খরচ যা করলে দেশে শিক্ষার বিস্তারও হবে এবং বই বিক্রিও বাড়বে।

তবে ব্যাপারটি করাতে হবে সতিকারের গুণী ব্যক্তিদের দিয়ে। তা নইলে উলটো ফল হয়ে যাবে। কলকাতায় বা অন্য কোনও জায়গায় একটি বাংলা ভবন করা যেতে পারে যেখানে বিদেশিরা এসে বাংলা শিখবেন। দু বছরের এমন একটা কোর্স ভাবা যেতে পারে। সঙ্গে হস্টেল থাকলে আরও ভাল। বিদেশিরা বাংলা শেখার জন্য টাকাও দেবেন। রোমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টের বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর হলো বাংলা শেখানো হচ্ছে। জনা দশেক ছাত্র প্রতি বছর বাংলা শিখছেন। আমাদের এই কলকাতার অমিতা বসু সেখানে পড়ান। ছাত্রদের সুবিধের জন্য তিনি একটি অভিধানও তৈরি করেছেন। আর তৈরি করেছেন বাংলা শেখার প্রাথমিক বই। চমৎকার কাজ। একক প্রচেষ্টায় তিনি যদি এতটা করতে পারেন তাহলে সরকারি প্রচেষ্টায় এর চেয়ে অনেক বেশি করা যায় বলাই বাহুল্য। কয়েক বছর আগে রাশিয়ার একটি মহিলার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তিনি রাশিয়ান দাবা খেলোয়াড়দের বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করছিলেন। উচ্চারণ বিদেশি, কিন্তু বাংলা ঠিকই বলছিলেন। জাপানেও শুনেছি অনেকে বাংলা জানেন এবং চর্চা করেন। আমার মনে হয় ঠিকমতো কাজ করতে পারলে সমস্ত পৃথিবীতেই বাংলা শেখায় আগ্রহী কয়েক লক্ষ লোক পাওয়া যেতে পারে (এর মধ্যে প্রবাসী বাঙালির ছেলেমেয়েরাও থাকবে)। বাংলা বইয়ের বাজার এভাবে বাড়ানো যেতে পারে।

মনে হয় না সরকার এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবেন। এই সরকার ইচ্ছে করলেই কিন্তু করতে পারেন কিন্তু করবেন না। এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে অনেক রকম সরকারই হয়েছে কিন্তু বাংলার জন্য কেউই এই রকম চেষ্টা করেননি। অথচ বাংলা আমাদের গৌরবের ভাষা! তাছাড়া আরও একটা ব্যাপারও আছে। কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট কেউই হিন্দির দাপটের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবেন না। বাংলা প্রচার করতে শুরু করলে হিন্দি রাজ্যগুলির যদি মন খারাপ হয় তাহলেই তো মুসকিল। রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে হলে বাংলা চালান তো চলবেই না, এমন কি এই রাজ্যকে হিন্দি রাজ্য করতেও বোধহয় এঁদের আপত্তি নেই।



সংসদীয় ভাষা কাকে বলে

সম্প্রতি এক রাজনৈতিক নেতা পরামর্শ দিয়েছেন যদি কেউ শালা বলে গালাগাল দেয় তাহলে সেই ব্যক্তিকে শুয়োরের বাচ্চা বলে পাল্টা গালাগাল করতে হবে। কথাটি পড়ে ভেবেছিলাম উক্ত নেতা সম্ভবত প্রতিবাদ জানাবেন। বলবেন, খবরের কাগজের রিপোর্টাররা মিথ্যে কথা লেখে, আমি কখনই অমন কথা বলিনি, কেন না আমার শিক্ষা তেমন নয়, ইত্যাদি। প্রতিবাদ না বেরোনয় মনে হচ্ছে রিপোর্টার মহাশয় মিথ্যে কথা লেখেননি। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। তবে এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটার মধ্যে নানা সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। তার আগে অবশ্যই শালা এবং শুয়োরের বাচ্চা নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার। আগেই লিখেছি এই দুটি বাক্যই গালাগাল। তবে এ সম্পর্কে কিছু মতভেদ থাকতে পারে। পণ্ডিতদের কথা ছেড়ে দিলাম, কেন না তাঁদের মধ্যে মতভেদ থাকবেই, অনেক সময়ে এই কারণেই তাঁদের পণ্ডিত বলা হয়। আমি বলছি সাধারণ মানুষের কথা। সাধারণ মানুষদের মধ্যেও এই দুটি বাক্য নিয়ে সন্দেহ, দ্বিধা এবং ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। শালা কথাটি গালাগাল কেন হবে এ নিয়েও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, শালার অর্থ গৃহিণীর ভ্রাতা। সম্পর্কটা খুবই স্বাভাবিক। এর মধ্যে গালাগাল ব্যাপারটি ঠিক বোঝা যায় না কোথায়। বিবাহিত অনেক ব্যক্তিকে আমি জানি যাঁরা তাঁদের শালাদের কেবল শালা বলেন না, এর সঙ্গে বাবু কথাটিও যোগ করেন। আর সকলেই জানেন বাবু কথাটি ব্যবহার করা হয় সম্মানীয় ব্যক্তিদেরই। শালা যদি সম্মানীয় ব্যক্তি হন তাহলে কথাটি গালাগাল হতে পারে না, অথচ লোকেরা মনে করেন এটি গালাগাল। ভাষার এই রকম দু'মুখো, তিন মুখো এমনকি বহু মুখো মূর্তি অন্যত্রও চোখে পড়ে। ফলে আমরা, সাধারণ মানুষরা একটু বিপদেই পড়ে যাই। এই কারণে নতুন একটা অভিধান চাই, যে অভিধানে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া থাকবে শালা গালাগাল, কি গালাগাল নয়। আমাদের অভিধানে

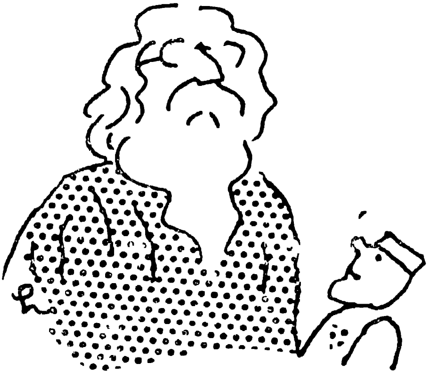
লেখা আছে শালা হচ্ছেন পত্নীর ভ্রাতা এবং তারপরই লেখা আছে স্ত্রীর ভাই বলিয়া গালি। কিন্তু কেন এটা গালি তা অভিধানকারক ব্যাখ্যা করেননি। গোলমালটা সেখানেই। শালা-র আরও একটি অর্থ আছে সেটি হলো গৃহ, আলয়, ইত্যাদি। এটিও গালাগাল হতে পারে না। শালা যোগ করে আমাদের এই বাংলা ভাষায় অনেক কথা হয়েছে, সেগুলি ভদ্র কথা, যেমন হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, অতিথিশালা, কামারশালা, গোশালা—প্রায় অফুরন্ত!

শুয়োরের বাচ্চা কথাটা গালাগাল হিসেবে ব্যবহার করার মধ্যেও একটা গোলমাল আছে। শুয়োর ভগবানের সৃষ্টি, নাস্তিকেরা বলবেন প্রকৃতির সৃষ্টি। শুয়োর জন্তুটি বেশ শক্তিশালী। অনেক সময় এরা বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ীও হয়েছে। প্রচুর শক্তি প্রচুর সাহস, একটু একগুঁয়ে প্রকৃতির। এই হচ্ছে শুয়োর—বয়স্ক শুয়োরের দারুণ দাঁত থাকে। টুথ পেস্টের বিজ্ঞাপনেও ব্যবহার করা যায় এমন শক্ত দাঁত। কোনও মানুষকে শুয়োর বলা ঠিক যায় না, কেন না মানুষে শুয়োরে অনেক তফাত! যাই হোক চেষ্টা চরিত্তির করে তাও না হয় করা হলো—কোনও ব্যক্তিকে তেজি, সাহসী, একগুঁয়ে ইত্যাদি বলে শুয়োরের সঙ্গে তুলনা করায় বাধা নেই বোধহয়। কিন্তু লোকেরাও এমন যে শুয়োর বললে এমন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে থাকে যে কথাটা প্রশংসা করার জন্য কেউ ব্যবহার করতেও ভয় পান। ফলে ওটা বিনা কারণেই গালাগাল হয়ে গেছে। এর জন্য দায়ী মানুষ, শুয়োর কদাপি নয়। যাই হোক না হয় মেনেই নেওয়া গেল শুয়োর কথাটা মানুষের পক্ষে কিছুটা মানহানিকর। শুয়োর বললে অনেকেরই মনে পড়ে যায় তার বিশ্রী দাঁত (আমাদের কাছে বিশ্রী, শুয়োরের কাছে কিন্তু চমৎকার!), এক রোখা (অর্থাৎ বিবেচনার অভাব), হয়ত কথাটা আমাদের উদ্দেশে কেউ বললে মনটা সাময়িকভাবে উদাস হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু শুয়োরের বাচ্চার অমন দাঁতও নেই অমন এক গুঁয়েমিও নেই, দিব্যি ছোটখাটো জন্তুটি, তাই শুয়োরের বাচ্চা বলায় গালাগাল হওয়ার কথাই নয়। তবু মানুষ যখন ভেবে নেয়, (যুক্তিহীনভাবেই) যে শুয়োরের বাচ্চা গালাগাল তখন তো আর রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীকে ডাকা যাবে না। ও নিজেদের মধ্যেই ফয়সালা করে নিতে হবে, নইলে কেলেঙ্কারির ব্যাপার হবে।

এবারে আসি প্রথম কথায়। রাজনৈতিক নেতা সুপারিশ করেছেন শালা বললে শুয়োরের বাচ্চা বলে জবাব দিতে হবে। চমৎকার—এই যে এটিকেট বা সহবত শিক্ষা এটি এতদিন আমরা কোনও সুশিক্ষকের কাছ থেকে পাইনি। রাজনৈতিক নেতারা যদি জনকল্যাণের জন্য কী কথায় কী বলতে হবে শেখাতে পারেন তাহলে অনেক সুবিধে হয়। তাহলে আর বিনা কারণে ওয়াক-আউট করতে হয় না। সেদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসিদের জোচ্চোর বলায় ওয়াক-আউট করে রাগ দেখালেন তাঁরা। যদি জোচ্চোরের বদলে কী বললে চমৎকার হয় তা যদি পূর্ব উল্লেখিত নেতা বলে দিতে পারতেন তাহলেই অনেকটা কাজ হতো। মিছিমিছি কয়েক ঘণ্টা মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে গেল

বিধানসভায়। আর এই যে সময় নষ্ট হলো এর জন্য মূল্য তো দিতে হলো আপনার, আমারই। এই কারণেই আমার এই প্রস্তাব।

সমস্যাটা হচ্ছে সবাই তো সব সময়ে শালা বলে গালাগাল দেন না। যেমন মুখ্যমন্ত্রী দেননি। এর উপযুক্ত জবাবের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি থাকার দরকার ছিল। কেউ যদি প্রথমেই বলেন শুয়োরের বাচ্চা, তাহলে কি পাল্টা শালা বললে কাজ হবে? মনে হয় না। অন্য একটা কিছু ভেবে বার করতে হবে (সংসদে যে কথা ব্যবহার করা যাবে, অবশ্যই)। যেমন কুকুর বলে কেউ কাউকে অভিহিত করলে জবাব দিতে হবে লোচ্চা। এটি অবশ্য আমার সুপারিশ, তবে এ ব্যাপারে বিধায়কদের সুপারিশ অনেক বেশি গ্রাহ্য হবে। তাঁরা পরস্পরকে বাক্যবিদ্ধ করে থাকেন প্রায়ই কাগজে পড়ে থাকি। কখনও কখনও দেখি কোনও কোনও কথা রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়াও হয়। এটা আমার কাছে ঘোরতর অন্যায় বলে মনে হয়। আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যা বলেন, তা আমাদের শিক্ষার জন্যই কিংবা মঙ্গলের জন্যই বলেন, এখন তা যদি আমাদের গোচরে না আনা হয় তাহলে আমাদের ঠকানো হয়। মনে হয় আমাদের সংবিধান এই ব্যাপারে আরও এক দফা সংশোধন করা যেতে পারে। ৬৪টি সংশোধন হয়ে গেছে, আরও একটি যোগ করে দিলে কারও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে বলে মনে হয় না। এক কালে শুনতাম একটি কথা, যাহা বাহান্ন তাহা তেপ্পান্ন—না হয় সেটিকে একটু বদলে করা যাক যাহা চৌষট্টি তাহা পঁয়ষট্টি! তবে সংবিধান সংশোধনের কাজটি সহজে বলে মনে হয় না, কেন না নানা ভাষার এটি দেশ, নানা সংস্কৃতিরও। নানা তর্কবিতর্ক উঠতেই পারে, আর সংসদে যখন তখন দরকার না হলেও তর্ক উঠবে। কোন কথাটি সংসদীয় কোনটা নয় তা নিয়ে তর্ক কয়েক বছরও চলতে পারে। মনে হয় কোনও সংসদীয় সাব-কমিটিকে এই গুরুভার অর্পণ কবলে ভাল হয়। তখন ফিচলেমি, বেশ্যা, ছুঁচো, শুয়োরের বাচ্চা ইত্যাদি হাজার হাজার কথা সংসদীয় কিনা তা বিচার করা একবার হয়ে গেলে বিধায়করা এবং সংসদ সদস্যরা মোটামুটি বুঝতে পারতেন কোন গালাগাল দেওয়া চলে, কোন্‌টা চলে না। খামোকা ওয়াক-আউট করে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। কিন্তু তাতেও বোধহয় সমস্যা মিটবে না, কেন না এই সেদিন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সংসদেই একজনকে বলেছেন মিথ্যেবাদী, কথাটা তিনি জেনেশুনেই ব্যবহার করেছেন বলে তিনি সগর্বে ঘোষণাও করেছেন। যাক্‌, মিথ্যেবাদী কথাটা অন্তত জাতে উঠল।



হায় বাঙালি রবীন্দ্রনাথ !

টলস্টয় মহাশয় শেক্সপীয়রকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন অমন খারাপ নাট্যকারকে নিয়ে গদগদ হওয়ার কিছু নেই। এই রকম আরও হয়ত কেউ কেউ ছিলেন কোনও সময়, কিংবা এখনও থাকতে পারেন। রুচির ব্যাপারে আমাদের বা কারুরই তেমন হাত নেই। আমাদের রবীন্দ্রনাথকেও অনেক বিরোধিতার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল তাঁর জীবিতকালেই। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর বেশ কিছু বামপন্থী তাঁর মুণ্ডুপাত করতেন দেখেছি। বলতেন বুর্জোয়া কবি, ভাব গদগদ কবি, ঈশ্বর প্রেমে অন্ধ কবি, এই রকম সব কথা বলা হতো। কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথকে কেউ হঠাতে পারেনি, বরং যাঁরা হঠাতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা নিজেদের দুর্বলতায় পরে অবসাদগ্রস্ত হয়ে নিজেদের হঠকারিতা বুঝতে পেরে মত এবং পথ বদলে ফেলেন। এখন দুই বঙ্গেই কবি রবীন্দ্রনাথ, চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ, ছান্দিক রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি নানা বিশেষণে ভূষিত হয়ে একচ্ছত্র হয়ে বিরাজ করছেন। রবীন্দ্রনাথকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার সাধ্য কারুর নেই।

তবে সাধ্য কারুর নেই, এই কথাটা যত সহজে বলা গেল আসলে তা কিন্তু নয়। বাংলার বাইরে রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশ কেটেকুটে ছোট করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করা হচ্ছে। দিল্লীর মহাপুরুষগণ যখন এই পাণ্ডববর্জিত রাজ্যে আসেন, বা আসতে বাধ্য হন "ভোটের লাগিয়া" তখন কথায় কথায় না হলেও দু-একবার রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে তাঁরা পেছপাও হন না। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যখন শান্তিনিকেতনে আসেন তখন তো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, আর আমরা রাজার এই প্রচণ্ড উদারতায় গদগদ হয়ে ভাবি, আহা, কি চমৎকারই না আমাদের এই প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক লোকেরা যা বলেন তার মধ্যে অন্য হিসেবও যে ঢুকে যায় সেটা আমরা ভুলে যাই। আসল মতলবটা বুঝলে মনই খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু ঠিক একই সময়ে অন্য জায়গায় কিন্তু অন্য চিত্র আমরা দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের (বাঙালি রবীন্দ্রনাথের) জনগণমন অধিনায়ক এখন নামকাওয়াস্তে জাতীয় সঙ্গীত। অধিকাংশ জায়গাতেই সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা। এমন কি আন্তর্জাতিক নানা অনুষ্ঠানে অন্তত একবার সারে জাঁহাসে আচ্ছা বাজানো হবেই। সামরিক বাহিনীর প্যারেডের সময় যখন জনগণমন অধিনায়ক বাজানো নীতিসঙ্গত সেখানে প্রথা ভেঙে অন্য গানটিই বাজানো হয়। হিন্দুস্তান কথাটা তাতে আছে বলেই হয়তো এবং সেটি বাঙালির লেখা নয় বলেই। রবীন্দ্রনাথের গানটির বিরুদ্ধে আরও নানা অপপ্রচার চালানো হয়। নতুন প্রধানমন্ত্রী বাঙালির উদ্ভাবিত জয় হিন্দ্ কথাটিও বলেন বলে শুনিনি। আসল ব্যাপারটা হলো দিল্লির হিন্দি নেতারা অনেক হিসেব করে বাংলাকে কেটে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছিলেন, সে স্বাধীনতা হিন্দুস্তানের স্বাধীনতা, আর কে না জানে হিন্দুস্তানের মধ্যে বাংলার স্থান নেই। আমরাও সেটা জানি বলেই হিন্দিওলাদের হিন্দুস্তানি বলি, ভারতীয় বলি না। হিন্দুস্তানিরা একটি স্বতন্ত্র সত্তা। দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত এর আওতাভুক্ত নয়। আমি মাদ্রাজে গিয়ে দেখেছি সেখানেও লোকেরা নিজেদের হিন্দুস্তানি মনে করে না। মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণও নেই। ভারত এবং হিন্দুস্তান কথাটা কিন্তু সমার্থক নয়, মানচিত্রে এক হলেও মানসিকতার দিক থেকে তো নয়ই। হিন্দিওলাদের কাছে বাংলা হচ্ছে পাণ্ডব-বর্জিত দেশ। সমস্ত রকম অন্যায় অবিচার এই রাজ্য এবং ভারতের পূর্ব অঞ্চলের প্রতি চালান হয়। আমার পরিচিত এক ইংরেজ দম্পতি সম্প্রতি এসেছিলেন, দিল্লি এবং বোম্বাই থেকে। তাঁদের বলা হয় কলকাতায় যাবেন না, কলকাতা খুব খারাপ জায়গা। গেলেই লোকেরা তোমাদের নানা বিপদে ফেলে দেবে। তবু তাঁরা এসেছিলেন এবং শান্তিনিকেতনেও গিয়ে দুদিন ছিলেন। ভারি খুশি হয়েছিলেন তাঁরা। তাঁরা জানালেন ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের নানা পর্যটন অফিসে গেছেন কিন্তু কেউই শান্তিনিকেতনের কথা তাঁদের বলেনি। বলবে কেন, বললেই তো বাংলার সুবিধে। বললেই তো রবীন্দ্রনাথের কথাটা এসেই পড়বে, তখন তো মুশকিল। ভারতবর্ষের সবচেয়ে মহান কবি রবীন্দ্রনাথ যিনি সমস্ত পৃথিবীতেই একজন অসামান্য প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃত তিনি বাঙালি হয়েই যত ভুল করেছিলেন। তিনি যদি একটু বুদ্ধি করে, উত্তরপ্রদেশেও জন্মাতেন তাহলেই অনেকটা কাজের কাজ হতো। তাহলে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আজ যেভাবে দিল্লির দরবারে অবহেলিত এত অবহেলিত তিনি হতেন না। কেননা, হিন্দি যাঁদের মাতৃভাষা তাঁরা রাজা হওয়ায় যে-সব কাণ্ড হয়ে চলেছে তা রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যেও জুটত।

রবীন্দ্রনাথ যদি হিন্দিভাষী হতেন তাহলে দিল্লিতে যে বিশাল আর্টস্ কমপ্লেক্স হচ্ছে, যার প্রাথমিক খরচ ধরা হয়েছে ষাট কোটি টাকা, সেটির নাম রবীন্দ্র কমপ্লেক্স হতে পারত। এখন যার নাম দেওয়া হয়েছে ইন্দিরা আর্টস্ কমপ্লেক্স। না, বোধ হয় তাও হতো না, কেন না ইন্দিরা গান্ধী নিশ্চয় রবীন্দ্র-

নাথের চেয়েও অনেক উঁচুদরের মানুষ ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি ছিলেন না ঠিকই, তবে তিনি তো জওহরলাল নেহরুর কন্যা? আর কে না জানে জওহরলাল ছিলেন উত্তরপ্রদেশের লোক, হিন্দিভাষী, ভারত ভাগের প্রধান সমর্থক এবং নায়ক, যিনি বাংলা এবং পঞ্জাবকে কেটে ভাগ করে ভারতের প্রধান স্থপতি হিসেবে আজ সর্বত্র প্রচারিত। তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীতে প্রায় হাজার কোটি টাকাই খরচ করছে কেন্দ্র। সেই জওহরলালের আপন কন্যা ইন্দিরা ছবি আঁকতে পারতেন না, কবিতা লিখতে পারতেন না, দার্শনিক ছিলেন না কিন্তু তিনি যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মা! অতএব ভারতের রাজধানীতে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য নানা বন্দোবস্ত হবে তাতে সন্দেহ কি। তাঁর নামে হবে আর্টস্ কমপ্লেক্স। তাঁর স্মৃতিরক্ষায় হবে মিউজিয়াম, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক নানা পুরস্কার। রবীন্দ্রনাথ সেখানে কে? কেউ না। ইন্দিরার মুখাঙ্কিত মুদ্রা বেরিয়ে গেছে কবে, জওহরলাল নেহরুরও মুখওয়ালা মুদ্রা বেরিয়ে গেছে। এবার তাঁর শতবার্ষিকীতে আবার বিশেষ মুদ্রা বেরুচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মুখাঙ্কিত মুদ্রা? সে আর হচ্ছে না, কেন না রবীন্দ্রনাথের জন্ম হিন্দুস্তানে হয়নি, হয়েছে কলকাতায়।

ইংল্যাণ্ডের স্ট্র্যাটফোর্ড অন এভন সমস্ত পৃথিবীর এক তীর্থক্ষেত্র, শেক্সপীয়রের জন্মস্থানে বছরে কয়েক হাজার কোটি টাকা উপার্জন হয়। আমাদের শান্তিনিকেতন নিয়ে অনেক রাজনীতি হয়, হচ্ছেও। বিশ্বভারতীর আচার্য হলেন প্রধানমন্ত্রী, যেখানে মানানসই হতো একজন সর্বজনমান্য কোন অরাজনৈতিক দার্শনিক বা কবি। তিনি বছরে একবার আসেন, হাসেন এবং অনর্গল কথা বলেন। শান্তিনিকেতন থেকে বছরে যেখানে কয়েকশো কোটি টাকা উপার্জন হতে পারত—(সেণ্টিমেণ্ট নয় আর্থিক কারণেই আমাদের শান্তিনিকেতনকে বড় আকর্ষক করে তোলা দরকার) বছরে সেখানে এক কোটি টাকাও ব্যবসায়ীরা উপার্জন করেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু কেন্দ্র কিছুই করেন না। দিল্লিতে এসে বিদেশিরা জানতে পারেন কেবল নেহরু আর ইন্দিরার কথা, এমনকি সঞ্জয় গান্ধীর কথাও! তাঁদের স্মৃতিরক্ষার নানা ব্যবস্থা, কিন্তু সেখানে রবীন্দ্র মিউজিয়াম বা আর্ট গ্যালারি পর্যন্ত নেই। ঘটা করে সরকারি খরচে নেহরু ইন্দিরার সব অনবদ্য প্রধানত রাজনৈতিক রচনা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয় সেখানে ঐভাবে রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশের কোনও ব্যবস্থা নেই।

অবশ্য দোষ আমাদেরও। শান্তিনিকেতনকে একটা বিশাল পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আমরাও তো গড়ে তুলতে চেষ্টা করিনি। কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে রোজ বাস চলে না, সেখানে থাকবার জায়গাও খুব যে রয়েছে তাও নয়। শান্তিনিকেতনে একটা বড় প্রেক্ষাগৃহ থাকতে পারত যেখানে রোজ হতে পারত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রবীন্দ্র নাটক, রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি, গান। শান্তিনিকেতন নিয়ে সরকারি কোনও ভাল পুস্তিকা নেই।

কলকাতা বিমানবন্দরে যে সব বিদেশি আসেন তাঁদের প্রত্যেককে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি পুস্তিকা (ষোল পৃষ্ঠা হলেই যথেষ্ট) দেওয়া যেতে পারে। কলকাতার বড় বড় হোটেলেও এই ধরনের পুস্তিকা বিদেশিদের দেওয়া যেতে পারে। কেবল বিদেশি নয় আমাদের দেশের লোককেও শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দেওয়া যেতে পারে। এর জন্য খরচ? খরচ তো হবেই, কিন্তু খরচের তুলনায় লাভ যে অনেক বেশি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারও রবীন্দ্রনাথের নামে একটা আন্তর্জাতিক পুরস্কার ঘোষণা করতে পারেন। বিদেশিদের জন্য রবীন্দ্রনাথের তিন খণ্ড বই বিশেষ কম দামে প্রকাশ করা যেতে পারে। টাকা? টাকার অভাব হবে না, একবার লেগে পড়লেই হয়। লটারির টিকিট বিক্রি করেও অনেকটা হতে পারে, সাংস্কৃতিক দপ্তরকে আরও একটু উদ্যোগী হতে হবে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের নিজেদেরই অনেক দায়িত্ব রয়েছে। কেবল ইংরেজি অনুবাদ নয়, তামিল, তেলুগু, অসম, নেপালি, মারাঠি ইত্যাদি ভাষায় রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ কেবল নয় প্রচার করা দরকার। এ দায়িত্ব আমাদেরই এবং এ জন্য বছরে (ধরা যাক) দশ পনেরো কোটি টাকা খরচ করাটা খুব বেশি নয়। আর এই টাকা নেই, বা আমরা দিতে পারি না তা নয়, তবে?

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার যা করবেন বা করবেন না তা আমরা জানি। ওঁরা ভোটের জন্য কিছু করতে পারতেন, কিন্তু ভোটারদের দাবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অনুপস্থিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও একটা বড় দায়িত্ব আছে। দিল্লি বোম্বাই লণ্ডন মস্কো বেজিং বন ইত্যাদি জায়গায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি রবীন্দ্র কেন্দ্র খুলতে পারেন না? একবার চেষ্টাও তো করা উচিত। কেন্দ্র বাধা দেবে ভারতের বাইরে কেন্দ্র খোলাতে? তাহলে তো ভালই, একদিনের বন্ধ সে উপলক্ষে ডাকা যেতে পারে। আর আগেই বলে রাখছি, সে বন্ধ হলে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করব।

এই রবীন্দ্রমাসে আমরা নিজেরা যে যতই কথা বলি, চিৎকার করি, রবীন্দ্রনাথ বড় কবি বলি—এতে কোনও লাভ হবে না, যদি না রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশ সারা ভারতে এবং পৃথিবীতে প্রচার করতে পারি। এটা প্রচারের যুগ। প্রচার ছাড়া কিছুই হয় না বলা যায়। কেবল বর্তমান যুগই যে প্রচারের যুগ তা নয়, পুরনো আমলের গৌতম বুদ্ধও তা জানতেন। পরবর্তীকালে রাজা অশোক প্রচারকে এক অপূর্ব মাত্রা দিয়েছিলেন, হাজার হাজার শিলালিপিতে দেশ ছেয়ে ফেলেছিলেন। সে প্রচার কেবল যে তাঁর আমলেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বহু শতাব্দী পেরিয়ে সে প্রচার এখনও আমাদের অভিভূত করে। অতএব রবীন্দ্রনাথ নিয়ে প্রচারে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, উপায় নেই। দিল্লির সরকার রবীন্দ্রনাথ, বাঙালি এবং পশ্চিমবঙ্গ—এই তিনটের কোনটাতেই আজ উৎসাহিত নয়, এবং যতদূর মনে হয় ভবিষ্যতেও হবে না। তাই এখন থেকে নিজেদের চরকায় নিজেদের তেল দিতে হবে।



প্রবাদ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ

খরগোশ এবং কচ্ছপের মধ্যে দৌড় প্রতিযোগিতায় কে জিতবে ? এ প্রশ্নের জবাবে যে কোনও অশিক্ষিত ব্যক্তি বলবেন, এই প্রশ্ন আসে কোত্থেকে। অবশ্যই খরগোশই জিতবে। উত্তরটা সঠিক। যাকে বলে নির্ভুল ! কিন্তু এই প্রশ্নের জবাবে একজন শিক্ষিত ব্যক্তি বলবেন, এর উত্তর আমি জানি না ভেবেছ ? নিশ্চয়ই কচ্ছপ জিতবে। কিন্তু কেন কচ্ছপ জিতবে, তা কিন্তু শিক্ষিত লোক ঠিক মত বলতে পারবেন না। তাঁকে একটু চেপে ধরুন, তিনি গাঁই-গুঁই করে জবাব দেবেন, কেন জিতবে বলছি—আসলে খরগোশ ত জানে সে খুব দ্রুত দৌড়য় ? অন্তত একটি স্বাস্থ্যবান খরগোশ যে-কোনও স্বাস্থ্যবান কচ্ছপকে দৌড় প্রতিযোগিতায় হারিয়ে ভূত করে দিতে পারে—অতএব খরগোশটির রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত আত্ম-বিশ্বাস…।

এখানে ঐ 'মাত্রাতিরিক্ত' কথাটি আপনার ঠিক পছন্দ হবে না, মাত্রাতিরিক্ত কেন ? একটি খরগোশ জানে, সে কচ্ছপকে দৌড়ে হারিয়ে দেবেই। তাহলে সেটায় তার আত্ম-বিশ্বাস যথেষ্টই থাকবে। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত হবে কেন ? যাই হক, শিক্ষিত ব্যক্তিটি এরপরও বলবেন, ঐ মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস রয়েছে বলেই খরগোশ দৌড়ুতে দৌড়ুতে কিছু দূর গিয়ে যখন দেখবে সে কচ্ছপকে ফেলে বহু দূর চলে এসেছে, সে তখন একটু বিশ্রাম করবার জন্য একটি গাছতলায় শুয়ে পড়বে, এবং ঘুমিয়ে পড়বে। আর কচ্ছপ অতি ধীরে ধীরে গেলেও, যেহেতু তার আত্মবিশ্বাস নেই, সে-জন্য সে কোথাও বিশ্রাম নেবে না, অতএব সে যখন পৌঁছুবে গন্তব্যস্থানে তখন সে অবাক হয়ে দেখবে, খরগোশ তখনও আসেনি সেখানে, অতএব কচ্ছপেরই জিত হবে।

শিক্ষিতদের মুসকিল হচ্ছে, তাঁরা এই গল্প-কথাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করেন, কেননা, এই গল্পের নাম দেওয়া হয়েছে প্রবাদ। প্রবাদ হলেই আর ভাবনা-চিন্তা করার যেন দরকার নেই, সেটিকেই পরম সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে, এ ব্যাপারে তাঁরা বদ্ধপরিকর। কেউ প্রশ্ন তুলবেন, কেন প্রবাদে অশিক্ষিত লোকেরাও কম বিশ্বাস করেন না। গ্রামে বা শহরের অশিক্ষিতদের

কথার মধ্যেও প্রবাদের দেখা যে কম পাওয়া যায়, তা নয়।

এখন দেখছি কথাটা ঠিকই। সর্বদা যে শিক্ষিত লোকেরাই প্রবাদে বিশ্বাস করেন তা নয়—অশিক্ষিতরাও কম যান না। তবে এই প্রবাদের প্রথমেই যে গল্পটা দেওয়া হয়েছে, এটা ঈসপ নামক এক প্রাচীন গ্রীক ক্রীতদাসের গল্প বলে কথিত, এবং গল্পটি সাধারণত শিক্ষিতরাই জানেন। আমাদের দেশের সাধারণ গ্রাম্য বা শহুরে প্রবাদ এটা নয়, সেই কারণেই শিক্ষিত বা অশিক্ষিত প্রশ্নটি তোলা হয়েছিল।

আসল কথা হল, একটি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক গল্পকে এনে প্রথমে হাজির করা হল। যে গল্প বাস্তবে কখনই ঘটতে পারে না। কোনও খরগোশের সঙ্গে কচ্ছপের দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যাপারটি উন্মাদের কষ্ট-কল্পনাতেও আসবে বলে মনে হয় না। আবার খরগোশ এবং কচ্ছপের মধ্যে কথাবার্তা হওয়াও সম্ভব নয়। এর পর আরও সব টেক্‌নিকাল অসুবিধে আছে, যেমন প্রতি-যোগিতার স্থান-নির্বাচন, রেফারি ইত্যাদি নানা বায়নাক্কা। তারপর খরগোশ এবং কচ্ছপ একটি জায়গায় দাঁড়াবে, একজন দৌড়ের সংকেত দেবে, তারপর দৌড় শুরু হবে। কেউ কেউ বলবেন, গল্পে অত সব না থাকলেও চলে। বেশ—গল্পে যা আছে তাও তো সম্ভব নয়! এরও উত্তর আছে—রূপক গল্পের মজাই ওই, রূপক গল্পে গাধা কুকুর পাখি ইত্যাদি জন্তু-জানোয়ারেরা কথা বলে—দৌড় প্রতিযোগিতাও করে।

—এবং গল্প বলেই দৌড়ে খরগোশ হেরে যায়। বাস্তব হলে কিন্তু খরগোশ দৌড় শুরু করার পর বিশ্রাম নিত না। সোজা গন্তব্য জায়গায় পেঁছে বিশ্রাম করবার অনেক সময় পেত। কে একজন বললেন আমাকে।

তিনি আরও বললেন, এই গল্প থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

—কেন? আমার প্রশ্ন।

—কারণ প্রবাদ থেকে শিক্ষা নিতে হয় যে।

—ও তাই বুঝি? আমি বলি। তা এই প্রবাদ থেকে কি শিক্ষা পাওয়া গেল?

—শিক্ষা পাওয়া গেল এই যে, আত্মবিশ্বাস বেশি হলে ফল খারাপ হয়। আত্মবিশ্বাস বেশি হলে আসল কাজের সময় ঢিলেমি আসে। আসল কাজের সময় ঢিলেমি এলে প্রতিপক্ষ, যেহেতু তার আত্ম-বিশ্বাস নেই, সে কাজ করে যায়, একেবারে বিশ্রাম করে না, এবং তাতে সে সফল হয়।

এবার আমার প্রশ্ন, তাতে কার কি? আত্মবিশ্বাস বেশি হলে তার ক্ষতি হয় এই তো?

—ঠিক তাই।

—তা ক্ষতি হক না। তাতে আমার কিছুই এসে যায় না।

—আপনি বুঝতে পারছেন না মশাই। এই গল্পের নীতি হচ্ছে কঠোর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই।

আমি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলি, হ্যাঁ—কথাটা ঠিক। এই গল্প থেকে এই একটা

নীতি নির্গত বা নির্ধারিত হয়েছে বটে। ঠিক কথা—কঠোর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই, ঠিকই। পরিশ্রম করে যেতে হবে, বিশ্রাম নেওয়া চলবে না একেবারেই।

—একজ্যাক্টলি! তিনি বলেন, এটাই গল্পের মর্ম কথা।

—এটাও হতে পারে। আমি বলি—আবার এটা নাও হতে পারে, অর্থাৎ কিনা গল্পের ভেতর থেকে আরও একটি নীতি উঁকি দিতে পারে। যে নীতি প্রথম নীতিকে খণ্ডিত করতে পারে!

তিনি সন্দেহাশ্রিত কণ্ঠে বলেন, যেমন?

আমি বলি, যেমন ধরুন গিয়ে, এই গল্পের যে নীতি উঁকি দিচ্ছে, অন্তত আমার মনে হচ্ছে উঁকি দিচ্ছে, তা হল আত্মবিশ্বাস না থাকাই মঙ্গল।

—মানে? তিনি বললেন।

আমি বললাম, বুঝতে পারলেন না? কচ্ছপের মোটেই আত্মবিশ্বাস ছিল না, সে জন্য সে ক্রমাগত কাজ করে গেল, আর খরগোশের আত্মবিশ্বাস ছিল প্রভূত পরিমাণে···।

তিনি একটু ভাবিত হলেন। কোনও জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, আরও একটা নীতি এর মধ্যে, মানে ঈসপ্ সাহেবের গল্পের মধ্যে লুক্কায়িত আছে মনে হয়!

তিনি আমার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালেন। বললেন, আরও একটা নীতি? একটা গল্পে নীতি কটা থাকে?

আমি বললাম শুনুন না ব্যাপারটা। কচ্ছপটা একেবারে বিশ্রাম না করে অতটা পথ গেলে তাতে তার তো মারাত্মক ক্ষতিও হতে পারত। অর্থাৎ কিনা যে কচ্ছপের দেহভার অতখানি তার হৃৎপিণ্ডের উপর অনভ্যস্ত লাগাতার চাপ পড়ার ফলে সে রাস্তায় পড়ে মরতে পারত, কিংবা মরে পড়তে পারত, কিংবা পরে মরতে পারত, যাই বলুন না কেন তাহলে ঝামেলা বাড়ত। আমার মনে হয় কি জানেন?

তিনি বললেন, কি?

আমি বললাম আমার মনে হয়, সাধারণত কচ্ছপরা দীর্ঘজীবী হয় কিন্তু এই কচ্ছপটা অতখানি একনাগাড়ে দৌড়ে গিয়ে নিশ্চয়ই পটল তুলেছিল, মানে পরে মরেছিল, যদিও ঈসপ্ সাহেব তা বলেননি। বললে তো আর নীতি-গল্প হয় না। তিনি বললেন, নীতি-গল্প সম্পর্কে আপনার শ্রদ্ধা নেই তেমন, মনে হয়। আমি বললাম, শ্রদ্ধা একেবারে নেই তা বলব না। অনেক নীতি-গল্পই আমার মনকে চুম্বকের মত টানে, যেমন দুই বন্ধু আর ভালুকের গল্প। চমৎকার গল্প। গল্পটা কেবল চুম্বকের মত টানে বললে কম বলা হবে—একেবারে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। ওর মধ্যেকার নীতিও আমার অনুধাবনের বাইরে নয়। এর মধ্যে ভালুক মৃত-ভান-করা বন্ধুকে সত্যি সত্যি মৃত মনে করে চলে যাওয়ার পর বিপদের সময় পলাতক বন্ধু গাছ থেকে নেমে এসে যখন প্রশ্ন করল, "ভালুক তোমার কানে কানে কী বলিয়া গেল?"

তখন বন্ধু বলল, "বিপদের সময় যে বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া যায় তাহাকে বিশ্বাস করিও না।" (এখানে লক্ষণীয় পুরনো আমলে কথাগুলো হত সাধু ভাষায় !) যাই হক—এই একটা গল্পের মত গল্প। এর মধ্যে দারুণ এক নীতি রয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে প্যাঁচও আছে।

—প্যাঁচও আছে ?

—আছেই তো ! আমি বলি। একটা জলজ্যান্তো ভালুক একটা জলজ্যান্তো মানুষকে মৃত মনে করে চলে গেল এটা বিশ্বাস করা যায়, আপনিই বলুন ! যতই প্রবাদ-প্রবাদ করুন, এই সমস্যা আমার কখনই সমাধান করা হয়নি। রাত জেগে জেগে ভেবেছি—এও কি সম্ভব ? তার উপর বন্ধু পালিয়ে গিয়ে গাছে উঠে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিল—এর মধ্যে আমার অন্যায় তো মনেই হয়নি। ধরা যাক, সে বন্ধুকে বাঁচানোর জন্য ভালুকের সঙ্গে ফাইট দিত তাহলে সেটি কি একটা বেশ জবর বোকামির পরিচয় দেওয়া হত না ?

গাছে-চড়া-বন্ধু যদি গাছে না চড়ে ভালুককে আক্রমণ করত, তাহলে স্ট্যালিনের সঙ্গে লড়াইয়ে হিটলারের যা দশা হয়েছিল, তাই হত। ভালুক তাকে শেষ করে দিত, আর মৃত-ভান-করা বন্ধুকেও শেষ করত। তার চাইতে এই তো ভাল হয়েছে।

—হুঁ। তিনি বললেন। আপনি যখন এভাবে বুঝিয়ে বললেন তখন তাই মনে হচ্ছে বটে। যেখানে দু-জনই মরে ভূত না হলেও আহত হয়ে ক্যাঁও ম্যাও করত সেখানে দু-জনেই বেঁচে গেল, এটা একটা বড় কথা।

—তাহলেই দেখুন—আমি বলি, প্রবাদ গল্পগুলি ভাল হলেও তার মধ্যেকার নীতি খুঁজে বার করা ভারি কঠিন কাজ। আবার দেখুন প্রবাদ গল্পের মধ্যে একটিই নীতি থাকে, তাও নয়। কিন্তু ঝামেলা বাধে যখন প্রবাদ হিসেবে চালু কতকগুলো নীতি-নির্দেশক চিন্তা না করেই মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ধরুন 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'। কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু একটু আগে ভালুক ও দুই বন্ধুর গল্পের সঙ্গে এর একটা সংঘর্ষ আছে।

—সংঘর্ষ আছে ? তিনি চমকিত হন। মানে ?

—হয়ত কথাটা ব্যাকরণসম্মত হয়নি। আমি বলি—সংঘর্ষের জায়গায় বিরোধ বসানো যায়। বুঝিয়ে বলছি—ঈসপ্ সাহেবের গল্পে স্পষ্টই বলা হচ্ছে বন্ধুর বিপদে সাহায্য না করলে দারুণ অন্যায় করা হয়। গল্পের ওটাই সার কথা। যদিও দেখিয়ে দিয়েছি বন্ধু না পালালে দু-জনেরই বারোটা বেজে যেত ! এখন তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে ঈসপের গল্পের সারমর্মই ঠিক—অর্থাৎ, বন্ধুর বিপদে বন্ধুকে সাহায্য করাই প্রয়োজন—তাহলে 'চাচা আপন প্রাণ বাচা' এই প্রবাদ-কথাটা কি বাতিল হয়ে যাবে ? কথাটি কি বানের জলে ভেসে এসেছে ? বলা হয়, মানুষকে নীতির সাহায্যে জীবন-পথে চলতে সাহায্য করার জন্য শয়ে শয়ে নীতিবাক্য তৈরি হয়েছে, সেগুলি সর্বকালের মানুষের গভীর অভিজ্ঞতার ফসল। এই কথাটিই তো অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত চাচা

আপন প্রাণ বাঁচা ! আবার ঐ একই ভাবকে আবার বলা হয়েছে 'আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম।' প্রথম দুটি গল্প হল রূপ-কথা। রূপ-কথার মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞান দেওয়া যার একমাত্র কাজ। তাতে একটু সময় লাগে। গল্পের শুরু, মধ্য এবং শেষ থাকে। কিন্তু প্রবাদ বাক্যগুলো সরাসরি মানুষকে সংক্ষেপে নির্দেশ দেয়। যেমন 'লাফানোর আগে ভেবে দেখুন'। এই রকম উটকো নানা উপদেশ এবং নীতি-নির্দেশক মানুষকে সাহায্য করে কি না, ভগবান জানেন। 'লাফানোর আগে ভেবে দেখুন'। কথাটা নির্বিচারে প্রয়োগ করা সম্ভব কি ? অনেক সময়েই মানুষ যে না-ভেবে লাফায়, সেটা শখ করে নয়, ভাবার সময় থাকে না বলেই। ট্রেনে আগুন লাগলে অনেকেই লাফায়, তাতে অনেকে গুরুতর আহত হয়। অর্ধমৃতও হতে দেখা যায় কাউকে কাউকে। কিন্তু অন্য এক নীতি-নির্দেশক বলছে, পণ্ডিতেরা অর্ধেক ত্যাগ করে থাকেন। একজন আগুন-লাগা ট্রেন থেকে না-ভেবে কিংবা ভেবে লাফিয়ে যদি কেবল আহত হন তাহলে সেটা খারাপ কি ? আগুনে নিশ্চিত পুড়ে মরার চাইতে লাফিয়ে অর্ধমৃত হওয়া অন্যায় কিছু আবদার নয়। তাহলে ট্রেনে আগুন লাগলে ভাবতে বসব, না চাচা আপন প্রাণ বাঁচা এই অন্য নীতি-নির্দেশক অনুযায়ী লাফিয়ে অর্ধমৃত হব ?

তিনি বললেন, আপনার দেখছি প্রবাদ, নীতিকথা এ-সবের উপর ভারি অনীহা ?

আমি বললাম, অনীহা ? ইহার অর্থ কি মশাই ?

তিনি বললেন, মনে হয়, আপনি এই সব কথা, উপ-কথা, প্রবচন, প্রবাদ, উপ-প্রবাদ ইত্যাদি সম্পর্কে নানাবিধ কিংবা বিবিধ চিন্তামালা রচনা করেছেন ?

আমি বললাম, তা একটু-আধটু করেছি বই কি, কিন্তু শোনে কে, শোনার লোক নেই, সবই আমার অরণ্যে রোদন যে !

—না না সে কি কথা। তিনি বলেন। অরণ্যেও শোনার লোক না থাক পশু পক্ষী আছে, কাগ-বগ আছে, কোনও কোনও অরণ্যে কুমিরও থাকে।

—অরণ্যে কুমির ? কথাটায় আমার সন্দেহ হয় কিন্তু প্রকাশ করি না। বলি, তাহলে আপনাকেই সব কথা খুলে বলি। আমার দুঃখ এবং আক্ষেপ নিয়ে ধানাই-পানাই কি আপনার ভাল লাগবে ?

তিনি মনে মনে কি বললেন যেন। মনে হল, বলছেন, পড়েছি মোগলের হাতে । কিন্তু তারপর কি যে বললেন, তা আর বুঝতে পারলাম না। কি হতে পারে তাঁর অনুক্ত কথাগুলি, তা ভাবতে বেশি সময় নষ্ট না করে সরাসরি লাফ দিলাম। বললাম, দেখুন আমার কথা শুনে আমার প্রতি অবিচার করবেন না। আসলে এই সব প্রাচীন মনুষ্যগণের রচনাবলী কোটি কোটি মানুষকে বোকা-বালক বানিয়ে রেখেছে। মানুষকে একটা গতানুগতিক পথে চিন্তা করতে শিখিয়েছে। আলটু-পালটু এমন সব কথা বলেছেন ঐ-সব ব্যক্তিরা যে সাধারণ লোকেরা প্রায়-অজ্ঞ থেকে গেছে। আমি থামি না। বলে যাই—

যেমন ধরুন গিয়ে প্রাজ্ঞ বাক্যটি 'যত গর্জায় তত বর্ষায় না'। এর কোনও মানে হয় না! গর্জনের সঙ্গে বর্ষণের কোনও সম্পর্ক নেই। কখনও কখনও বিনা গর্জনে, বা প্রায়-বিনা গর্জনে প্রভূত পরিমাণে বর্ষণ হয়ে থাকে। কোনও নিয়ম নেই যে এতখানি গর্জনে এতখানি বর্ষণ হয় বা হওয়া উচিত। এর কোনও বৈজ্ঞানিক মাপ-জোক নেই। অনেক সময় সমস্ত দিন-রাত বৃষ্টি হচ্ছে অথচ গর্জন একেবারে নেই। বহু বর্ষার রাতে এবং দিনে প্রাকৃতিক এই বিষয়টি আমরা দেখেছি। কিন্তু অন্য ব্যাপারও তো দেখেছি—আওয়াজ হচ্ছে মেঘে, গুড় গুড় গুম গুম আওয়াজ, আর হুড় মুড় করে বৃষ্টিও পড়ছে, তখন গর্জনের চেয়ে বর্ষণ বেশি হলেও এই প্রবাদ বাক্যকে বাদ দেওয়ার কথা কারুর মনে হয় না কেন? তার কারণ মানুষ ভাবতে চায় না, ভাবলেও প্রতিবাদ করতে চায় না। মনে মনে ভাবে প্রতিবাদ করে সময় নষ্ট করে লাভ কি? গোলমালে ভাই কাজ-কি, এসো অন্য পথে হাঁটি।

এইভাবেই পৃথিবীর মানুষ কথার জালে বন্ধ হয়ে পড়েছে। কথার জাল বড় কঠিন ব্যাপার। নাইলনের জালের চাইতেও এক কাঠি সরেস এই জাল। এই বাক্যজালের জালিয়াতদের কু-বুদ্ধিতে মানুষ অভিভূত এবং পরাজিত। যেহেতু কথায় আছে সেহেতু তা নিয়ে চিন্তা বা দুশ্চিন্তা কিছুই নেই। এই-ভাবেই ধর্মবাক্যও মানুষকে জালবন্ধ করে, জ্বালায়ও, কিন্তু তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া বা দেওয়া সহজ নয়, কেননা সে জাল অনেক সময়েই তার নিজের সমর্থনেই তৈরি যে!

ভেবে দেখুন আর একটা বাজে কথা, 'অর্থই সমস্ত অনর্থের মূল'। দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে এ কথাটা উচ্চারিত হয়। আমরাই উচ্চারণ করি, হয়ত বিশ্বাসও করি। কিন্তু এই কথার সত্যতা সম্পর্কে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করি না পর্যন্ত। অথচ এর উল্টোটাও তো সত্যই, যেমন 'অর্থই সমস্ত উন্নতির মূল'। কিন্তু এই বাস্তব সত্যটা আমরা ভুলেই গিয়েছি। ইংরেজরাও কথাটা বলে থাকে, মানি ইজ দি রুট অফ অল ইভিল! আবার দেখুন আর একটা প্রাজ্ঞ-বাণী 'বেনাবনে মুক্তো ছড়াবে না'। কিন্তু মুক্তো ছড়ানোর প্রশ্ন ওঠে কোত্থেকে। তার একটা উদ্দেশ্য তো থাকা দরকার—কিন্তু কি সে উদ্দেশ্য? যার মুক্তো আছে সে বেনা গোলাপ বা অন্য কোনও বনে তা ছড়াতে যাবেই বা কেন? এখানে যেন ধরে নেওয়া হচ্ছে মুক্তো ছড়ানোরই জিনিস, কেবল ছড়াতে হলে বেনা-বনে ছড়াবে না তাহলেই হল! এর অন্তর্নিহিত অর্থ যাই হক না কেন এর প্রস্তাবনাই যে কিম্ভূত! কেউ যদি বলে বাঘের গোঁফ ডাকবাক্সে ফেলবে না, তাহলেও যেমন ব্যাপারটা বিভ্রান্তিকর বলে মনে হতে পারে, এও তো তাই। কিন্তু বহুদিন বলে বলে কথাটা এখন এমন একটা স্থায়িত্ব পেয়েছে, যে এটা আর ভোলানো যাবে না। এই প্রসঙ্গে আর একটা গুরুতর কথা, বেনা-বন কোথায় পাওয়া যাবে? বেনা গাছটিই বা কি রকম? বেনা গাছ তো?

আরও একটি প্রাজ্ঞ-বাক্য, এটা উপদেশ নয়—একটা বর্ণনা, কিংবা বাণী। অমর-বাণীও বলা যায়, কেন না এটিকে আমি অন্তত গত পঞ্চান্ন বছর ধরে

এখানে ওখানে অমর হয়ে থাকতে দেখেছি। এর নিশ্চিহ্ন হওয়ার কোনও চিহ্ন নেই—কথাটি হল, হাতি খানায় পড়লে ব্যাঙও লাথি মারে। এটা এমন কিছু সংবাদ নয়। হাতি তার দীর্ঘ জীবনে জান্তে হক অজান্তে হক বহু ব্যাঙ হত্যা করেছে। আহতও করেছে বহু। ব্যাঙদের দৃষ্টিতে দেখলে হাতিকে এক অত্যাচারী হত্যাকারী নিষ্ঠুর জীব বলেই মনে হবে। হাতি খানায় না পড়লেও বহু ব্যাঙ হয়ত ভেবেছে হাতিকে একবার বাগে পেলে হয়, তাকে মজাটা দেখিয়ে দেব। হাতি খানায় পড়ায় ব্যাঙের সেই সুযোগ এসে যায়। তখন ব্যাঙেরা তাকে লাথি মারে। এই তো ব্যাপার। কিন্তু হাতির তাতে দুঃখের কারণ কিছু থাকতে পারে না, কেননা যত বড় ব্যাঙই হক না কেন, কিংবা যত ছোট হাতিই হক না কেন একটি বা কয়েক ডজন ব্যাঙও হাতিকে রাতদিন লাথি মারলেও হাতির ক্ষতি কিছুমাত্র হবে বলে মনে হয় না। তার মনে হবে ব্যাঙেরা তার গা হাত পা টিপে দিচ্ছে এই পর্যন্ত। এই কথাটার মধ্য দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে তা আমার মাথায় ঢোকে না।

যখন খানার কথাই হল তখন এই সঙ্গে আর একটি মহা-বাক্যও মনের গহনে উঁকি মারছে। সেটি হল 'খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে'। কথাটাকে অন্য ভাবে দেখা যাক্। একটি লোক খোঁড়া হয় কেন ? আকস্মিক কোনও দুর্ঘটনা ? হতে পারে—কিংবা এমনও হতে পারে লোকটিই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ? হয়ত সে অন্যমনস্ক, কিংবা তার বুদ্ধি কম। সে-সব ক্ষেত্রে লোকটির চরিত্রেই ত্রুটি থাকা সম্ভব। খোঁড়া হওয়ার পরও লোকটির চরিত্র নাও পালটাতে পারে। সেক্ষেত্রে খানা-খন্দে আবার পা পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে কথাটা অদৃষ্টের পরিহাস কিংবা একটা আশ্চর্য ঘটনা নয়—আসলে যে লোকটি একবার খোঁড়া হয়েছে যে কারণে, সেই কারণটিই তাকে পুনরায় বেকায়দায় ফেলতে সাহায্য করে। তাছাড়া, খোঁড়া দুর্বলও। একজন দুর্বল লোকেরই বিপদ বেশি হয় বা হওয়া সম্ভব। এ ব্যাপারে সংখ্যাতত্ত্ববিদেরা মোটামুটি সঠিক হিসেব দিতে পারবেন। এ নিয়ে মিথ্যে প্রবাদ বাক্য সৃষ্টি করার অর্থ কি ?

'উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়'। এর অর্থ যা, তার কোনও অর্থ হয় না। একটি মুলো ছোট অবস্থায় দেখলেই কেমন করে সিদ্ধান্ত করা যাবে সেটি কত বড় হবে, কত ওজনের হবে, কেমন স্বাদের হবে ? বড় জোর বলা যায় দেখে মনে হচ্ছে এটা ভালই হবে—কিন্তু নিশ্চিত হওয়া যায় কি ? এই বাক্যেরই এক ইংরেজ ভাই আছে, সেটি হল—'মর্নিং শোজ্ দি ডে'! অর্থাৎ সকালটা দেখলেই বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে! এটা একেবারে বাজে কথা। প্রায় অকথ্যই বলা যায়। সকালে রোদ্দুর বিকেলে ঝড়বৃষ্টি আমরা হামেশাই দেখছি। সকালে ঝড়বৃষ্টি, বেলা এগারোটার পর আকাশ পরিষ্কার—তাও দেখেছি এবং একবার নয়—সহস্রবার। আবার বিলিতি শহর লণ্ডনে তো কখনও কখনও আকাশের অবস্থা প্রতি দশ মিনিটে বদলে যায়। সেই দেশের মানুষ কেমন করে বিশ্বাস করে মর্নিং শোজ দি ডে ? ভাল একজন উকিল

চেনা থাকলে এর বিরুদ্ধে একটা শো-কাজ নোটিস ধরিয়ে দিতাম। 'মর্নিং শোজ দি ডে' যে বাজে কথা তার প্রমাণ আমাদের এই পশ্চিম বাঙলার সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের মধ্যে 'জিনিয়াস'-এর সংখ্যা ডজন খানেক হবেন কি না সন্দেহ, অথচ শতকরা ষাটটি মানুষের বাবা মা তাঁদের শিশু-সন্তানদের সম্পর্কে ভেবেছিলেন বড় হয়ে ওরা 'জিনিয়াস' হবে! কিন্তু তাতেও তাঁদের আক্কেল হয় না, তাঁরা নিশ্চিত মনে বলে থাকেন এখনও যে, উঠন্তি মূলো পত্তনেই চেনা যায়।

এইভাবে প্রবাদ-বাক্য বা নীতিবাক্য কিংবা নীতি-নির্দেশক রচনাবলী, বা প্রবচনাদি আমাকে হতাশা থেকে গভীরতম হতাশার মধ্যে নিয়ে গেছে। একটি প্রবচন আছে 'যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ'। কথাটা সত্য নয়—এখনও নয়, কখনই ছিল না। হলে, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা—হনুমান এঁরা সকলেই রাবণ হতেন। এত স্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু বলতে ছাড়ি না কথাটা। এই হচ্ছে আমাদের ভাষার খবরদারি বা ভাষার সাম্রাজ্যবাদ। একে ভাষার সামন্ততন্ত্রবাদ বা ঔপনিবেশিকতা বললেও বিশেষ ভুল হবে না। 'মরা হাতি লাখ টাকা' কথাটিরই বা অর্থ কি? যখন একটা হাতির দাম দেড়শো টাকা ছিল—(আমি কোথায় এক পুরনো বইয়ে এই তথ্য পেয়েছিলাম এখন ভুলে গেছি) তখনই কথাটার অর্থ ছিল না, কেননা যদি তাই হবে তাহলে যাঁদের হাতি ছিল তাঁরা দেড়শো টাকার হাতি মেরে লাখ টাকা যোগাড় করেননি কেন? হাতি মরলেই যদি হাতির দাম লাখ টাকা হয় তাহলে ভারতবর্ষে এককালে যখন লক্ষ লক্ষ হাতি ছিল তখন হাতিদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল কেন? আরও একটা প্রশ্ন—প্রাচীনকালে মরা হাতির দাম লাখ টাকা ছিল, কিন্তু এই আধুনিক কালে, যখন টাকার দাম হুট হাট করে কমে গিয়ে ১৯৬০-এর একটাকা এখন ষোল পয়সায় দাঁড়িয়েছে, এখনও কি মরা হাতি লাখ টাকাই থেকে যাবে? মরা হাতির প্রকৃত দাম কি কমছে? এর জবাব কে দেবেন? এখনও বহু হাতি আছে যেগুলির দাম লাখ টাকার অনেক কম—তাহলে সেগুলিকে মেরে লাখ টাকা করা হয় না কেন? হয় না, কারণ কথাটা যে মোটেই সত্যি নয়।

প্রবাদ মানেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাজে কথা। একেবারে বাজে কথা—যেমন, যতই ধোও না কেন কয়লার মলিনত্ব যাবে না। আচ্ছা মুস্কিল—কয়লার রঙ কালো, কয়লা ময়লা, এটাই কয়লার চরিত্র। এখন কয়লাকে পরিষ্কার করার কথা কোত্থেকে ওঠে? কয়লা ছাড়া অধিকাংশ বাড়িতে রান্না হয় না, বিদ্যুৎকেন্দ্র চলে না, শিল্পাঞ্চল স্তব্ধ হয়ে যায়, অতএব কয়লার রঙ যাই হক না কেন, তাতে কয়লার গুণের কোনও হের-ফের হওয়ার কথা নয়! ইংরেজি বয়ানটা হল, ব্ল্যাক উইল নট টেক এনি আদার হিউ। অর্থ, কালোকে অন্য কোনও রঙে পরিণত করা অসম্ভব। এই প্রস্তাবই যে অদ্ভুত। কালোকে অন্য রঙে পরিণত করার দরকারটা কোথায়, সেটাই তো বোঝা যায় না। আর যদি কেউ তা করতে চেষ্টাও করে, তাহলে তার মাথারই যে চিকিৎসা করা দরকার।

আবার দেখুন, আর একটা সম্পূর্ণ এলে-বেলে কথা : 'সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ' ! আমি যদি সৎ ব্যক্তির সঙ্গে থাকি তাহলে আমি কাশীতে যাব কেন ? আমার কাশীতে যেতে ভালই লাগে না। তা ছাড়া, কাশীতে আমার ধীরুমামা থাকেন—গেলেই, সেই একুশ বছর আগে তাঁর কাছ থেকে দেড়মাসে দেব প্রতিশ্রুতি দিয়ে বারোশো টাকা ধার নিয়েছিলাম, সেটি তিনি চেয়ে বসবেন ! এটাও না হয় কোন মতে এড়ানো যাবে, কিন্তু আরও প্রশ্ন, সৎসঙ্গে আমার যদি কাশীবাস হয়—তাহলে যে সৎ ব্যক্তি আমাব সঙ্গে মিশবেন তাঁর তো সর্বনাশ হয়ে যাবে ! এর কারণ আমি তো সৎ নই। আমার নানা দোষ আছে। একটু আগেই তো জানলেন টাকা ধার নিয়ে শোধ দিইনি। অন্য দোষগুলি তো বলিইনি।

তাহলে এই প্রবাদের কোন অংশটা ফলবে ? আমার সঙ্গে মিশে সৎ লোকের সর্বনাশ হবে, না আমি সৎ লোকের সঙ্গে মিশলে আমার কাশীবাস হবে ? এর জবাব কেউ দেন না, কেননা যতদূর মনে হয় এর জবাব নেই।

প্রবাদ মাত্রেই মিথ্যে, তা আমি বলি না—তবে কোনও কোনও প্রবাদ মিথ্যেই। তাতে ভুল নেই।

এইভাবেই মিথ্যে প্রবাদ আমাদেব বিভ্রান্ত করে। 'গরিবের কথা বাসি হলে ফলে' কথাটিরও মাথা মুণ্ডু গরহাজির ! একটা কথা বাসি হয় কখন, কত সময় লাগে বাসি হতে। দরিদ্রই বা কারা। এগুলির উত্তর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ! দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে যারা, তারা ছাড়াও গরিব লোকের ছড়াছড়ি আমাদের এই পোড়া দেশে। 'গরিবের কথা বাসি হলে ফলে' কথাটা আক্ষেপের সঙ্গে বলা হয়—যেন গরিব বলেই তার কথাটা মানা হয় না, বড়লোক হলেই যেন তার কথা মানা হয়। এ-সব অতি সেণ্টিমেণ্টাল কথাবার্তা, বাস্তবের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। আমার পায়ে যদি রোজ ব্যথা করে—এবং ষোল বকম প্রক্রিয়া এবং ওষুধেও যদি সে ব্যথা না সারে, তাহলে কি আমাকে গরিব খুঁজে খুঁজে তার কাছে পরামর্শ নিতে হবে ? তাহলে দরিদ্রতম ব্যক্তির পরামর্শই সর্বোত্তম হবে, লজিক অনুযায়ী সেটাই হওয়ার কথা। কিন্তু সর্বোচ্চ পরিমাণ ধনসম্পদ কার আছে সেটা মোটামুটি জানা গেলেও দরিদ্রতম ব্যক্তি কে, তা কিন্তু কেউ জানে না। যদি উনি অতই প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হবেন, তাহলে তাঁকে কেউ চেনে না কেন, কে দেবে তার হদিশ ? গরিবের কথা সঙ্গে সঙ্গে ফলে না কেন, বাসি হলেই বা ফলে কেন—এই নিয়েও কিছু দুশ্চিন্তা করা যায় কিন্তু অনেক দুশ্চিন্তা আজ করা হয়ে গেছে, ওটা ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক। আর একটু যোগ করি এর সঙ্গে, আমার পায়ের ব্যথা না সারলে আমি তো বড় লোকের পরামর্শ নিতেও ছুটি না, তবে এই প্রবচন কেন ?

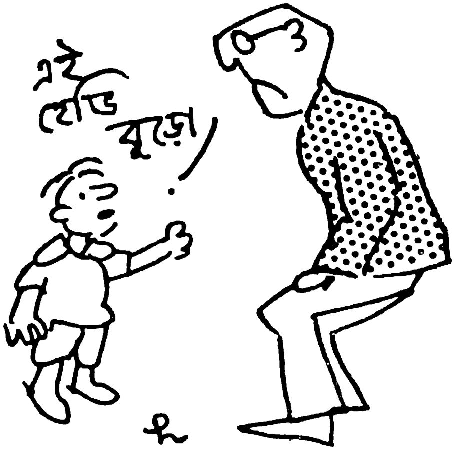
আজ শেষ করি একটা গল্প দিয়ে। গল্পটা পুরনো—তবে আমার এই প্রবন্ধ বা নিবন্ধ যাই বলুন, এর সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। গল্পটি হল এই—দুই চোর এক জনের বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছে। কেমন করে ঢুকলো তা গল্পে দেওয়া নেই, কিন্তু বেরুনের সময় দেয়াল টপকে একজন নেমে যাওয়ার পর

দ্বিতীয় জন নামতে গিয়ে দেখে, সর্বনাশ ! ইতিমধ্যে কোত্থেকে দুটো বাঘ-বাঘা কুকুর দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করছে। দ্বিতীয় চোর ভয়ে কাঠ। কিন্তু প্রথম চোর তাকে ভরসা দিচ্ছে, লাফিয়ে পড় না উল্লুক, জানিস না প্রবাদে আছে, যে-কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কখনো কামড়ায় না ? দেয়ালে বসা চোরের বাস্তব উত্তরঃ কথাটা আমি জানি, তুমি জানো—দুনিয়া শুদ্ধ সকলে জানে, কিন্তু ঐ দুটো কুকুর কি সে প্রবাদ জানে ?

লোকটি শেষ পর্যন্ত ধরাই বোধহয় পড়ে গেল, কেননা, সে নিশ্চয় তখন প্রবাদের চেয়ে কুকুরের ঘেউ ঘেউকেই সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছে। তাহলেও আমার সম্পূর্ণ সমর্থন ঐ দ্বিতীয় চোরের প্রতি, তা আপনারা যে যাই বলুন।

চোর নিয়ে যখন কথাটা উঠলই তখন এই সঙ্গে আরও একটা প্রবাদ হাজির করি। এটা হল 'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। প্রবাদে চোর হঠাৎ চোরা কেন হয় এটা একটা রহস্য, এ রহস্য-ভেদ করা আমার সাধ্য নয়। যাই হোক কথাটা সম্পূর্ণ ভুল যে তাতে সন্দেহ নেই। রোজই রেডিওতে ধর্মকাহিনী শোনানো হয়—কিন্তু আমি কখনই একটি চোরকেও ঠিক সেই সময় রেডিও বন্ধ করতে দেখিনি। অর্থাৎ, আমার বক্তব্য, চোরেরা ধর্মকাহিনী শোনে। চোর জুয়াচোর অচোর অজুয়াচোর সবাইকে শুনতে হয় ধর্মের কাহিনী। এমনকি চোরা কারবারীরাও ধর্মকাহিনী শোনে। তাহলে এই মিথ্যে প্রবাদ কেন কষ্ট করে লোকে শেখে, আর কেনই বা বলে ?

যাক্ আর প্রবাদ নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ করতে চাই না !



নতুন কথা

আঠা মাখানো কাগজে যেমন মাছিরা এসে আটকে যায়, লেপটে থাকে, আর ক্রমাগত মৃত মাছির সংখ্যা বাড়তে থাকে কথারাও তেমনি। কোথা থেকে কথারা জন্মায় সহজে তা ধরা পড়ে না। তবে অনেক সময়েই তা আমাদের মনে এবং জিভে আটকে যায়। সর্বদা তারা মাছির মত মরে যে তাও নয়। অনেক কথাই বেঁচে থাকে। বছর কুড়ি আগে কলকাতায় ঘেরাও কথাটা খুব চালু হয়ে যায়। তখন মনে হত কথাটা বুঝি নতুন কেউ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু হঠাৎ একদিন বঙ্কিমচন্দ্র পড়তে গিয়ে দেখি, ঘেরাও কথাটা তাঁর সময়ে প্রচলিত ছিল। হয়ত তার আগেও ছিল। কথাটা ছিলই, কিন্তু অব্যবহারে মরচে ধরে গিয়েছিল এবং আমার মত অনেকেই হয়ত কথাটির আবির্ভাব দেখে মনে করেছিলেন ওটি নতুন কথা। ঘেরাও কথা ছাড়াও অনেক কথা আছে যা আগে ছিল পরে লুপ্ত হয়ে গিয়ে আবার দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে একটির কথা বলা যায় সেটি হল আকাশবাণী। কথাটা ভারতচন্দ্রও ব্যবহার করেছিলেন, অবশ্যই অন্য অর্থে। দৈববাণী অর্থেই আকাশবাণী কথাটা ব্যবহৃত হত সে-কালে।

কিন্তু এবারে আমি যে কথাগুলির বিষয়ে বলব সেগুলি আগে ছিল না, এখন আমাদের মধ্যে এসে জায়গা করে নিয়েছে। কতকগুলি কথা ছিল, কিন্তু বাঙলায় ছিল না, যেমন কিলোগ্রাম, কিলোমিটার ইত্যাদি। এগুলির অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু ১৯৫৭-র আগে ক-জনই বা এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন? এবং একবার সরকারিভাবে দশমিক প্রথা চালু হওয়ার পর টাকা আধুলি সিকি আনির সঙ্গে টাকা ঠিক থাকলেও পয়সার (তখন নয়াপয়সা) সঙ্গে পুরনোদের রীতিমতো সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত পুরনো হিসেব-টিসেব সব হেরে গেল। সের, ছটাক, কাচ্চা উঠে গেল। কিন্তু তার রেশ এখনও রয়ে

গিয়েছে। যেমন রয়ে গিয়েছে 'টাকা-কড়ি'। এখনও কেউ কেউ পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রাকে আধুলি বলেন, পঁচিশ পয়সার মুদ্রাকে বলেন সিকি! তবু বোধহয় এগুলো তেমন মারাত্মক নয়, কেননা এক টাকার অর্ধেক, এক টাকার চার ভাগের এক ভাগ এখনও একই রয়েছে তো! অসুবিধে হয় যে কথাগুলোর মরা উচিত তবু মরে না, যেমন দশ আনা-ছ আনা! এই কথাটি বা এই ধরনের কথা এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়ায় আমাদের মধ্যে। কথার ভূত যদি কেউ থাকে, তাহলে এই কথাটিকে ভূতও বোধ হয় বলা যায়!

যাই হক, গত প্রায় পঞ্চাশ বছরে কলকাতায় যে সব কথা তৈরি হয়েছে, তার সব হিসেব নিশ্চয়ই কেউ করছেন। না করলেও কেউ না কেউ করবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে আমি যে সব কথা শুনতে পেয়েছি এবং যেগুলো কখনও আমি নিজে ব্যবহার করেছি, আর যেগুলো মোটামুটি মনে আছে তা থেকে কয়েকটি আপনাদের জানাই। এগুলির মধ্যে সময়ের পরম্পরা সর্বদা থাকবে এমন কোনও কথা নেই, যেটি যেরকম মনে আসছে সেটি সেই সময়েই বলছি। এরই মধ্যে পরিচয় পাওয়া যাবে নতুন জিনিসের আমদানি, নতুন সমাজের বৈচিত্র্য, নতুন সম্পর্কের আভাস। যেমন ধরুন বিদ্যুৎ-বিপর্যয় কথাটি। এটি আমাদের এখন ঘরোয়া কথা। যেমন ঘরোয়া কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বন্‌ধ, আংশিক বন্‌ধ, আঞ্চলিক বন্‌ধ, বাঙলা বন্‌ধ, রেল-রোকো, রাস্তা রোকো, ভারত বন্‌ধ। ঘরোয়া কথা কালো বাজার, (যা থেকে কালো বাজারি), চোরা-চালানি, পাচারকারী। দু-নম্বরি, চারশো বিশ। গণধোলাই, বহিরাগত (বিশেষ অর্থে), এমপ্লমেণ্ট এক্সচেঞ্জ, মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র্য সীমা। আর বিদ্যুতেরও কত ভাগ, জল বিদ্যুৎ পরমাণু বিদ্যুৎ, তাপ-বিদ্যুৎ, কৃষি বিদ্যুৎ, গ্রামীণ বিদ্যুৎ, লোড-শেডিং।

আমরা জানতে পেরেছি নতুন এক জাতের খবর—প্রান্তিক চাষী, রেফুজি —সেই থেকে রেফুজি কলোনি, জবর-দখল কলোনি, উদ্বাস্তু, শরণার্থী, ছিন্নমূল, গণ-অবস্থান, বিচ্ছিন্নতাবাদী, মিনি-বাস, সেলামি, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যপাল, পূর্ণমন্ত্রী, বিধায়ক, সংসদ সদস্য, গণ-টোকাটুকি, উচ্ছেদ, ছাঁটাই, ক্লোজার, উপদলীয় কোঁদল, অনাবাসিক ভারতীয়। খবর পাচ্ছি গোবর গ্যাসের, সৌরচুল্লির, আর চামচার।

ভয়ানক কথাই বেশি। গণশত্রু, খতম অভিযান, মুক্তাঞ্চল, দলীয় সংঘর্ষ, সীমান্ত সংঘর্ষ, গেরিলাবাহিনী, পাইপ-গান, শিবির, মেরুকরণ, নিষেধাজ্ঞা, পরিবেশ দূষণ, সংশোধনবাদী। এর পর পাচ্ছি গণ-অনশন, নিষ্প্রদীপ, মহড়া, মগজ-ধোলাই, বুথ-দখল, রিগিং, উগ্রপন্থী, আতঙ্কবাদী, কট্টর চরমপন্থী, সন্ত্রাসবাদী, বধূ-হত্যা, সংরক্ষিত আসন (কেবল ট্রেন বা বিমানে নয়!) ছিনতাই, কেপমারি, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, মারকে-লেঙ্গে, রেশন, রেশনের লাইন, তা থেকে লাইন কথাটা অন্যত্রও যেমন অমুক নেতার কাছে লাইন দিয়েছেন কোনও ব্যক্তি। এ ছাড়া ভয়ানক কথার মধ্যে রয়েছে সমাজ-বিরোধী, ওয়াগন ব্রেকার, পরিবেশ দূষণ, ইত্যাদি।

কোনটাতে সময়ের ছাপ স্পষ্ট, যেমন ব্যাফল-ওয়াল, এ আর পি, সিভিক গার্ড, লঙ্গরখানা, ক্যানটিন (যুদ্ধের সময়কার কথা, পরেও থেকে গেছে), জয়-বাংলা (এর আবার দুটি অর্থ, প্রথম অর্থটি বলার দরকার নেই, দ্বিতীয় অর্থটি হঠাৎ ব্যাপকভাবে চালু হওয়া চোখের অসুখ কনজাংটিভাইটিস যখন হঠাৎ দেখা দিয়েছিল বাঙলা দেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। এটা আমাদের এক অপূর্ব রসিকতা !)

সর্বদা যে খারাপ কথাই আমার মনে রয়ে গেছে তা নয়। অনেক ভাল, মাঝারি এবং নিরপেক্ষ কথাও এর মধ্যে কি আর তৈরি হয়নি ? যেমন তৈরি হয়েছে উড়াল পুল, পাতাল রেল, টেলি-যোগাযোগ, লোন-মেলা, বই-মেলা, পরিবার-পরিকল্পনা, কেটারার, সবুজ-বিপ্লব, অধিক ফলনশীল, হিম-ঘর, টেপ-রেকর্ডার, বেতার, টি-ভি, ভিডিও, ক্যালকুলেটর, গ্যাস-ওভেন, গ্যাস-সিলিন্ডার, রাজ্য-পরিবহণ, রাজ্য-লটারী, কোল-ব্রিকেট, অ্যান্টেনা, রাষ্ট্রপুঞ্জ, অ্যালার্জি, সাইকেল-রিকশো, বামফ্রন্ট, জোট-নিরপেক্ষ, নির্দলীয়, লিটার, স্টেইনলেস্ স্টিল, হার্ট-ট্রান্সপ্ল্যান্ট, ট্রিপল অ্যান্টিজেন, মহাকাশ, নভঃশ্চর, বনমহোৎসব, অভয়ারণ্য, জগিং চলছে চলবে। সংগ্রহ করেছি ট্রানজিস্টার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ছাঁটাই, স্কুটার, মোপেড, টেম্পো, তেলাপিয়া, আমেরিকান কই, বাটার অয়েল, চিজ, নুডল, পাউডার-মিল্ক (বা গুঁড়ো দুধ), উপগ্রহ, প্রকল্প, বাতানুকুল, ক্যাডার, প্রেশার-কুকার, ড্রাগ, এল এস ডি, 'নাইট' (যেমন কিশোরকুমার নাইট), হেভি (প্রচুর অর্থে) গুরু (ব্যঙ্গার্থে), পশ্চিমবঙ্গ, পাম অয়েল, রেপ-সীড, ফাস্ট ফুড ইত্যাদি।

নতুন কথার মধ্যে রয়েছে সামিল, চ্যানেল, ঘ্যাম (দারুণ অর্থে), প্রজাতন্ত্র, কালো-হাত, হিসেব অসংখ্য। নতুন কথা রম্য-রচনাও এখন মোটামুটি অভ্যেসের মধ্যেই এসে গেছে। নতুন কথা আরও নিশ্চয় হাজারখানেকের বেশি হবে যেগুলি আমার এখনই মনে পড়ছে না। স্ল্যাং তো অঞ্চলে অঞ্চলে এক-এক রকম। এর মধ্যে পেটো, ঢুল্‌সু এ-সব হয়ত সর্বব্যাপী। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কথা চালু হয়ে যায়, সেগুলির মধ্যে গেলাম না, তবে এটা বলে এই রচনা শেষ করতে পারি যে নতুন কথা না হলে ভাষা এগোয় না।



মুদ্রাদোষীর কার্যকলাপ

যাঁরা টাঁকশালে মুদ্রা তৈরি করেন তাঁদের মুদ্রাকর বলা যায় না তা নয়, কিন্তু বলা হয় না। মুদ্রাকর বলতে আমরা অন্য রকম বুঝি। তেমনি টাকশালে মুদ্রা তৈরি করার সময় ত্রুটিপূর্ণ যে সব মুদ্রা তৈরি হয়ে যায় সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ভাবেই, সেইগুলিকেও মুদ্রাদোষ বলা যায়, কিন্তু বলা হয় না। আজ যে মুদ্রাদোষের বা মুদ্রাদোষীর কথা বলা হচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার—এটি অবশ্য সকলেরই জানা আছে যে এর অর্থ হল কথা বলার সময় একই শব্দ বা একাধিক শব্দ বিনা প্রয়োজনে এবং বারবার ব্যবহার করলে তখনই বলা হয় মুদ্রাদোষ। তবে এর সঙ্গে আরও একটা শর্ত থাকা দরকার, বক্তা এই একই শব্দ উচ্চারণ চেষ্টা করেও বন্ধ করতে পারেন না। এটা যে একটা ত্রুটি সেটা বক্তা বুঝতেই পারেন না, এবং অনেক সময় তিনি যে সেটা বলছেন সেটাও তিনি খেয়াল করতে পারেন না। এ ব্যাপারে বহু বছর আগে, গত মহাযুদ্ধের সময় বেতারে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে গিয়েছিলাম। তখন আমরা স্কুলে পড়ি। চারটি স্কুলের মধ্যে যুদ্ধ উপকারী না অনুপকারী এই নিয়ে হল বিতর্ক। তখন ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। তিনি বিতর্ক কিভাবে হবে কে শুরু করে কি বলবে, তার উত্তরে অন্যে কি বলবে, এইরকম শেখাচ্ছিলেন, কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন কথা বলার সময় কিছুতেই 'এই আর কি' কথাটা অকারণ জুড়ে দিচ্ছিল।

এই ত্রুটি তার আছে তা জানা সত্ত্বেও তার স্কুল থেকে তাকে কেন পাঠিয়েছিল কে জানে। কিন্তু মিনিট দশেক নানাভাবে বোঝানর পরও সে তার গোঁ ছাড়ল না। সে কথার মধ্যে বলতেই থাকল, এই আর কি! বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তখন খুব বিরক্ত হয়েছেন বোঝা গেল। তিনি বললেন, মহা মুশকিল তো হল তোমাকে নিয়ে—শোনো কি হয়েছিল একবার। এক ছাত্র মাস্টারমশাইয়ের কাছে বসেছে, আর বলছে খ্যাঁশকেয়াল। খ্যাঁশকেয়াল? মাস্টারমশাই

চমকে গেলেন, বললেন, হ্যাঁরে, খ্যাঁশ কেয়াল নয় রে, হবে খ্যাঁকশেয়াল। খ্যাঁকশেয়াল কথাটা বলা শিখিসনি? ছেলেটি বলল, শিখেছি তো, বলতেও পারি, শুনবেন? বলে সে ঠিকই বলল খ্যাঁকশেয়াল, কিন্তু পড়তে গিয়েই আবার শোনা গেল সে বলছে খ্যাঁশকেয়াল। ছেলেটি বলল, আমি অন্যমনস্কভাবে পড়তে গেলেই মুখ দিয়ে খাঁশকেয়াল বেরিয়ে পড়ে। মাস্টারমশাই তো এক মাস ধরে তাকে খ্যাঁকশেয়াল শেখালেন, কিন্তু মুশকিল বাধল ফক্স্ কথাটি নিয়ে। খ্যাঁকশেয়ালের ইংরেজী কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ছাত্রটি বলল, ফস্ক স্যার। মাস্টারমশাই বললেন, ফস্ক না ফক্স? ছাত্রটি বলল, ফক্স। তাহলে ফস্ক বলছ কেন? ছাত্রটির অম্লান-বদন জবাব, মুখ ফস্কে স্যার!

গল্পটি তখনও শেষ হয়নি। মাস্টারমশাই ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলেছেন। এক মাস ধরে তিনি তাকে শেখালেন ফক্স। ছাত্রটি দুটো কথাই বলতে শিখল ঠিক উচ্চারণে, কিন্তু যখনই ফক্স মানে খ্যাঁকশেয়াল বলতে যায় তখনই বলতে থাকে ফস্ক মানে খ্যাঁশকেয়াল। কিংবা যদি বা ফস্ক না বলে ফক্স বলে কিন্তু খ্যাঁশকেয়াল কথাটি ছাড়তে পারে না। আবার খ্যাঁকশেয়াল যদি ঠিক বলে তবে ফস্ক আবার তার মুখে এসে জুটে যায়।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র শেষ পর্যন্ত ঐ ছেলেটিকে আর বলতে দেননি। একটি স্কুল ঐ বিতর্ক থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল, তাতে অবশ্য জগতের ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছু হয়নি। এই যে ব্যাপারটি এতক্ষণ বললাম আসলে একেই বলে মুদ্রাদোষ। একটি অভিধানে দেখছি, মুদ্রাদোষ অর্থে বলা হয়েছে স্বভাবগত হস্তমুখাদি অঙ্গভঙ্গি। যে অর্থের কথা আগে বলেছি সেটাও আছে যেমন অযথা একই কথা বারবার বলা। কিংবা কোনও বিশেষ কথার বিকৃত উচ্চারণ করা—যেটার সঠিক উচ্চারণ করা বক্তার পক্ষে সম্ভব। কোনও লোকের থাকে একটি দোষ, তিনি হয় তো হাত পা নাড়েন অযথা, কেউ আবার কথায় দেখান তাঁর মুদ্রাদোষ, সুখের কথা, পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এই রকম দোষ থেকে মুক্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এঁদের দেখাও যে মেলে না তা নয়। তখন এঁরা হাস্যকর ব্যক্তিতে পরিণত হন। এঁদের বাচনভঙ্গি দেখে বা বচন শুনে অনেকে হাসলেও তাঁদের জীবনে, তাঁরা এক ধরনের প্রতিবন্ধী। আমাদের এক বন্ধু কথায় কথায় 'শালা' বা 'শালার' কথাটি ব্যবহার করেন, সেটি বন্ধু মহলে তেমন মারাত্মক নয়, কিন্তু তাঁর গুরুজনদের কাছে বেশ ঝামেলার ব্যাপার। আমরা জানি তিনি তাঁর শ্বশুরকে একদিন বলেছিলেন, "আপনি শালা একটু অপেক্ষা করুন, আমি শালা একটু পরেই আসছি।" শ্বশুর ব্যাপারটা জানতেন বলেই হৈ-হল্লা বা কেলেঙ্কারি হয়নি, কিন্তু চাকরির জন্য সাক্ষাৎকার করার সময় বহু জায়গায় তাঁর যোগ্যতা সত্ত্বেও তাঁর চাকরি হয়নি। একজন সাক্ষাৎকারী তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি বর্তমানে কোথাও কাজ করছেন কি? এর উত্তরে তিনি যদি কেবল বলতেন 'না'। তাহলেই চুকে যেত, কিন্তু তিনি বলেছিলেন, না শালা, আমার শালা সে শালার সৌভাগ্য হয়নি! শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি ইংরেজী শিখেছিলেন একজন শিক্ষক রেখে, কথ্য

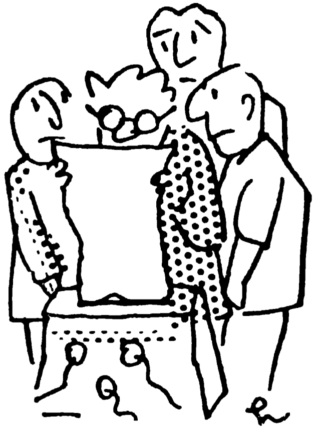
ইংরেজী। এখন আমার বন্ধুটি বেশ বড় চাকুরে, বোম্বাইতে থাকেন—বাংলা কথার দরকারই হয় না, কিন্তু এই প্রায় চল্লিশ বছর পরও সেদিন কলকাতায় এলেন, এবং দেখলাম তিনি তাঁর কথায় শালা ছাড়তে পারেননি এখনও। তিনি আরও একটা আ চর্য কথা বললেন, তিনি যখন বোম্বাইতে থাকেন তখনও কিন্তু বাংলা কথা বলার সময় শালা ব্যবহার করেন না। "এই হাওড়াতে নেমেই আমার কথার মধ্যে আবার শালা এসে জোটে!" কেউ কেউ কথার মধ্যে 'আপনার' কথাটি বসিয়ে দেন। এতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমনঃ "আর বলবেন না আপনার মশাই, আপনার স্ত্রীর ঘাড়ের ফোঁড়া নিয়ে আপনার আমরা বেশ কষ্টে রয়েছি। আপনার ডাক্তার আপনার স্ত্রীকে দুটো ওষুধ দিয়েছেন কিন্তু আপনার স্ত্রীর কিছু হচ্ছে না।"

এসব কেন হয় কী বৃত্তান্ত তা আমার জানা নেই, তবে এই ধরনের অভ্যেস না ছাড়লে অনেক অসুবিধে হয় ঠিকই। ভাল ভাল পেশা থেকে এই সমস্ত ব্যক্তিদের সরে যেতে হয়। একজন কথার মধ্যে কেবলই 'কি যেন গিয়ে' কথাটির মিশেল দিতেন। আচ্ছা, এই লোকটির পক্ষে উকিল হওয়া কি সম্ভব? তিনি কি বলতে পারবেন, এবং বিচারপতি বা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রভাবিত করতে পারবেন এই ধরনের কথা বলেঃ "হুজুর কি-যেন গিয়ে আমার মক্কেল কি-যেন গিয়ে উনিশ মিনিটের সময় এক আচমকা কি-যেন গিয়ে আওয়াজে কি-যেন গিয়ে এক দারুণ কি-যেন আওয়াজে···।" কিংবা "হুজুর, বাঁই বাঁই শব্দে (এও এক চরিত্রের মুদ্রাদোষ, সম্ভবত এটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও বইতে পড়েছি, তবে ভুলও হতে পারে) আমার মক্কেল বাঁই-বাঁই শব্দে গত আঠারই অক্টোবর বাঁই বাঁই শব্দে"···ইত্যাদি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ববঙ্গীয় এক চরিত্র ইসে কথাটার খুব ভক্ত ছিল। অবশ্য এই সব ব্যাপারের সঙ্গে ভঙ্গি কথাটা বোধ হয় যোগ করা ঠিক হবে না। এটা এক ধরনের মানসিক অপ্রতুলতা হওয়ারই বেশি সম্ভাবনা। তবে অনেকে এও বলেন যে ভক্তিও এক ধরনের মানসিক রোগ বা অপ্রতুলতা যাই বলুন। তা এই ধরনের লোকেদের জ্ঞান, বিদ্যে বা বুদ্ধির অভাব নেই, কেবল কথা বলার সময় এলেই বিপদ। ধরা যাক একজন নেতা হতে চান। এই ধরনের লোকেদের পক্ষে শিক্ষক হওয়া কঠিন, কঠিন রাজনৈতিক নেতা হওয়াও! নেতা বক্তৃতা দিতে গেছেন মঞ্চে। এঁর অভ্যেস 'যাচ্ছে তাই' বলা, কারণে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনে। তিনি বলতে উঠলেন, "ভাইসব, এই যাচ্ছেতাই দেশে যে যাচ্ছেতাই ব্যাপার চলছে সেটা খুব যাচ্ছেতাই। আমাদের যাচ্ছেতাই মহান নেতা যাচ্ছেতাই শ্রী অমুক একটু আগে আপনাদের কাছে যাচ্ছেতাই বললেন, তার যাচ্ছেতাই মর্মকথাটি হল···।"

চলবে না। ডাক্তারও হওয়া চলবে না। প্রমাণঃ "আপনার যাচ্ছেতাই স্ত্রীকে তাঁর যাচ্ছেতাই অসুখের জন্য দু-শিশি যাচ্ছেতাই ওষুধ দিলাম···।" এছাড়া মায়ের কৃপায় বা ঠাকুরের দয়ায় কথাগুলিও লোকে এমন ঘন ঘন ব্যবহার করেন যে সেগুলিকেও প্রায় মুদ্রাদোষই বলা যায়। কথা বলা যে

পেশায় আবশ্যিক সে-সব পেশায় মুদ্রা-দোষীদের ভাল করার কথা নয়। তোতলা মানুষদেরও ঐ একই বিপদ, যদিও তার বোধ হয় কেবল মনস্তাত্ত্বিক ছাড়াও অন্য কারণ থাকে। এঁদের কথার যে দোষ সেটা আভিধানিক অর্থে মুদ্রাদোষযুক্ত, বা সংক্ষেপে মুদ্রাদোষও বলা যায়, কিন্তু সংকীর্ণ অর্থে নয়। আমরা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করছি—কিন্তু কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করলে আর পৃথিবীতে কেউ এই দোষ থেকে মুক্ত হবেন না। কেননা, মুদ্রা অর্থে যা হয় তার মধ্যে রয়েছে ১। গীতবাদ্যের কালে দেবতার প্রীতার্থে করাঙ্গুলি রচনাবিশেষ, ২। অঙ্গুলিন্যাস, ৩। অভয়, আবাহনী স্থাপনী, বর, অংকুশ, ধেনু, শাঙ্খ, চক্র, ত্রিশূল, বিম্ব, গদা, পরশু ··। তৃতীয় তালিকায় যে মুদ্রা দেওয়া আছে এছাড়াও মুদ্রা আছে অনেক রকম, সব মুদ্রা তালিকায় দেওয়া নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকটি মুদ্রার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করি, এগুলি অবশ্য দোষযুক্ত হলে চলবে না। এই মুদ্রাগুলি হল এক টাকার মুদ্রা (মাসে হাজার তিনেকের অভাব), এবং গিনি (এটি বছরে শ খানেক হলেই চলবে, তখন এক টাকার মুদ্রার একটিও দরকার হবে না)। কিংবা সবচেয়ে ভাল হয় মাত্র একটি স্বর্ণমুদ্রা, জাহাঙ্গীরের আমলের—এরকম একটি নাকি সম্প্রতি সুইজারল্যাণ্ডে বিক্রি হয়েছে প্রায় ১০ কোটি টাকায়।



সাব এডিটরদের ঠেকানো শক্ত !

সঠিক ভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না—এখনো যায়নি, মোটামুটি একটা উপায়ে কাজ চালিয়ে নিই, নিতে হয়। কথা, একজন সাহিত্যিক বলেছিলেন, মনের ভাবকে গোপন করতে সাহায্য করে, প্রকাশ করতে নয়। ভাষায় আমরা অনেক কিছুই প্রকাশ করতে পারি না—করতে কষ্ট হয়। আমাদের পায়ে ফোড়া হলে বলি ভয়ানক কষ্ট, মাথা ধরলে বলি ভয়ানক কষ্ট, জ্বর হলে বলি ভয়ানক কষ্ট—ভীড় বাসে আমরা ভয়ানক কষ্ট পাই, আছাড় খেলে ভয়ানক লাগে, বিদ্যুতের শক আচমকা খেলেও ভয়ানক কষ্ট পাই। ভয়ানকের বদলে দারুণ, কিংবা সাংঘাতিক কথাটা বসিয়ে দিই নতুনত্বের জন্য, একঘেয়েমিকে দূর করার জন্য, কিন্তু তাতে ভাব প্রকাশের বিশেষ হেরফের হয় না। সমস্ত জিনিসই যদি ভয়ানক হয় তাহলে মুসকিলে পড়তেই হয়। তাই ভয়াদক শুনলেই সবটা বোঝা যায় না। তখন সত্যিকারের কথাটা কেউ যোগ করেন ভয়ানক যে সত্যিই ভয়ানক তা বোঝানর জন্য। সত্যিকরের ভয়ানক কাণ্ড—ডাকাতরা একজন লোককে লাঠি দিয়ে আঘাত করে পালিয়ে গেছে। অথচ ডাকাতরা যদি লাঠি দিয়ে পিটিয়ে দুশো লোককে মারত তাহলেও আমরা ঐ সত্যিকারের ভয়ানক কথাটা ছাড়া আর কিছু কি ব্যবহার করতে পারতাম ? নারকীয় কথাটা হয়ত চালান যেত। কিন্তু নারকীয় বলতেই বা কি বোঝায় ? দুশো লোককে ডাকাতরা পিটিয়ে মারলে যদি নারকীয় হয়, তাহলে জালিয়ান-ওয়ালবাগের গুলিচালনাকে কি বলা যাবে ? অতি নারকীয় ? অথবা দুম করে হিরোসিমার উপর বোমা ফেলে কয়েক সেকেণ্ডে লক্ষাধিক লোককে মেরে ফেললেই বা কি ভাবে সেই নারকীয়ত্ব বোঝানো যাবে ? কিংবা যখন শুনি জারমানির আইখমানের তত্ত্বাবধানে ষাটলক্ষের বেশি ইহুদীকে মেরে ফেলা হল

সেটাকে কি ভাবে বর্ণনা দেওয়া যাবে ? পৈশাচিক ? কিন্তু তাহলে ইয়াহিয়া খানের বাংলাদেশের উপর অত্যাচারকে কি বলা যাবে কম পৈশাচিক, কেননা আইখমানের চাইতে ইয়াহিয়া লোক মেরেছিল কম ?

আমরা খবরের কাগজে তাড়াতাড়ি অনেক মানবিক ঘটনা সম্পর্কে চটপট একটা বিশেষণ বসিয়ে দিই—যা মনে আসে তাই, কেননা কয়েকটির বেশি কথা আমাদের হাতে থাকে না। 'ভয়াবহ' 'বীভৎস', 'নারকীয়' 'নিষ্ঠুর' ভয়ানক' ইত্যাদি কতকগুলি কথা দিয়েই আমরা পৃথিবীর নানাবিধ দুর্ঘনার খবর লিখে জানাই। হত্যাকাণ্ড হলে আমরা লিখি 'বীভৎস' 'নিষ্ঠুর' কিংবা ঐরকমই কিছু। কখনো আবার অক্ষর গুণে লিখতে হলে যোগ করি 'জঘন্য'। কেবল হত্যাকাণ্ড, বা হত্যা কথাটায় যেন সব ভাব প্রকাশ হয় না, তাই আমাদের চেষ্টা থাকে আর একটু খোলসা করে বলি। কিন্তু যাই বলি তাই মনে হয় ঠিক হল না। তখন টাইপ বদলাই। ছোট টাইপের জায়গায় বড় টাইপ ব্যবহার করি। বন্যায় ১০ হাজার লোক গৃহহীন হলে যে টাইপ ব্যবহার করি, বন্যায় ১০ লক্ষ লোক গৃহহীন হলে আমরা একশো গুণ বড় টাইপে হেডলাইন দিতে পারি না। তাই সেখানেও আমাদের একটা মাত্রার মধ্যে কাজ করতে হয়। অর্থাৎ আস্তে না বলে, চেঁচিয়ে বলার চেষ্টা করি, কিন্তু খবরের কাগজের টাইপও আমাদের চিৎকার করার ক্ষমতার মতই সীমাবদ্ধ।

তাই, বলা যায়, আমাদের ভাষা আমাদের মনের সমস্ত ভাব ঠিকমত প্রকাশ করতে পারে না। কতকগুলি কথা, বা কথার সমষ্টি দিয়ে আমরা কাজ চালাই, যদিও অভিধানে প্রতিদিন নতুন নতুন বহু কথা যোগ হচ্ছে। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই বিজ্ঞানের প্রয়োজনে সৃষ্টি করে নেওয়া হচ্ছে। সে কথাগুলির প্রয়োগ বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। মানুষের ভাব প্রকাশের ভাষা প্রয়োজনানুযায়ী বাড়ে না। একটি বিলিতি গল্পে পড়েছিলাম একজন এই অসুবিধে দূর করার জন্য একশোকে সর্বোচ্চ সংখ্যা ধরে নিয়েছেন। অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি দুঃখ ১০০, সবচেয়ে বেশি আনন্দ ১০০। তাহলে একজন এইভাবে কথা বলতে পারবে, আর ভাই বলো কেন, রাস্তায় অখিলের সঙ্গে দেখা, তার মুখ ২১ শুকনো, ৪৪ চিন্তিত। ২২ গতিতে হাঁটছে। আমি ২৫ গতিতে পা চালিয়ে তাকে ধরে ফেললাম। সে আমাকে দেখে ১০০ না চেনার ভান করল। আমি তার পিঠে ১২ চাপড়ালাম, সে এবারে ২ হাসল, মনে হয় সে আমাকে ১১ চিনেছে, বা ১২ চিনেছে।

কিন্তু মানুষ অত সহজ বস্তু নয়, কমপিউটারও নয়। মানুষ যেহেতু মানুষ সেহেতু এখানেও নানাবিধ ফাঁকিবাজী চলবে। মানুষ এখনো লেখে, আমার শতকোটি প্রণাম জানবেন, বলেও। কিন্তু শতকোটি প্রণাম করা সম্ভব নয়। কেউ আবার লেখেন লক্ষ কোটি। শতকোটি প্রণাম করা কেন সম্ভব নয় তার একটা হিসেব দিচ্ছি। আমি ঘড়ি ধরে দেখেছি, একটি যেন তেন প্রণাম করতে পাঁচ সেকেণ্ড সময় প্রয়োজন। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় নত হয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে দুহাত দিয়ে দুটি পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়ানো এর

চেয়ে কম সময়ে করা শক্ত। যাই হ'ক, ধরে নিচ্ছি তা করা সম্ভব—এবং পর পর একশো কোটিবারও তা করা সম্ভব। তাহলে সময় লাগছে ৫০০ কোটি সেকেণ্ড। বছরের হিসেবে ১৫৮ বছর। অর্থাৎ একজন যদি ভূমিষ্ঠ হয়েই প্রণাম করতে সুরু করেন তাহলে একজনকে শতকোটি প্রণাম করতে তাঁর জীবন কাবার হয়ে যাবে—কেবল তাঁর নয়, তাঁর অন্তত সাত পুরুষের জীবন। ইতিমধ্যে প্রণাম যাঁকে করা হচ্ছে তাঁরও কম অসুবিধে হবে না। তাঁকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মরে যেতে হবে। এটা জানা কথা, অত বছর দাঁড়ানও সম্ভব নয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে কথাটি অসম্ভব—যার মূলে কোনরকম বাস্তববোধ নেই। অতএব ১০০-র ব্যাপারেও কারচুপি চলবে, সংখ্যা নিয়ে রাজনৈতিকদের মতই অপব্যবহার চলবে। একজনের ৮ ব্যথা হলে সে বলবে ওঃ আমার ২১ ব্যথা, কিংবা ৫৮ ব্যথা। তাকে তো বলা থেকে ঠেকানো যাবে না। তাই আমরা বন্যায় ১০ জন ডুবে মরলেও লিখব—৮০ বন্যার ফলে মানুষের ৯৯ কষ্ট। আবার খুব স্পর্শকাতর কবি হয়ত লিখবেন, আমি তোমাকে ৬ লাখ ভালবাসি! যদিও জানা আছে ১০০র বেশি কোনরকম সংখ্যাই এই ভাষায় অচল। কিন্তু কবিদের ঠেকায় কে?

কবি, গুণ্ডা, রাজনৈতিকদের ঠেকান ভারি শক্ত ব্যাপার। এর সঙ্গে যোগ করি, সাব-এডিটরদেরই বা ঠেকায় কে? আমরাও আমাদের খুশিমত সাব-হেডিং দিয়ে চলব। ভাব প্রকাশ তাতে হ'ক না হ'ক, তখনকার মত কাজ চলে গেল।

ভাব প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের দৈন্য এতই বেশি যে ঘরে একটা বিষহীন সাপ দেখলে আমরা যে ধরনের চিৎকার করে উঠি দশটা ডাকাত দেখলেও তার চাইতে খুব যে বেশি চিৎকার করে উঠতে পারি তা নয়। আমাদের চিৎকার করার ক্ষমতা অসীম হলেও সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ আমরা বহুক্ষণ ধরে চিৎকার করতে পারলেও চিৎকারের বিকটত্ব খুব বাড়াতে পারি না। তাই আমরা লাউড স্পীকার ব্যবহার করি—কিন্তু ঘরে সাপ কিংবা চোর ঢুকলে লাউডস্পীকার ব্যবহার করা সঙ্গত কারণেই সম্ভব হয় না।

বলবার কথা এই যে, আমরা আদিম মানুষের চাইতে কিঞ্চিৎ বেশি সুখ সুবিধে ভোগ করছি এটা ঠিক—মাঝে মাঝে ট্রামেও উঠছি, টেলিফোনেও কথা বলছি, কিন্তু ভাব প্রকাশের ব্যাপারে খুব একটা এগুতে পারি নি। তাতে অবশ্য অনেক অসুবিধে হচ্ছে। কথা সৃষ্টিও খুব সহজ কর্ম নয়। কোটি কোটি লোক লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমরা মাত্র কয়েক লক্ষ কথা অভিধানে ঢোকাতে পেরেছি। তাও সে সব কথার অধিকাংশই আমরা ব্যবহারই করি না। আমরা নির্ধারণ কথাটা ব্যবহার করি—একটু বেশিমাত্রাতেই করি, স্থিরীকরণও কখনো ব্যবহার করি না এমন নয়, কিন্তু সংখ্যাপন? এই কথাটা আমাদের অভিধানে রাখলেও ব্যবহার আর করা হয় না। মহাপ্রলয় কথাটা আমরা যথেষ্ট ব্যবহার করেছি, কিন্তু সংবর্ত তোলা কথা—সেটা তোলাই থাকে। আমরা ভীত হই, উদ্বিগ্ন হই, কিন্তু সংবিগ্ন হই না। হলে হয়ত ভালই হত। তাই অভিধানের

মধ্যে বহু কথার জন্ম হয় নি, বলা চলে মৃত্যু হয়েছে। তবে এইসব কথা সম্পূর্ণ মৃত নয়—ইচ্ছে করলে এদের বাঁচানো চলতে পারে—কোন কোন কবি তা করেও থাকেন, তাঁদের কবিতাকে অধিকাংশ সময়েই অর্থবহ করতে নয়, দুর্বোধ্য করতে। আমরা সীমিত কথা দিয়েই কাজ চালাই, কেননা, আমাদের স্মৃতিশক্তি সীমিত। সমস্ত কথা আমাদের মনে থাকে না। সাধারণ লোকেদের দেড় হাজারের বেশি শব্দের প্রয়োজনই হয় না। কোন কোন আদিম অধিবাসীদের শব্দসংখ্যা কয়েকশো মাত্র। এই সব কারণে যাঁরা অনেক কথা জানেম, তাঁরাও একটি নতুন, কিংবা অধুনা অব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করতে কুণ্ঠা বোধ করেন। তাই বিড়ালকে মার্জার বলা চললেও বলা হয় না, আমরাও কোন কথা ব্যবহার করার সময়, সবাই বুঝবে তো? এইরকম একটা প্রশ্ন তুলে অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত কথাটা বাদ দিয়ে দিই।

কথা অনেক আছে, কিন্তু কোন কোন কথার আবার নানা অর্থ। বিভিন্ন অর্থের প্রকাশের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা আমাদের পক্ষে উদ্ভাবন করা সম্ভব হয় নি। কথা অবশ্য উদ্ভাবন করা কঠিন—কথা বানাব বল্লেই বানানো যায় না, তবে বানানো যায় না, সেটাও ঠিক নয়। আমাদের সমস্ত কথা কখনো না কখনো কেউ না কেউ বানিয়েছে! তবে কোনটা বানানো যায় আর কোনটা যায় না তা নির্ভর করে লোকেদের উপর। শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন লোকেরাই যে ভাষার রাজত্বে রাজত্ব করেন তা মোটেই নয়—সাধারণ, অর্ধ-শিক্ষিত, ব্যাকরণ, বানান না জানা লোকেরাই ভাষা সৃষ্টি করে থাকে, করে চলে, তাই এক সময় গ্রহণীয় হয়। ভুল কথা পণ্ডিতদের কলম থেকেও বেরোয়। রবীন্দ্রনাথ অশ্রুজল কথাটা বহুবার ব্যবহার করেছেন, একবারও চিন্তা করেন নি তিনি ভুল করছেন তা হতেই পারে না। তাঁর নিশ্চয় মনে হয়েছে, কথাটা ভুল হলেও ব্যবহার করা যায়।

যাই হোক—একই কথার বিভিন্ন অর্থ। পাট কথাটা ধরা যাক। পাট তো আমরা জানি এক রকমের গাছ যা থেকে আঁশ হয়। কাপড় পাট করা হয়। সূর্য পাটে ওঠে। রাজার পাটরাণী থাকে। ইংরিজীতের এই ধরনের কথার বহু নজীর। যেমন জাস্ট। এই কথাটার বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে।

আর অর্থ রয়েছে মানুষের ট্যাঁকেও, শব্দের অর্থের চাইতেও এই অর্থের প্রতি আমাদের উৎসাহ কিঞ্চিৎ যে বেশী তা আর দুবার করে বলার প্রয়োজন হবে না।



শিবরাম

'বঙ্গাব্দ তেরশ দশ প্রাতে রবিবার
সাতাশে অগ্রহায়ণ শিবের কুমার
শিবরাম জনমিল লীলা শঙ্খ বাজাইল
শিবহৃদে উপজিল আনন্দ-অপার ।।'

শিবরামের পিতা, শিবরামের জন্ম তারিখ লিখে রেখেছিলেন ছন্দে, এইভাবে। শিবরামের পিতার এই ঘটনায় 'আনন্দ-অপার' হয়েছিল, তাও তিনি জানিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় কেবল শিবরামের পিতা নয়—বাংলা পড়ুয়াদের অপার-আনন্দ দিতে পেরেছিলেন সেদিনকার সেই শিবরাম। তিনি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন এক রস আমদানি করতে পেরেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনিই পথ দেখিয়েছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তীকালে বাংলা সাহিত্য ছিল অতি গুরু গম্ভীর। হাসির বাষ্প যদি বা ছিল, তাও নিতান্তই মাপা ধরনের। তাতে পেটও ভরত না, মনও নয়। শিবরাম চক্রবর্তী হাসির ব্যাপারে কৃপণতার ধার দিয়েও গেলেন না। একেবারে হাসির বস্তা নিয়ে আসরে বসে গেলেন, সে আসর চলল দিনের পর দিন বছরের পর বছর ধরে। পঞ্চাশ বছরের ওপর ছিল তাঁর রচনাকাল। শিবরাম-পূর্ববর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যে হাসির ধারা ছিল ক্ষীণ—হাসির গল্পের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ ছিল গোপাল ভাঁড়ের গ্রাম্য রসিকতার কিছু ছিটে ফোঁটা। গ্রাম্য রসিকতা খারাপ নয়, কিন্তু গ্রাম্যতা-দুষ্ট রসিকতা নিতান্তই বদ। তাতে যে হাসির উৎপাদন হয় তা নিতান্ত শস্তা—যা অনেক সময়েই ভদ্র সমাজে দেওয়ার উপযুক্ত ছিল না। সমস্ত বাংলা সাহিত্যই ছিল হাস্যরসে দুর্বল। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার, কেদারনাথ প্রমুখ কয়েকজন সরস কথা, গল্প লিখেছিলেন—হিউমারের ধারা তাঁদের বহু লেখাতেই পাওয়া যায়—কিন্তু

তাঁরা কেউই হিউমার স্পেশ্যালিস্ট ছিলেন না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে শিবরামই দ্বিতীয় হিউমার-স্পেশালিস্ট। সুকুমার রায় ছিলেন প্রথম। তবে দু-জনের হিউমারের ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাঁচের। তাঁদের বাহনও আলাদা—একজন প্রধানত ছন্দে এবং দ্বিতীয় জন প্রায় সবখানিই গদ্যে লিখেছেন।

শিবরাম চক্রবর্তীর হিউমার ছিল অসাধারণ শহুরে। ছোটদের এবং বড়দের তিনি ছিলেন সমান প্রিয়। তাঁর হিউমার বা হাস্যরসের প্রাণ ছিল পান। পান কথাটা ইংরিজী। ওর সহজ বাংলা কিছু হয় না। একই কথাকে নানা অর্থে ব্যবহার করা, নানাভাবে খেলানোর ব্যাপারে তাঁর কলাকৌশলের তুলনা একমাত্র তিনিই। কথায় কথায় গান করা ছিল তাঁর সময়কার আরও একজনের বিশেষত্ব। ইনিও যথেষ্ট বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর নাম ছিল শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, দা-ঠাকুর নামেই যিনি ছিলেন বিশেষ ভাবে পরিচিত। তবে দা-ঠাকুর বলতেন, বিশেষ লিখে যান নি। শিবরামের পান ছিল সর্বসময়ের সঙ্গী। কথায় ত বটেই, কাগজে কলমেও তাঁর পান-প্রবাহ ছিল অতি অনায়াস। বলা যায়, পান ছিল তাঁর লেখার প্রাণ।

একদা শিবরাম আমাকে বলেছিলেন, আমার লেখার তো কোনো মূল্য নেই। ঐ একই ধরনের কয়েকটা কথা বলি, কথা নিয়ে খেলি—ছেলেরা তাতেই খুসি হয়। ছেলেদের খুসি করা খুব সোজা। বলতেন, আর দুষ্টুমির হাসি হাসতেন। কিন্তু ছেলেদের খুসি করা আমাদের এই বাংলাদেশের সহস্র সহস্র লেখক, কবিদের ক জনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে? আসলে তিনি ছিলেন খোলা-মেলা মানুষ। অহম্ ভাব ছিল কম। শিবের মতই তিনি ছিলেন অল্পে তুষ্ট। জীবনে তিনি কি পাননি তার হিসেব বিশেষ করেননি। জাগতিক সুখকে দূর থেকেই সালাম জানিয়েছেন। তাঁর বই-এর সংখ্যা ছিল অনেক। কোথাও লেখা দেখি 'শতাধিক'—কেউ লিখেছেন দু শ। মোটামুটি শ দেড়েক বই এবং একাধিক সংস্করণের কথা ধরলে তাঁর বেশ সচ্ছলভাবেই চলবার কথা। কিন্তু টাকা তিনি খুব পেয়েছেন বলে মনে হয় না। একদা আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতার আলোয় তাঁকে বলেছিলাম, আপনাকে নিশ্চয় প্রকাশকেরা খুব ফাঁকি দেয়? প্রকাশকেরা দেবে আমায় ফাঁকি? স্বভাবসিদ্ধ সহাস্য মুখে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমিই কি কম ফাঁকি দিয়েছি ওদের? একই গল্প কত যে বইয়ে ঢুকিয়ে দিয়েছি তার হিসেব নেই যে!

মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগেও তিনি বলেছেন—বেশ ভালই আছি, চমৎকার লাগছে! অসুস্থ শিবরাম হাসপাতালে শুয়ে রয়েছেন—নিশ্চয় নানা বেদনা তাঁকে তখন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই অবস্থায় অমন উক্তি—আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। তাঁর সত্যিই কোনো খেদ ছিল না। তাঁর মৃত্যুর বছরখানেক আগে তাঁর কাছে গিয়ে দেখেছিলাম তাঁর ঘরের একমাত্র পাখাটি নেই। গরম কাল—বেশ গরম লাগছিল। বললাম, পাখাটা কোথায় গেল? উনি বললেন, ওরা নিয়ে গিয়েছে। বললাম, কষ্ট হয় না পাখা ছাড়া? তিনি বললেন, কষ্ট কেন হবে? দেখ না কেমন খোলা দরজা দিয়ে হাওয়া আসে। না, এখন আসছে না

ঠিকই—তবে আসবে। প্রায়ই আসে তো! আমি জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম ওরা কারা? কিন্তু জিজ্ঞেস করা আর হয়নি।

তবে ঐ পাখা-ই। আর কিছু তাঁর বাহুল্য ছিল না। ভগ্নপ্রায় একটা খাট, বসলে ক্যাঁচ করে আওয়াজ হয়। একটা কি দুটো চেয়ার। একটা ছোট আলমারি তার ভেতরে, মাথায় নানা ওষুধের শিশি। মেঝেতে হাজার হাজার ট্যাবলেটের ছোট ছোট খোলা মোড়ক, ধুলো, ছেঁড়া চিঠিপত্র। দু একটা বড় শিশি, খালি ওষুধের বোতল গড়াগড়ি দিচ্ছে। একটু দূরে একটি কুঁজো, তার উপর গ্লাস। কাছেই একটা টিন। গুঁড়ো দুধের টিন। দেয়ালে কয়েকশো ঠিকানা লেখা, পেনসিলে। দেখ ত কী চমৎকার আইডিয়া। কাগজপত্র তো কত এলোমেলো হয়ে হারিয়ে যায়—কিন্তু দেয়াল কখনো হারায় শুনেছ? দেখ তোমার ঠিকানাও লেখা আছে কোথাও।

তবে পাখা না থাকায় তাঁর কষ্ট না হওয়ার কথা। জীবনে কষ্ট তিনি অনেক করেছেন। সে সব পুষিয়ে দিয়েছিল মনের পাখা। তাঁর মনকে একটা কথা ধরালেই হল—তিনি সঙ্গে সঙ্গে খেলতে থাকবেন তা নিয়ে। খেলা—লেখা, বাড়ির সঙ্গে বাড়াবাড়ি তো বটেই—ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি। তা ছাড়া হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনিই বা কি কম? তিনি ছোটবেলা থেকেই বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। পালিয়ে প্রায়ই যেতেন তিনি। মন বাড়িতে টিকতই না। বিপ্লবীদের কার্যকলাপের মধ্যেও তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন—নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও। তারপর কলকাতায় পালিয়ে এসে কষ্ট কম করেননি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে খবরের কাগজ বিক্রী করতেন। যে কোনো লোকের দাওয়াতে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিতেন। পরদিন আবার তাঁর কাজ শুরু হত—খবরের কাগজ বিক্রী করা। ভালই আয় হত তাঁর। তবে আয়ই হত—একটি পয়সাও জমাতে পারতেন না। কখনই বোধ হয় পারেননি। টাকার প্রতি তাঁর সহজ একটা বিতৃষ্ণা ছিল। টাকার অঙ্ক তাঁকে কখনই মুগ্ধ করতে পারত না। একবার আমি তাঁর ঘরে বসে গল্প করছি—ঊনিশ শ ষাট সালের কথা, এমন সময় দুজন যুবক এলেন ওঁর কাছে। শিবরামের লেখা কি একটা গল্প তাঁরা সিনেমা করতে চান—সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তিন শ টাকা। ওটা অগ্রিম। বাকিটা, অর্থাৎ সব-সমেত দুহাজার টাকা তাঁরা দেবেন পরে। এখন একটা কাগজে একটা সই করলেই তিন শ টাকা তাঁরা রেখে যাবেন।

প্রস্তাব শুনে শিবরাম বললেন, অ্যা-তো টাকা! একটা গল্পের জন্য তোমরা দেবে? কী দরকার অ্যাতো টাকায়। আমাকে তোমরা যদি আটশ টাকা দাও তাহলেই আমি খুসি হব। আমি দু-হাজার চাই না। কেবল আটশ টাকা নিয়ে এসো—না—না, অগ্রিম টগ্রিম কিছু দরকার নেই।

কিছুতেই সই করলেন না কাগজে। আর অগ্রিমও নিলেন না। যুবকেরা চলে গেলে তিনি বললেন, জানো—আমার হার্ট খারাপ, ওরা তো ঐ তিনশর বেশি কোনদিনই দিত না। আমিও মামলা করতাম না না দিলে। মাঝের থেকে সতের শ টাকা পেলাম না পেলাম না করে আমার হার্টটাই একেবারে অকেজো

হয়ে যেত। এখন দেখ ত আমার মনটা কত মজায় আছে! কথাটা ঠিকই—কেননা, তারপর আর কখনও ঐ যুবকেরা তাঁর কাছে আসেনি।

একটা নির্লিপ্ত ভাব তাঁর ছিল। বড় পুরস্কার কোনদিনই তাঁর ভাগ্যে জোটেনি, অথচ কী অসাধারণ ভাষা, আর সর্বজনপ্রিয়! তিনি তাঁর নিজের রচনা সম্পর্কে কখনই বড় কিছু ভাবেননি। কালজয়ী হবে বলেও তাঁর মনে হয়নি। তাঁর গল্পের অধিকাংশ প্লট কিন্তু নানা স্থান থেকে সংগৃহীত। বিলিতি ছোট ছোট হাসির গল্প থেকে তিনি কত যে গল্প বাংলা করে একেবারে নিজের করে ছেড়ে দিয়েছেন তার সীমা সংখ্যা নেই। তিনি নিজেও বলেছেন সেকথা। আবার তাঁর নিজস্ব প্লটের গল্পও তিনি অনেক লিখেছেন।

শব্দ সম্পর্কে তিনি নিজে লিখেছেন—কথার খেলাকে নিতান্ত খেলার কথা ভাববেন না। শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। ব্রহ্মের রহস্য কী, আমি জানিনে, কিন্তু শব্দদের চিরদিনই আমার রহস্যময় মনে হয়। একেকটি Word যেন একেকটি World। তার মন নিয়ে মনন নিয়ে স্বতন্ত্র এক একটি শব্দ, প্রায় মন্ত্রের মতই, কেবল যে তার অর্থের সহিতই জড়িত তাই নয়, তার মধ্যে একাধিক অর্থ, বিচিত্র রস, আশ্চর্য দ্যোতনা, সব উহ্য থাকে।

শিবরাম নিজের সাহিত্য নিয়ে নিজেই মোক্ষম কথা বলে গেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে। একটা উদাহরণ দিই ঃ

··আমার ছোটদের লেখায় কিছু পোলা থাকে আর কিছু পান্ থাকে—এ ছাড়া কী আছে আর? পোলাপানদের জন্যে আমার লেখা আমার শিশু-সাহিত্য পড়ে তাই কি আপনার ধারণা হয়নি? আমার লেখায় বেশ ভেজাল আছে, সেই অ্যাডলটারেটেড লেখা ছেলেমেয়েদের অ্যাডাল্ট বানিয়ে ছাড়ে। আর সেই জন্যেই হয়ত তারা তা ভালোবাসে। কোনো হিতোপদেশ নেই আমার লেখায়, আদর্শ স্থাপনের বালাই নেই কোনো, কোনো বাণী দিইনে আমি—সেই জন্যেই হয়ত শোনার যোগ্য মনে করে তারা। বলুন, বাণী দেবার আমার কী আছে, সোনাই আসলে নেই যেখানে। খাঁটি সোনার নয়, পরিপাটি গিল্টির—সেই কারণেই আমার রচনায় এত ঝুটো অলঙ্কার, এমন পানঝাল বুঝেচেন?···

তিনি নিজেকে একেবারেই নস্যাৎ করতে চান। কখনো কখনো ঘোষণা করেন তিনি লেখকই না আদবে। তিনি বলেন, তিনি লিখতে মোটেই ভাল-বাসেন না। তিনি বলেছেন, গায়ের জোর নেই বলে রিকশো টানতে পারি না। তার বদলে এই কলম টানি। কলমের উপর টান আমার এইটুকুই। তারপর আরও বলেছেন, লেখা আমার পেশা হলেও পিষ্ট হয়েই আমার লেখা। বেশ, মজদুর বলতে না চান মুটে বলতে পারেন আমার। মোট ফেলেই আমার খাওয়া ; মোটামুটি লিখে মোটের উপর কিছু পেয়ে যাওয়া।

লিখতে লিখতে কখনও কখনও শিবরাম কিঞ্চিৎ ভালগার হয়েছেন। সেগুলির পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। সেগুলি তাঁর রচনা থেকে সরিয়ে দিলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু যা তিনি দিয়ে গেছেন তা অতি অজস্র। কখনই তাঁর লেখা পুরনো হয় না। ভাল কবিতা যেমন পড়তে পড়তে কখনই ফেলে

দেওয়ার পর্যায়ে আসে না—শিবরামের লেখাও তাই। একবার পড়ে ফেলে দেবার মত নয় কখনই। সব সময়েই তাঁর লেখার মধ্যে নতুন হাসি লুকিয়ে থাকে।

একটি উদাহরণ দিই।

"অমল সুর করে পড়তে শুরু করে—
তালশাঁস জিবেগজা আর গোলাপ জাম
খেতে কি আরাম!
ছানাবড়া পানতুয়া আর দানাদার
নানারূপ মিহিদানা—
আহা কি বাহার!

দাদা বাধা দেয়।—দাঁড়া দাঁড়া! কী সর্বনাশ! এ যে সব মিলে গেছে।

—মিলবেই তো। অমল অভিজ্ঞের মতো উত্তর দ্যায়।—কবিতায় ওরকম মিলে যায়। কত মেলে!

—কী ভয়ানক! কাল রাত্রে কি খেয়েছিলি?

—কি আবার খাবো? অমল আকাশ থেকে পড়ে।

—আমার সঙ্গে বসে যা খেয়েছিল তার বাইরে কিছু? বুবুর বাড়ি কিম্বা রাস্তায় রেস্তরায় কিনে টিনে?

—কই কিছুই খাইনি তো।

—গুরুপাক কোনো খাদ্য? ভালো করে মনে করে দ্যাখ্।

—খেলে তো মনে থাকবে। অমল অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

—তা কি হয়? এমন কিছু খেয়েছ যা খেয়ে গরহজম হয়েছে। তা নইলে কি কবিতা বেরয়? কবিতা হচ্ছে চোঁয়া ঢেকুর। বদ হজম থেকেই ওর উৎপত্তি। .."

এটি শিবরামের প্রথমদিকের রচনার একটি নমুনা। এর মধ্যে কেবল যে হাসি লুকিয়ে রয়েছে তা নর—একটু লক্ষ্য করলে কিছুটা ব্যঙ্গও মালুম হয়। ত্রিশের দশকে যখন 'গদ্য' কবিতার ফ্যাশন চালু হয়েছিল তখন শিবরাম তাকে এভাবেই ব্যঙ্গ করেছিলেন। তবে শিবরামের ব্যঙ্গ নেহাতই আক্রমণমূলক নয়—কিছুটা স্নেহমূলকও। এবং তাঁর লেখায় যা সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে' এমনকি গোরক্ষাকারীদেরও তিনি ঐ সময় বেশ এক হাত নিয়েছিলেন—তাঁর অনবদ্য গুরু ছিল ঋষি বইতে। কিন্তু কখনও তাঁর ব্যঙ্গে তিক্ততার স্থান ছিল না। তিনি যাঁর গলা কাটতেন তাঁকে জানতেই দিতেন না তাঁর গলা কাটা হচ্ছে। গরু রক্ষাওয়ালাদের নিয়ে তিনি লিখেছিলেনঃ

"—কিন্তু গরু কই? অনেকক্ষণ থেকেই সন্দেহ ভঞ্জনের প্রয়োজন অনুভব করছে অমল।—গরু কই এর মধ্যে? শুনলাম এটা একটা কাউ কনফারেনস।

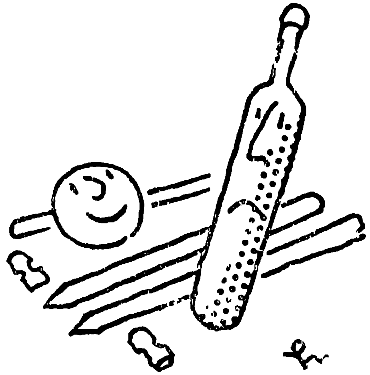
—কেন? এ-সবই তো গরু! সহজ সুরেই ভদ্রলোকের উত্তর আসে।

—গরু! দুজনেই হতবাক হয় বিস্ময়ে। —সব্বাই?

—গরু ছাড়া আর কী! নিজের নিঃসংশয়তার জোরে ওদের নিশ্চিন্ত

করতে চান তিনি ' পরিচয় পেতে দেরি লাগবে না তোমাদের !"

এখনও গরুরক্ষাওয়ালাদের হম্বিতম্বী আছে। কিন্তু এই ভাবে তাদের সমালোচনা করার মানুষ বোধহয় আর নেই। এই উদাহরণটি শিবরামের সমাজসচেতন মনোভাব থেকে নিশ্চয়ই উৎপন্ন হয়েছিল। যেমন উৎপন্ন হয়েছিল তাঁর অসাধারণ মসকো বনাম পণ্ডিচেরীর ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধাবলী। যেমন তিনি সৃষ্টি করেছিলেন দেবতার জন্ম। তাঁর ঐ দেবতার জন্ম গল্পটি বাংলার কেন হয়ত পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের সঙ্গেই সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে। অথবা, তাঁর অপরূপ কাহিনী চালের খুদ সম্পর্কিত রচনা। তবে এটা ঠিক, শিবরাম ছিলেন প্রধানত হাস্যরসের কারবারী—বিশেষ উদ্দেশ্য যদি তাঁর কিছু থেকে থাকে তা হল হাস্য উৎপাদন! আমাদের এই ভঙ্গ বঙ্গদেশে অনেক হতাশা আছে, দুঃখ দারিদ্র্য আছে—কিন্তু কবি যাই বলুন না কেন অতখানি রঙ্গ নেই। তাই শিবরাম যে হাসির রস আমাদের পরিবেশন করে গেছেন তা অনেকখানিই।



ক্রিকেটের মত দুর্বোধ্য ?

ক্রিকেট খেলাটা যে কি ব্যাপার তা এখনও আমার মাথায় ঢুকল না। অবশ্য এই খেলা, ট্রামে বা বাসে যেতে যেতে কখনো মাঠে দেখে ফেলিছি, দেখেছি সাদা পোশাক পরে কয়েকজন দাঁড়িয়ে থাকে দুজন ব্যাট হাতে করে, এক একজন তিনটে করে লম্বা লম্বা পোঁতা লাঠির সামনে। একজন আবার দেখি কুঁজো হয়ে রয়েছে ব্যাটের উপর ভর দিয়ে। আসলে সে কিন্তু কুঁজো নয়, কেননা দেখেছি কখনো কখনো সে দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করে, আবার অন্য ব্যাটওলা তাকে ধরতে ছুটে আসে। কিন্তু তাকে কখনো ধরে না। এটা অনেকটা কলকাতার রাস্তার ফেরিওলা পুলিস খেলার মত। পুলিস এলে ফেরিওয়ালারা তার জিনিষপত্র বেঁধে ফেলে কোন বারান্দায় উঠে পড়ে, বা কোন বাড়িতে ঢুকে পড়ে, তারপর দাঁত বার করে হাসে, পুলিসও অপ্রস্তুতের মত হাসতে থাকে। ক্রিকেটে অবশ্য অত সব হয় না—দেখেছি সেখানে বিশেষ কেউ হাসে না। অবশ্য অধিকাংশ খেলোয়াড় দূরে থাকে বলে তারা হাসছে কিনা ঠিক বোঝা যায় না তবে দর্শকেরা বিশেষ হাসেনা আমি দেখছি, শুনেছি। ক্রিকেট মাঠে হঠাৎ যখন কুকুর ঢুকে পড়ে তখনই কেবল লোকেরা হাসে।

অথচ এই মাঠে ঢুকবার জন্য কি মারামারি কি হানাহানি কি ঝগড়া। এসব দূর করার জন্য লটারির ব্যবস্থা হল—কিন্তু ঐ লটারি উপলক্ষ করেও আবার ঝগড়া মারামারি হানাহানি হয়ে গেল। ঐ টিকিট নিয়ে কি দুর্নীতিও হয়ে গেছে এক পশলা—এখন তাই নিয়ে তদন্ত চলছে। অথচ লোকেরা যে কি চায় বোঝা যায় না—কলকাতার যে কোন বাড়িতে রয়েছে রেডিও আর প্রত্যেকটি থেকে অতি চমৎকার ধারা বিবরণী প্রচার হচ্ছে, শুনে নিলেই তো চুকে যায়, কিংবা এবারে যে টেলিভিশন এল তাতে দেখে নিলেও যে কি ক্ষতি কে জানে। মাঠে গিয়ে খালি খরচ। সময় এবং অর্থ দুইই। কিন্তু মাঠে নাকি সুন্দরী সুন্দরী মেয়েরা যায় আর বেঞ্চে বসে বসে তারা উল বোনে,

ওদের দেখতে মাঠে যাবার আমার ভারি শখ ছিল, আর সে শখ মিটেও গেছে এবার। মাঠে যাবার শখ মিটে গেলেও সুন্দরী মেয়েদের উল বোনা আমার তেমন নজরে পড়েনি। একজন একটা সরু লম্বা কি একটা বুনছিলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কিসের জন্য ? ভদ্রমহিলা বললেন, তাঁর স্বামীর একটা লাঠি আছে, শীতকালে তার হাতলটা ধরতে ঠান্ডা লাগে ছ্যাঁৎ করে ওঠে, তাই লম্বা একটা কাভার বানাচ্ছেন তিনি। আর একজনকে দেখলাম তিনিও একটা লম্বা খোলস বানাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন ওটা একটা সাপের জন্য। তিনি নাকি একটা সাপ পুষছেন। ঐ দুজনই কেবল উল নিয়ে বসেছিলেন।

এসব কথায় অনেকেরই মনে হবে বানানো কিন্তু আমি একদম বানিয়ে বলছি না। এবারে আমার এক প্রিয় বন্ধুর হঠাৎ টাইফয়েড হয়ে পড়লে আমি তার কাছে যাই। ওর ধারণা হয় সে মরেই যাবে। আমাকে সে বলে, সে যখন মরেই যাবে তখন আর ক্রিকেটের সীজন টিকিটটা তার কাজে লাগবে না অতএব সে আমাকে ঐ টিকিটটি দান করে দেয়। ঐ টিকিটটি নিয়েই আমি এবারে ক্রিকেট মাঠে ঢুকেছিলাম, সঙ্গে নিয়েছিলাম আমার ট্রানজিস্টর রেডিওটিও। গিয়ে দেখলাম ব্যাপার ঐ একই। এত হাঁক ডাক যে টেস্ট ম্যাচের সে ম্যাচেও সেই দুজন ব্যাটওলা, এবং ঐ দুজনের মধ্যে একজন কুঁজো হয়ে দাঁড়ায়, আবার একজন লোক হঠাৎ পাঁই পাঁই করে দৌড়ুতে শুরু করে—আর হাতে একটা লাল বল থাকে। দৌড়ুতে দৌড়ুতে তার যখন ক্লান্তি আসে তখন সে আর বলটিকে ধরে রাখতে পারে না। কোন কারণে সে বোধ হয় রেগেও যায়—সে তখন ঐ বল দিয়ে ব্যাটওলাকে মারতে চেষ্টা কর। ব্যাটওলা জানে ঐ খ্যাপা লোকটা তাকে মারতে চেষ্টা করছে সেও প্রস্তুত হয়ে ব্যাট দিয়ে বলটিকে সরিয়ে দেয় আর তার পর কখনো কখনো হঠাৎ ভয় পেয়ে যায়। ভয় পেয়ে সে দৌড়ুতে থাকে—তার দেখাদেখি অন্য ব্যাটওলাও ভয় পায় সেও দৌড়তে থাকে। তখন একজন অন্য জনকে ধরতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। একথা আমি প্রথমেই বলেছি। রাস্তা থেকে দেখা ক্রিকেট আর ইডেন গার্ডেনের ক্রিকেটের মধ্যে পার্থক্য তেমন কিছু নজরে পড়েনি আমার।

তবে ক্রিকেট একটা রহস্যময় ব্যাপার—এর অনেকটা আবার মিথ্যেও বটে। যেমন, খেলা শুরু হতে না হতেই প্রায় রেডিওর ঘোষক বললেন, ওভার! আমি তাই শুনে ভাবলাম, বাপরে বাপ। এইটুকু খেলেই ওভার—মানে সব শেষ হয়ে গেল ? এর জন্য এত হৈচৈ। কিন্তু দেখলাম আমি ছাড়া কেউই সীট ছেড়ে উঠলেন না, ঠায় বসে রইলেন সব। এমনকি ভদ্রমহিলা দুজন যাঁরা উল বুনছিলেন তাঁরাও একবার আড়চোখে তাকালেন না পর্যন্ত।

হঠাৎ ক্রিকেট ঘোষক বললেন, গুগলি ! ইডেনের মাঠে গুগলি। আমি খুব চেষ্টা করে সমস্ত মাঠটি আতিপাতি করে খুঁজলাম কিন্তু একটা গুগলিও আমার চোখে পড়ল না। না পড়ারই কথা, ছোট ছোট গুগলি আমি যতদূরে বসেছিলাম ততদূর থেকে চোখে হয়ত পড়েনি। কিন্তু মাঠে গুগলি থাকলে তা

দেখে এমন হৈ চৈ করে পৃথিবী সুদ্ধ লোককে জানানোরই বা কি দরকার তাও আমার বুদ্ধিতে কুললো না। তবে আমার মনে হয় খেলা বোধ হয় ধীরে ধীরে চলছে—উত্তেজনা নেই তেমন তাই বোধ হয় ঘোষক কায়দা করে বলতে চেয়েছিলেন, শম্বুক গতি। শামুকের চাইতেও আস্তে যে চলে তারই নাম গুগলি!

হঠাৎ শুনি ঘোষক এবং আপামর দর্শক বলে উঠলেন, চার! চার! কিন্তু এ কি মাছ ধরার ব্যাপার যে চার ফেলা হবে? ক্রিকেট খেলায় কেউ কখনো চার দেয়? কে জানে বাবা—কত রকম নিয়ম কানুন এই খেলায় থাকে। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি দাদা, চার কোথায়? তিনি বললেন, ঐ যে ব্যাটওলা মারলেন না বলটাকে ওতেই তো চার হল।

কি আশ্চর্য কারবার! ব্যাটের সঙ্গে বল লাগলে চার হয়? আমি তো জানতাম সরষের খোসা থেকে খোল হয়—এবং সেই খোল জলে ফেললে হয় চার। ভদ্রলোককে তা বলাতে তিনি আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, দাদা কি রাঁচী থেকে এয়েছেন?

কি কথার কি উত্তর! আমি অন্য একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, দাদা চার কি থেকে হয়? তিনি বললেন দুয়ে-দুয়ে চার হয়। আমি বললাম, ক্রিকেটের চার কি থেকে হয়? তিনি বললেন বাউন্ডারি থেকে। ঐ যে দেখছেন একজন ব্যাট নিয়ে দাঁড়িয়ে, ঐ দেখুন লাল বলটাকে তিনি সপাটে মেরেছেন। এইবার তিনি দৌড়ুচ্ছেন—এক রান হল।

এর পরের বার অন্য একজন বলটিকে দারুণ জোরে মারবার পর বলটা কোথায় যেন চলে গেল। সকলে চিৎকার করে উঠল, হাততালি দিয়ে উঠল। কে যেন আমার কানের কাছে চেঁচিয়ে বলল, শা লা··· ! এরপর আর যেন চিৎকার থামেই না। তারপর লোকটা আবার খুব জোরে বলটাকে ব্যাট দিয়ে পিটল—এবার সকলে বলে উঠল চার! চার!

আমার মনে হল এসবই মিথ্যাচার। ক্রিকেট খেলাটাই একটা মিথ্যাচার।

অতবার যে লোকেরা বলল, ওভার! কিন্তু খেলা চলতেই লাগল সত্যি সত্যি আর ওভার হয় না।

একটু দূরে একজন সায়েবের মত দেখতে লোক বসেছিলেন, তিনি বাইনোকুলার দিয়ে খেলা দেখছিলেন মাঝে মাঝে। একবার তিনি বললেন, দি পিচ ইজ নাইস! রেডিওতেও ঘোষক বললেন, সুন্দর পীচ এই ইডেনের মাঠের। কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই মিথ্যা! সমস্ত ইডেনের মাঠে আমি সামান্য এক স্কোয়ার ইঞ্চি জায়গাতেও পীচ দেখতে পেলাম না। এসব কথা কেন যে মিথ্যে মিথ্যে বলা হয় কে জানে?

হঠাৎ শুনলাম, আউট! আউট!! সকলে বলছে আউট!! কিন্তু কাকে বলছে বোঝা গেল না। হঠাৎ দেখি মাঠের ভিতর থেকে একজন ব্যাটওলা বেরিয়ে যাচ্ছে মুখ নিচু করে। আমার মনে হয়ে লোকটা বোধহয় অসভ্যতা-টসভ্যতা কিছু করেছিল, হয়ত কোন মেয়েকে দেখে শিসটিস দিয়েছিল, নইলে

এত লোক তার দিকে অমন ক্রুদ্ধভাবে আউট ! আউট !! করে চেঁচাচ্ছে কেন ? আবার সেই সঙ্গে হাততালিও যে কেন দিচ্ছে লোকেরা তাও আমি হিসেব করে বার করতে পারলাম না ।

অন্য একজন লোককে দেখলাম দ্রুত পায়ে একটা ব্যাট হাতে করে মাঠে এসে হাজির ! সে এসেই দু একবার তার দিকে ছোঁড়া বলটিকে ব্যাট দিয়ে ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে এমন রেগে গেল যে কি বলব । পঞ্চম কি ষষ্ঠ বলে সে ঐ বলটিকে এমন জোরে মারল যে সেটা হঠাৎ অনেক উঁচুতে উঠে গেল, তারপর লোকজনের মধ্যে পড়ে হারিয়ে গেল । এইবার আমি ভাবলাম ঐরকম বল নিশ্চয় খুব দামিই হবে, এবং ঐ বলটি হারিয়ে দেওয়ায় ওকে হয়ত সকলে মাঠ থেকে আউট আউট করে বার করে দেবে । কিন্তু সে সব কিছু হল না—লোকেরা চিৎকার করে হাততালি দিয়ে ওকে বাহবা দিতে লাগল । অথচ যে খেলোয়াড় অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বলটিকে মাঠের মধ্যেই রেখেছে কখনো হারিয়ে ফেলেনি তাকে কেউ হাততালি দিয়ে এমন বাহবা দেয়নি । এ এক ধরনের অবিচার বলে আমার মনে হল । আমি হাততালি না দিয়ে লোকটার মুণ্ডুপাত করতে লাগলাম । ঐ বলটার দাম নিশ্চয় অন্তত পাঁচ টাকা হবে—এই অগ্নি মূল্যের দিনে এরকম একটা বল হারানোর মধ্যে বাহাদুরীর কি আছে ?

ক্রিকেট মাঠের আরো সব মিথ্যাচার আমার চোখে পড়ল । কিন্তু ক্রিকেটে ঘোষক মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলেন—সেটা হচ্ছে পেছনের পা ! ব্যাটওলা পিছনের পায়ে ভর দিয়ে বলটিকে আস্তে করে ঠেকিয়ে দিলেন । এরকম ঘোষণা স্পষ্ট শুনতে পেলাম । কিন্তু ব্যাটওলার পেছনের পা কোনটা বা সামনের পা-ই বা কোনটা তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝে উঠতে পারলাম না ।

এই ক্রিকেট ঘোষক আবার মারাত্মক ভুল ও বকবক করছিলেন । একবার তিনি বললেন, স্কোয়ার লেগ । কিন্তু একজন লোককেও মাঠে দেখলাম না যার পা চতুষ্কোণ । এসব মিথ্যা বলার প্রয়োজন কি ? অবশ্য দু একবার ফাইন লেগ বললেন—সেটা তেমন মিথ্যে মনে হয়নি, কিন্তু ডীপ ফাইন লেগের মানে কি বুঝলাম না ।

দর্শকরা সাথে সাথে হঠাৎ কোন কোন ব্যাটওলার উপর রাগ করে গালা-গালি দিচ্ছিলেন । কোন এক ব্যাটওলাকে একজন তো বলেই বসলেন এই শালা—শুয়ারের বাচ্চা, যা বাড়ি থেকে ফীডিং বটলটা নিয়ে আয় । সেই সঙ্গে রেডিও থেকেও ঘোষকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তিনটে গালি ! তিনটের দুটি তো আমি নিজের কানেই শুনলাম, আর ঘোষক হয় তো আরো একটা গালি শুনেছেন । এই একটি ব্যাপারে দেখলাম ঘোষক ঠিক ঠাক বিবরণ দিয়ে চলেছেন । আবার নটা উইকেট হারিয়েছে শুনে ভেবেছিলাম ওটা মিথ্যে কেননা স্পষ্ট দেখেছি সব উইকেটই মাঠে ছিল !

ঐ একদিনই আমি ক্রিকেট মাঠে ঢুকেছিলাম । তারপর আমি আর যাইনি ।



ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং পনের জন লেখক

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বিখ্যাত সাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় তাঁর সমসাময়িক গোনা-গুনতি চোদ্দ জন লেখককে বেশ বেকায়দায় বা বিপদে ফেলে দিয়েছিলেন। তিনি এমন এক কাণ্ড করেছিলেন, এবং এমন এক সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন তার সঙ্গত সমাধান পরবর্তী চোদ্দ জন লেখকের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হয়নি। যে চোদ্দ জন লেখককে তিনি বিপদে ফেলেছিলেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে সরোজকুমার রায়চৌধুরী কেশবচন্দ্র গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, পরিমল গোস্বামী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এঁদের কেউই আজ ইহলোকে নেই।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় বড় সু-সময়, বা দুঃ-সময়ও বলা যায়, যেমন বলেছিলেন ইংরেজ লেখক চার্লস ডিকেন্স, ইট ওয়াজ দি বেস্ট অফ টাইমস ইট ওয়াজ দি ওয়ার্স্ট অফ টাইমস…, ইত্যাদি। সময়টা ছিল সু-সময়, কেন না, কৈলাস বসু স্ট্রিটে, ট্রাম লাইন থেকে তিন মিনিট হাঁটা পথে দোতলায় চারটি ঘরের ফ্ল্যাটের ভাড়া তখন বত্রিশ টাকা, রবিবারে "সারাদিন ট্রাম গাড়িতে মাত্র ছ আনা" এবং মিড-ডে তে ট্রামের ভাড়া শ্যামবাজার থেকে এসপ্ল্যানেড তিন পয়সা, সেকেণ্ড ক্লাসে। তখন অনেক বাড়ির উপরই লেখা থাকত "টু-লেট" এবং সহৃদয় বাড়িওলার সংখ্যাও খুব কম ছিল না। তখন একটা মোটামুটি বড় পরিবারের দৈনন্দিন বাজার খরচ ছিল গড়ে আট আনা।

এই হল সু-সময়ের হিসেব। ওটা দুঃসময়ও ছিল, তার হিসেব অন্য। একটা ত্রিশ টাকার চাকরিও তখন পাওয়া ছিল দুরূহ। শতকরা নব্বুই ভাগ চাকুরের মাইনে ছিল ষাট টাকার নিচে। মনে আছে পেঙ্গুইন বইয়ের দাম তখন

ছ আনা, এবং একটু দর করলে সাড়ে পাঁচ আনাতেও পাওয়া যেত। তখন কেউ মাসে তিনশো টাকার বেশি উপার্জন করলে তাঁকে প্রায় বড়লোকই বলা হত। পাঁচশো টাকা যাঁরা মাইনে পেতেন তাঁদের কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ঐ সময় কিছু লেখকের নিবিড় সান্নিধ্যে না এলেও মোটামুটি কাছ থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম পিতার দৌলতে। ঐ সময় বিখ্যাত লেখকরা একটি লেখার জন্য পাঁচ দশ টাকাতেও লিখেছেন এবং একটি পুরো বইয়ের কপি রাইট পঞ্চাশ টাকাতেও বিলিয়ে দিয়েছেন। অতএব সেটা দুঃসময়ও ছিল মন্দ নয়! পিতা সম্পাদক হওয়ার ফলে অনেক লেখক—এঁদের মধ্যে পিতৃবন্ধুরাও ছিলেন—দশ টাকা বড়ই কম, একটা লেখার জন্য অন্তত পনের টাকা ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করতেন তাঁদেরই কেউ কেউ, সে প্রমাণ এখনও বোধ হয় আছে বাড়ির চিঠিপত্রের মধ্যে।

এই পটভূমিকায় হেমেন্দ্রকুমার রায় যা করে বসলেন তা প্রায় অভাবনীয়। স্থির হয়েছিল বেতারে পনের জন সাহিত্যিক একটি উপন্যাস পাঠ করবেন। উপন্যাসটির নাম দেওয়া হয়েছিল পঞ্চদশী। সেই উপন্যাস আসলে বারোয়ারি উপন্যাস। (এটাই কি প্রথম বারোয়ারি উপন্যাস?) প্রথম জন যা লিখবেন, তার পরবর্তী পর্যায় লিখবেন পরবর্তী লেখক। লিখবেন কেবল নয়, পড়বেনও। এই লেখা-পড়ার জন্য কি ফি ধার্য হয়েছিল জানি না, সম্ভবত প্রত্যেকে পেয়েছিলেন দশ টাকা করে, পনের টাকাও হতে পারে! কিন্তু পনের সপ্তাহ ধরে এই পঞ্চদশী শেষ হবার পর সবই হাওয়ায় মিলিয়ে যেত বেতারের বাণীর মতই যদি না একজন উদ্যোগী প্রকাশক এটিকে একটি বই হিসেবে না ছাপতেন।

এ বই বোধ হয় বেশি বিক্রি হয়নি। এর নামও আজকাল কারুর আর মনে থাকার কথা নয়। কিন্তু পোকাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এখনও একটি কপি বাড়িতে থাকায় এটি পড়ে ফেললাম আরও একবার। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে একবার পড়েছিলাম বোধ হয়—আবছা আবছা কি ু মনেও পড়ল। পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম হেমেন্দ্রকুমার রায়ের প্রচণ্ড রসিকতার সন্ধান পেয়ে। করেছিলেন কি হেমেন্দ্রকুমার! তিনি প্রথমেই একজন প্রায় আত্মীয়হীন বিয়াল্লিশ বছর সাড়ে তিন মাস বয়সের বসন্ত চৌধুরীকে আমদানি করলেন। বাড়িতে ছিলেন স্ত্রী সরলাবালা, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হওয়ায় সন্তানহীন বসন্ত ভৃত্য নিধিরামকে নিয়ে একা হয়ে পড়লেন। কলকাতায় তাঁর তিনখানা বাড়ি, ভাড়াটেরা ভদ্রলোক, তাঁকে ভালওবাসেন তাঁরা। অর্থাভাব তাঁর নেই। বাড়িতে বড় লাইব্রেরি, পড়াশুনা করে দিন কাটে।

কিন্তু এইভাবে দিন কেটে চিরকাল গেলে উপন্যাস হয় না, এবং জটিলতাও থাকে না। অতএব হেমেন্দ্রকুমার এক কাণ্ড করে বসলেন। বসন্ত চৌধুরীর জীবন-বীণার তার ছিঁড়ে গেল "আচম্বিতে"। বসন্ত চৌধুরী একাই থাকেন, কিন্তু বেশি দিন নয়, মাত্র এক মাস পর আটর্নির বাড়ি থেকে এল এক অভাবিত আমন্ত্রণ। হেমেন্দ্রকুমারের কথায়, "পশ্চিম অঞ্চলে বসন্তের একমাত্র খুল্লতাত

বাস করতেন—লোকের মতে তিনি ছিলেন ধনকুবের।" উনি বিবাহ করেননি কেননা তিনি ছিলেন কৃপণ। যাই হক বসন্ত "অ্যাটর্নি-বাড়িতে গিয়ে জানলেন, জীবন থাকতে যে খুড়ো তাঁকে একদিনও স্মরণ করেননি, মরে গিয়ে তিনিই আজ ভাইপোকে ত্রিশ লাখ টাকার মালিক করে গিয়েছেন।"

পদ্মের গন্ধ এবং মৌমাছির গুঞ্জন উপভোগ করতে করতে হঠাৎ যদি কেউ আচমকা কানের তিন ফুট দূরে বোমা ফাটায় তাহলে যেমন মনের অবস্থা হতে পারে এই লাইনটি তার চাইতে কম মারাত্মক মনের অবস্থা সৃষ্টি করেনি। আগেই পটভূমিকার কথা বলেছি। যেখানে মাসে ষাট টাকার নিচে মাইনে ছিল সাধারণ ব্যাপার সেখানে একেবারে ঝপ করে ত্রিশ লক্ষ টাকা এসে পড়ল বিয়াল্লিশ বছরের সুদর্শন বসন্ত চৌধুরীর কোলে। এর ফলে বসন্ত চৌধুরী প্রায় দিশেহারা হয়ে হয়ত পড়েননি, কিন্তু এর মোক্ষম ধাক্কা লাগল চোদ্দজন সাহিত্যিকের অন্তরে। এঁদের মধ্যে দু-এক জন বাদে কারুর হয়ত কুল্লে দশ হাজার টাকার সম্পত্তিও ছিল না। এটাও অনেক বাড়িয়ে টাড়িয়ে হিসেব করেছি। আর নগদে এঁদের কত ছিল বা থাকতে পারত তা সহজেই অনুমান করা যায়। মনে রাখতে হবে, সেই সময়টায় ইউরোপে সদ্য যুদ্ধ বাধলেও এদেশে দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দাম আকাশপথে যাত্রা করেনি, এমনকি মাটি থেকে দু'-এক ফুট উপরেও ওঠেনি।

এই ত্রিশ লক্ষ টাকার ধাক্কা অবশ্য হেমেন্দ্রকুমারের তেমন লাগেনি। এই বিস্ময়কর ব্যাপারটা নিজের সৃষ্টি বলেই। তবু একেবারে কি হয়নি, নিজের সৃষ্টিতেও বিস্মিত হওয়া যায়, যেমন হেমেন্দ্রকুমারও হয়েছিলেন, কিন্তু বলতেই হয়, অল্পের উপর দিয়ে। বসন্ত তখন শুনতে পায় তার "শেষ যৌবন" বলছে, "বসন্ত, এখনো আলোর মৃত্যু হয়নি, এখনো আমার খেলা করবার সময় আছে। চেয়ে দেখ, কি সুন্দরী পৃথিবী। কান পেতে শোনো, কোকিল গান গায়। দিকে দিকে উচ্ছ্বসিত জীবনের বিচিত্র উৎসব। রাত এলেই বা ভাবনা কি? ত্রিশ লক্ষ টাকার পিরামিডের উপর উঠলে রাত্রিকালেও চাঁদের আলো উপভোগ করা যায়। জাগো বসন্ত, জাগো।"

শেষ যৌবন কথাটি লক্ষণীয়। বিয়াল্লিশ বছর সদ্য শেষ হয়েছে এমন ব্যক্তিরা আজ কেউ কেউ তরুণও। যাক সে অন্য প্রসঙ্গ। যাই হক, হেমেন্দ্রকুমার মহা চালাকির সঙ্গে আত্মীয়দের সমস্যা সৃষ্টি করেননি, স্ত্রীকে মহাপ্রস্থানের পথে পাঠিয়েছেন. বয়সটিকেও এমন দিয়েছেন বসন্ত চৌধুরীকে যে তিনি সব রকমই করতে পারেন। তিনি বিবাহ করতে পারেন, নাও পারেন। সম্পূর্ণ আহ্লাদে গা ঢেলে দিতে পারেন, বানপ্রস্থ অবলম্বন করতে পারেন। হেমেন্দ্রকুমার তাঁর প্রথম অধ্যায়ের শেষ দিকে বসন্তকুমারকে দিয়ে বলিয়েছেন, "—কি সামলাবার কথা বলছ? সরলার শোক? সেটা সামলাতে পেরেছি কি না জানি না। কিন্তু এই ত্রিশ লাখ টাকার বোঝা সামলানো আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।"

কিন্তু কিছুই অবশ্য হয়নি। বসন্ত চৌধুরীর দরজায় বহু লোক এসে

কড়া নেড়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছেন এই পর্যন্ত। এই টাকার বোঝা সামলানোর কথাটি একেবারেই অতিরঞ্জিত। আসলে মনের গহনে হেমেন্দ্রকুমারও বুঝতে পারছিলেন এই টাকার ব্যাপারটি সত্যিই একটি বোঝা—কিন্তু যা লিখে ফেলেছেন তা বদলানোর কোন মানে হয় না। তিনি এই বোঝাটি বসন্ত চৌধুরীর ঘাড়ে যেমন চাপিয়ে দিলেন, তেমনি চাপিয়ে দিলেন পরবর্তীদের ঘাড়েও। এই ত্রিশ লক্ষ টাকার বোঝা সিন্ধবাদের বোঝার মত বহন করে চললেন চোদ্দ জন সাহিত্যিক। আমার কাহিনী সেই বিষয় নিয়েই।

কেবল টাকা নয়, এই সঙ্গে হেমেন্দ্রকুমার আর একটি রসিকতা করে-ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল তাঁর খ্রীস্টান বন্ধু সুরেন সেনের বিধবা বোন অমলার যিনি কুড়ি বছর বিলেতে ছিলেন, ফিরে এসেছেন উনিশ বছরের কন্যা হেনাকে নিয়ে। খ্রীস্টান বনাম হিন্দু জটিলতা সৃষ্টি করারও উদ্দেশ্য তাঁর বোধ হয় ছিল, কিন্তু তা নিয়ে বিশেষ কোনও সাহিত্যিকই মাথা ঘামাননি। কে যায় ঝামেলায় ?

হেমেন্দ্রকুমারের অধ্যায়ের শেষ কয়েকটি লাইন এখানে উদ্ধার করি, "বসন্তের দুই চোখে জাগল অতিশয় বিস্ময়ের আভাস। এঁরাই কি তার বন্ধুর ভগ্নী ও ভাগ্নী—মা আর মেয়ে ? না এঁরা সমবয়সী দুই পূর্ণ যুবতী—এক বোঁটায় ফোটা দুটি আগুনের ফুল !"

॥ ২ ॥

অতঃপর সরোজকুমার রায়চৌধুরীর সমস্যার শুরু। সরোজকুমার কি আর করেন। বসন্তকে চমৎকার চরিত্রের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার তিনি চেষ্টা করলেন। বসন্ত চৌধুরী সংস্কৃত জানেন, আর হেনা চাইল সংস্কৃত শিখতে। যে মেয়ের জন্ম ইংল্যাণ্ডে, জন্মসূত্রে খ্রীস্টান, সে এসে একেবারে দিশি ঐতিহ্যের দিকে ঝুঁকল। হেনা বলল, "—আমি আমার স্বদেশকে জানতে চাই। তার কালচার, তার ট্র্যাডিশনের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।" অবশ্য সরোজকুমারেরই তত্ত্বাবধানে দেখা গেল সংস্কৃত শেখার ব্যাপারটি আর এলই না। পরবর্তী তেরো জন সাহিত্যিকও হেনার সংস্কৃত শেখার ব্যাপারে নীরব রইলেন। সরোজকুমার অমলা, হেনার সঙ্গে বসন্ত এবং বন্ধু সরেনকে পাঠিয়ে দিলেন হোটেল এবং সিনেমায়। বসন্তর মনেও কি বসন্ত এল ? সরলার মৃত্যুর পর ঘর হয়েছিল অগোছাল, এদিকে ওদিকে জঞ্জাল—কোনও খেয়াল ছিল না। এক মাস পর বসন্ত হঠাৎ দেখলেন তাঁর বাড়ি পরিষ্কার নয়, পর্দা ভাল নয়, বসার ঘরে ঢুকতে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে, চেয়ারগুলো সেকেলে। এই বাড়িতেই অমলা আর হেনা আসাতে বসন্ত "ধন্য" হন, "কৃতার্থ"ও হন।

রহস্য একটু ঘনিয়ে আসে। ত্রিশ লক্ষ টাকার কথা সরোজকুমার রায়চৌধুরীর মনে পড়ে। একটা নতুন বাড়ি কেনার কথা হয়। বসন্ত চৌধুরীর বাড়িটা খারাপ ছিল না, তবু কেন নতুন বাড়ির কথা মনে আসে, কে জানে ? যাই হক ত্রিশ লক্ষ টাকা নিয়ে বসন্তের কিছু করা দরকার। উপন্যাসে ওটি

একটি বিরাট ব্যাপার। কিন্তু সেটা হল না। বসন্ত ঘরের পর্দা এবং কার্পেট ছাড়া কিছু ভাবতে পারলেন না।

টাকা নিয়ে কি করা যায় এ নিয়ে পরবর্তী লেখক কেশবচন্দ্র গুপ্ত কিছু দুশ্চিন্তা করলেন। তাও ত্রিশ লক্ষ টাকার এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ মাত্র দশ লাখ টাকা "সলিসিটর মারফত খাটালে বেশ দু-পয়সা উপার্জন বাড়ত।" এটা অবশ্য বসন্ত চৌধুরীর অ্যাটর্নি হরেন্দ্রের হিসেব। এদিকে কেশবচন্দ্র গুপ্ত মশাইয়ের পাল্লায় পড়ে বসন্ত চৌধুরীর সমস্ত টাকা "যক্ষের ধন" কোম্পানির কাগজ এবং ফিক্সড ডিপোজিটরূপে ব্যাঙ্কে গুদামজাত হল। কিন্তু তারপরও নিশ্চয় নগদ কিছু ছিল, কেননা বসন্ত চৌধুরী বালীগঞ্জের একটি নিভৃত পল্লীতে একখানি বাড়ি কিনতে চেয়েছেন এমন প্রমাণও দাখিল করলেন কেশবচন্দ্র গুপ্ত। কিন্তু কেশবচন্দ্রও বসন্ত চৌধুরীকে একটি নিভৃত বাড়ি দেখালেন বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত বেচতে পারলেন না, বসন্ত চৌধুরী সে বাড়ি কিনলেন কি কিনবেন না এই সংশয়ে শ্রোতা এবং পাঠকবর্গকে রেখে তাঁর অধ্যায় শেষ করলেন। এবার এই বোঝা সামলানোর দায় পড়ল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর।

অমলা বিশেষ ধনী। তাঁর রয়েছে, বৃহৎ মোটর। এই মোটরটি অবশ্য হঠাৎ ভুঁই ফুঁড়ে আবির্ভূত হয়নি, হেমেন্দ্রকুমার নিজেই এর আমদানি করে গিয়েছেন। বসন্ত চৌধুরী ত্রিশ লক্ষ টাকা পাওয়ার আগেই নিতান্ত অসচ্ছল ছিলেন না, এবং এ পর্যন্ত যাঁদের যাঁদের সঙ্গে পরিচয় হল তাঁদের কেউই কেরানিগিরি তো করেনই না, এমন কি একজন লেখকও নন। ইতিমধ্যে ত্রিশ লক্ষ টাকার সবটাই ফিক্সড ডিপোজিটে এবং কম্পানির কাগজে বিনিয়োজিত হওয়ার পরও দেখা গেল বসন্ত চৌধুরীর একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রয়েছে এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিন শো বাইশ টাকা। এই টাকা কোত্থেকে বসন্ত চৌধুরী পেলেন তার বিশেষ হদিশ নেই। হয়ত তাঁর পূর্বার্জিত টাকা। কিন্তু তা যদি হবে তার জন্য কোনও ভূমিকা কেউ করেননি। তৎকালীন ইনকাম ট্যাক্স কত ছিল কে জানে, যাই হক, অতগুলি টাকা বসন্ত চৌধুরীর হাতে আসার কোনও কারণ ছিল না। পরবর্তী লেখকগণও এই প্রমাণকে গ্রাহ্য করেননি। বসন্ত চৌধুরীর হঠাৎ পাওয়া ঐ ত্রিশ লাখ টাকাই সকলকে এমন মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল যে এই এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকার ব্যাপারটা কেউ পাত্তা দেননি। বসন্ত চৌধুরীর মত সৎ লোকও কিন্তু ত্রিশ লাখ টাকার আয়ের উপর ট্যাক্স দেননি, এমনকি কোনও সাহিত্যিকই ট্যাক্স প্রসঙ্গ আনেননি।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেই দেন বসন্ত চৌধুরীর ত্রিশ লক্ষ টাকাই আছে, বাড়তি কিছু নেই। তাঁর বর্ণনায় পাচ্ছিঃ "সমস্ত ব্যাপারটার একটা বিস্ময়কর ছেলেমানুষী দেখে সময়ে সময়ে বসন্তর নিজের উপর ঘৃণা হচ্ছিল। ত্রিশ লক্ষ টাকা আর উনিশ বছরের একটি মেয়ে তার মত একজন প্রবীণ লোকের মাথা খারাপ করে দেবে নাকি?" যদি এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশো বাইশ টাকা বসন্ত চৌধুরীর অতিরিক্ত থাকত ঐ ত্রিশ লক্ষ টাকার

উপরও তাহলে উপেন্দ্রনাথের লিখতে হত : "প্রায় বত্রিশ লক্ষ টাকা আর উনিশ বছরের একটি মেয়ে" কিন্তু তিনি তা লেখেননি। আবার ত্রিশ লক্ষ টাকার সবটাই যদি বিনিয়োজিত হয়ে থাকে তাহলে সরাসরি চেক কেটে সে টাকা তোলা যায় না। অথচ চেক কাটার কথা স্পষ্টভাবেই লেখা হয়েছে।

উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর মনের মতো আরও একটি নায়িকা হতে পারে এমন একটি মেয়ে আমদানি করে ফেললেন। এই মেয়েটি দরিদ্র, নাম মঞ্জরী। সঙ্গে মঞ্জরীর মা, দু'জনেই এসে উঠেছেন বসন্ত চৌধুরীর বাড়ি। মঞ্জরীর মা বসন্তর দূর সম্পর্কের বিধবা খুড়শাশুড়ি। মঞ্জরী দেখতে চমৎকার, একটু রঙ বোধ হয় কালো, কিন্তু "ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর এম-এ।" বসন্ত চৌধুরী স্ত্রীর মৃত্যুর পরই এক বিধবা অমলা এবং কন্যা হেনার আবির্ভাব ঘটেছিল, কিছুদিন পরই আবার এক বিধবা এবং তাঁর কন্যা। হয়ত বসন্ত চৌধুরীর রাশি-ফলে লেখা ছিল, সময়টা বিধবা এবং কুমারীময় যাবে।

দরিদ্র হলে কি হবে এই নতুন আমদানি করা এম-এ পাস করা মেয়েটির কিন্তু দারুণ উচ্চাশা। সে চায় বসন্ত চৌধুরীকে দিয়ে তাঁর সমস্ত টাকায় কুমারী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা। হ্যাঁ উপেন্দ্রবাবু বার করেছেন বটে অতগুলি টাকার হিল্লে করার একটা উপায়। হিল্লে করা বা খরচ করিয়ে দেওয়া। আসলে উপন্যাসটি এই টাকার ভারেই যেন মাঝে মাঝে থমকে যাচ্ছে, ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

আর হেমেন্দ্রকুমার রায় বসে বসে নিশ্চয় মজা দেখছেন। বড় রসিক লোক ছিলেন তিনি।

মঞ্জরী তার বক্তব্য প্রকাশ করতে দেরি করল না। সে বলল, "আমার মতলব, আপনাকে দিয়ে বাঙলাদেশে একটা কুমারী আশ্রম খোলানো—যার আপনি হবেন আজীবন বিপত্নীক সভাপতি, আর আমি হব আপনার আজীবন কুমারী সেক্রেটারি।" তার পরই মঞ্জরীর ব্যাখ্যান : "আচ্ছা জামাইবাবু, আমাদের দুর্ভাগ্য বাঙলা দেশে বিধবাদের কথা অনেকে ভেবেছে, বিধবাদের জন্য অনেকে আশ্রম খুলেছে,—কিন্তু কেউ জানে না যে, বাঙলাদেশে বিধবাদের চেয়েও কুমারীদের অবস্থা কত খারাপ!"

কী অসাধারণ সমাজতত্ত্ববিজ্ঞানী মেয়ে, এবং কী আশ্চর্য তার আবদার। বসন্ত চৌধুরীর টাকা আছে বলেই তিনি অন্য কর্মে তা ব্যয় করবেন এই ধারণা কেন মঞ্জরীর হল তা ঠিক বোঝা গেল না।

এই সময় উপস্থিত হল হেনা। জানা গেল খ্রীস্টান হেনা হিন্দু হতে চায়। আবার আরও একটু জটিলতা, একটু ঘুরিয়ে বসন্ত চৌধুরী মঞ্জরীকে করেছেন বিবাহের প্রস্তাব।

এই অবস্থায় উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অধ্যায় শেষ করলেন, শুরু হল পরবর্তী অধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় হলেন যার পরিচালক। সৌরীন্দ্রমোহনও ঐ টাকা নিয়ে বিশেষ কিছু উদ্ভাবন করতে পারলেন না। হেনা এবং মঞ্জরীর ব্যাপাবে বসন্ত ভাবছে, "এ সে কি—ছেলেমানুষী করছে।

··তার বয়স হয়েছে। ত্রিশ লক্ষ টাকা তাকে আর যা-এ এনে দিক, বিগত তরুণ বয়সটাকে ফিরিয়ে এনে দিতে পারবে না। তা যদি সে না পারে ·।" (ডটগুলি সৌরীন্দ্রমোহনেরই নিজস্ব ট্রেড মার্ক।)

সৌরীন্দ্রমোহনের তত্ত্বাবধানে বসন্ত সরলার কথা গভীরভাবে কিছুটা ভাবল। তারপর বসন্তর সঙ্গে মঞ্জরীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে সৌরীন্দ্রমোহন বেশি এগুলেন না। বিয়ে হলেই তাঁর ঝামেলা শেষ হতে পারে, কিন্তু পরবর্তী লেখকদের কথা তো ভাবতে হবে? তাঁদের ডোবানো সৌরীন্দ্রমোহনের ইচ্ছা নয়। সে জন্য সৌরীন্দ্রমোহন উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কুমারী আশ্রম ব্যাপারটি নিয়ে আগ্রহী হলেন। মঞ্জরীকে দিয়ে নাটকীয়ভাবে বলালেন, "আমাকে বিয়ে? অসম্ভব, জামাইবাবু। বিয়ে নয় · কুমারী আশ্রমের স্বপ্নে আমি বিভোর।"

এর পর এলেন প্রবোধকুমার সান্যাল। প্রবোধকুমার অমলা এবং কন্যা হেনার বাড়ির এবং গৃহস্থালির বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, "···বিলেতে থাকতে কিছু টাকা জমিয়েছিলেন। এদেশে জীবনযাপনের পক্ষে সে টাকা নিতান্ত কম নয়। তাঁরা বাসায় দুজন ঝি চাকর ছাড়া তাঁর আর কোনো বাজে খরচ নেই, এবং বিলেতের মতো এখানেও তিনি নিজেই রান্না-বান্না করেন।"

গাড়ির কথাটা ভুলে গেলেন প্রবোধকুমার। এই গাড়িটি হেমেন্দ্রকুমার আমদানি করেছিলেন, তারপর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, "অমলা রায়ের বৃহৎ মোটরখানা।" যাই হক—প্রবোধকুমার সান্যাল খ্রীস্টান হেনার হিন্দু হওয়াকে বাধা দিলেন। হেনা চারুবাবুর কথা মেনে নিলেন। চারুবাবু হলেন চারু ঘোষাল, ওঁর একটা জমি-সমেত বাড়ি কেনার ব্যাপারে আগমন ঘটেছিল এই উপন্যাসে। চারুবাবুর বক্তব্য ছিল মনুষ্যত্বের ধর্ম সকল ধর্মের চেয়ে বড়। হেনা বলছে, "চারুবাবু আমাকে সংশয় আর অশ্রদ্ধা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।"

এর পর এলেন পরিমল গোস্বামী। পরিমল গোস্বামী সতর্ক ব্যক্তি। তিনি মঞ্জরীর মাকে দিয়ে মঞ্জরীর বিবাহ প্রস্তাব করিয়েছেন। বসন্ত চৌধুরীর মনের মধ্যে বিপ্লবও বাধিয়েছেন। "কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেন না।" এবং বসন্ত চৌধুরী "ক্রমেই বুঝতে পারছেন টাকা তাঁর জীবনে বয়ে আনছে শুধু অভিশাপ।"

না। সে-রকম কিছুই কাণ্ড বসন্ত চৌধুরী করেননি। তিনি যা যা করেছেন তা তাঁর পূর্বার্জিত বা সঞ্চিত টাকার সাহায্যেই করতে পারতেন। অমলা হেনার সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হত, আর মঞ্জরীর সঙ্গেও না হওয়ার কারণ ছিল না। বসন্ত চৌধুরী সম্পর্কে পরিমল গোস্বামী খুবই উদার। শ্রদ্ধেয়ও মনে হয়। "টাকার পথে অকারণেই যে-জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে, তার আদৌ কোন মূল্য আছে কি না সেইটে সে বিচার করতে বসল একা ঘরে।" পরিমল গোস্বামীর প্ররোচনায় বসন্ত মনে মনে ভাবল, "হেনা ব্রিটিশ-জাত সাধারণ ইংরেজ কন্যারই মতো, অসাধারণ কিছু নয়। অসাধারণের মধ্যে হয়তো রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসখানার কয়েক অধ্যায় পড়ে থাকবে।"

এবং যে মঞ্জরী অতি আগ্রহী হয়েছিল কুমারী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার জন্য, পরিমল গোস্বামী সেটাকে একেবারেই উড়িয়ে দিলেন। মঞ্জরীকে দিয়েই বলালেন, "কুমারী সঙ্ঘ কথার কোনো মানে হয় ?"

পরিমল গোস্বামীর পর এলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। প্রেমাঙ্কুরবাবুও লিখলেন টাকার ব্যাপারে, "এই অর্থই তার শান্তিময় জীবনে তুমুল ঝড়ের সূচনা করেছে।"

সবই কল্পনা। ঝড় কোথায় ? প্রত্যেকটি লেখকই মনে করছেন ত্রিশ লক্ষ টাকা, অতুল ঐশ্বর্য এবং দুটি অবিবাহিতা মেয়ে—ঝড় উঠবেই। কিন্তু ঝড়ের মেঘ দু একবার দেখা দিলেও ঝড় ওঠেনি। ঝড় পরে উঠেছিল, কিন্তু সে প্রাকৃতিক ঝড়।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তাঁর অধ্যায়ে সুরা প্রেম ঋণ ইত্যাদি নিয়ে একটি কবিতার আমদানি করেছেন, নতুনত্ব এটাই। উপন্যাস যাকে এগুনো বলে, তা একটুও এগোয়নি।

এই ঝামেলার মধ্যে হাল ধরলেন নরেন্দ্র দেব।

এই অধ্যায়ে নরেন্দ্র দেব সুরাপান প্রসঙ্গ এনে ফেলেছেন। যদিও ভূমিকা সৃষ্টি করে গিয়েছেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থীই। যাই হক, এর আগে বসন্ত চৌধুরী মঞ্জরীর পাণিপ্রার্থী হয়েছিলেন এক দুর্বল মুহূর্তে, এখন নরেন্দ্র দেব সেই বসন্ত চৌধুরীকে দিয়েই উনিশ বছর বয়সের হেনার হৃদয়ে হানা দেওয়ালেন, দ্বিতীয়বার বসন্ত চৌধুরী পাণিপ্রার্থী হলেন। এখানে হেনার জ্ঞানগর্ভ বাণী উল্লেখযোগ্য ঃ "—আমার কি ধারণা জানেন ? যৌবনের কোনো নির্দিষ্ট বয়েস নেই। উনিশ থেকে উনচল্লিশের মধ্যে সবাই আমরা সমবয়সী · ।"

পরিমল গোস্বামী কুমারী আশ্রম নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, মনে হয়েছিল ওর আর উদ্ধার নেই, কিন্তু নরেন্দ্র দেব সেটিকে আবার বাঁচিয়ে তুললেন। বসন্তের সঙ্গে মঞ্জরীর কথাবার্তা এখানে উদ্ধার করা দরকার ঃ

—আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না মঞ্জরী। সেদিন যেন আমাকে বলেছিলে ওই আশ্রমটার মূলে কোনো সত্য নেই—ওটা তোমার পরিহাস মাত্র।

—পরিহাসের অন্তরালে অনেক সময়েই আমাদের আত্মরক্ষা করতে হয়।

এর পর মঞ্জরী যা বলল তাতে একটা বিরাট পরিবর্তন এসে গেল উপন্যাসে। যাকে বলে সংঘাত। মঞ্জরী অতি হেলা ভরে তাঁর আশ্রয়দাতা জামাইবাবু বসন্ত চৌধুরীকে বললো, "ও ! আপনি বোধ হয় শোনেননি এখনও ? অ্যাক্ট তিন অনুসারে শীঘ্রই যে আমরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হব।" (সুরেন সেনের সঙ্গে)।

এবং এর পরবর্তী লাইনটি নরেন্দ্র দেবের শেষ লাইন ঃ "ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ বজ্রপাত হলেও বসন্ত বোধ হয় এত বেশি চমকে উঠত না।"

এবার এলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শৈলজানন্দ বললেন, বসন্তর বয়স তেতাল্লিশ। অর্থাৎ গল্পের শুরু থেকে বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। এখানে

মঞ্জরীর ভূমিকা তেজে পরিপূর্ণ। অতি অস্বাভাবিক এবং কিছুটা উন্মাদনার লক্ষণও যেন ফুটে বেরুচ্ছে। যে জামাইবাবুর অত সম্পত্তি, অর্থ—তাঁকে সে বাক্যবাণে করে ফেলল জর্জরিত। সে হঠাৎ যেন একেবারে সর্বহারাদের হয়ে লড়তে লাগল। বসন্ত চৌধুরীকে সে অনেক কথার মধ্যে এও বলল, "মনে হয় বিধাতার একটু কৌতুক করবার লোভ হয়েছিল। মনে হয়েছিল ঘরকুনো, কেতাবে-ঘেরা, স্ত্রী-সর্বস্ব, তেতাল্লিশ বছরের মেরুদণ্ডহীন আর নখদন্তহীন একটা লোককে স্ত্রী-বিয়োগের পর হঠাৎ ত্রিশ লক্ষ টাকা পাইয়ে দিলে তার কি অবস্থা হয় একবার দেখবেন। তা দেখা এতদিনে বোধ হয়—তাঁর হয়েচে। কারণ স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েচে যে তেমন লোকের হাতে টাকা গেলে তা তার দুর্ভিক্ষ, অশিক্ষা, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, মহামারী আর নারী-নিগ্রহে জর্জরিত, মসীকৃষ্ণ, জীর্ণশীর্ণ দেশবাসী, যাদের মাথাপিছু দৈনিক আয় ছ পয়সার বেশি নয়, তাদের দিকে প্রসারিত হতেই পারে না ··।"

দয়ালু ভাল মানুষ জামাইবাবুর প্রতি এই নিষ্ঠুর আক্রমণ পরিচালনা করলেন স্বয়ং শৈলজানন্দ। এর তুলনা কোনও সাহিত্যেই মেলে না। এর পর মঞ্জরীর বক্তৃতা আরও মেঠো হয়ে পড়ে। সে বলতেই থাকে, "···আমি এসেছিলুম ত্রিশ লক্ষ টাকার জরির সাজ পরে আপনি কি রকম সঙ সেজেছেন তাই দেখব বলে।"

সত্যি, হেমেন্দ্রকুমারের দুষ্টু হাসি স্পষ্ট যেন শোনা যায়।

শৈলজানন্দ একটা বিরাট ধাক্কা দিলেন বটে, কিন্তু গল্পের জটিলতা যা ছিল তাই রইল, জটিলতরও হল না, বা অগ্রগতিও বিশেষ ঘটল না।

এবারে ভার পেলেন বনফুল।

বনফুল নিয়ে এলেন সত্যিকারের এক বিদেশিনী, মিস জ্যাকোবাইন। কোটিপতি মহিলা, পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছেন, অমলার সঙ্গে বিলেতে আলাপ ছিল। ঘোষালের জমি জায়গা সব কিনবার টাকা উনি দেবেন। অ্যামেরিকার মিশন থেকে লোকজন আসবে, তারপর কুমারী আশ্রম গড়ে উঠবে।

কুমারী আশ্রম। যে প্রস্তাব একবার উত্থাপিত হয় পরে সেটিকে হেসে উড়িয়ে দেয় উত্থাপনকারিণী নিজেই। পরে ঐ কুমারী আশ্রম আবার উদিত হয় বনফুলের সাহায্যে।

অ্যামেরিকান ধনী মহিলার দ্বারা অর্থকষ্টও মেটে। কিন্তু কুমারী আশ্রম প্রতিষ্ঠা যিনি করতে চেয়েছিলেন, সেই মঞ্জরীকে বনফুল পাঠিয়ে দিচ্ছেন রতনপুরে স্কুল-মাস্টারীর কাজে। মাইনে চল্লিশ টাকা। বৈপ্লবিক বনফুলের উপযুক্ত কর্মই সেটা।

মঞ্জরী সুরেনকে বিয়ে করছে না। বনফুল মঞ্জরীকে মিথ্যেবাদী বানিয়ে দিলেন। মিথ্যে কথা বলে যে ভাল কাজই করেছে সেটাও মঞ্জরীর বয়ানে বনফুল বেশ সাহসের সঙ্গেই বললেন। তবে, এই মিথ্যে তো চাউর হয়ে যাবে তখন? অতএব মঞ্জরী রতনপুর যেদিন যাওয়ার কথা তার চারদিন আগেই নিঃশব্দে কাউকে না বলে চলে গেল।

যে ঘটনার পর এক বছর চলে গিয়ে বসন্তর বয়স হয়েছে তেতাল্লিশ, সেই সময়ে হেনার বয়স কিন্তু উনিশ থেকে আর একটুও বাড়েনি, সেই একই রয়েছে। তা মেয়েদের বয়সে ঐ রকম একটা ব্যাপার ঘটেই থাকে।

কিন্তু হেনাকে বিয়ে করার জন্য যে 'এনগেজমেণ্ট' আংটি বসন্ত চৌধুরী নিয়েছিলেন, সেটি তিনি অতঃপর ভূমিকা না করেই কেড়ে নিলেন। যে নাটক শুরু হয়েছিল, সেটি অকস্মাৎ আবার ভেঙে পড়ল। বসন্ত ট্যাক্সিতে চললেন রতনপুর। সেখানে ইস্কুলে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করবেন এই প্রতিশ্রুতি দিলেন। এখানেই মঞ্জরী আসবে টিচার হয়ে। বনফুল খ্রীস্টানের সঙ্গে বসন্তর বিয়ে দেবেন না।

এটা ভালই হল যে অতঃপর উপন্যাসের অগ্রগতির ভার পড়ল বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। একে গ্রাম, তায় ইস্কুল—আর বিভূতিবাবুর কি চাই? এই প্রথম বেশ চুটিয়ে প্রবেশ করল রুক্ষ অক্ষরের মধ্যে প্রকৃতি! "বোধ হয় কারো পুরনো পরিত্যক্ত বাড়িতে স্কুলের টিচারদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। জানালা দিয়ে জলবিচুটির লতা ঘরে ঢুকতে চাইছে। ঘরের পেছনটাতে ঘন আগাছার জঙ্গল, একটা কাঁঠাল গাছ, একটা ডুমুর গাছ, আরও কি কি বড় গাছ—সবশুদ্ধ মিলে জায়গাটা যেন ঝুপসি মত। এমন জায়গায় মঞ্জরী কখনো থাকেনি একা···।"

এই অধ্যায়টিই পঞ্চদশীর সবচেয়ে বাস্তব, সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে শান্ত এবং বাস্তবানুগ।

বসন্ত চৌধুরী এই রতনপুরেও এলেন, এবং এইটুকুই বিভূতিভূষণ জানিয়ে তাঁর অধ্যায় শেষ করলেন। গল্প যাকে এগিয়ে যাওয়া বলে সেটাও মোটামুটি মন্দ হল না। এর পরবর্তী পরিচালক হলেন সজনীকান্ত দাস।

বিভূতিভূষণ দয়াপরবশ হয়ে মঞ্জরীকে দিয়েছিলেন আশ্রয়। বসন্ত চৌধুরীকে দিয়ে ঐ স্কুলকে এক লক্ষ টাকা পাইয়েও দিয়েছিলেন যাতে দরিদ্র টিচারদের অবস্থার উন্নতি হয়। আর হেড-মিস্ট্রেস হিসেবে যাতে মঞ্জরীর মাইনে হয় দুশো টাকা। বেশ নিশ্চিন্তেই বিভূতিভূষণ ছিলেন, যে মাইনে পাওয়ার স্বপ্ন বিভূতিভূষণ দেখতেন সেই মাইনে তিনি কলমের খোঁচায় স্থির করলেন, কিন্তু সজনীকান্ত দাস তা হতে দিলেন কই?

মঞ্জরীকে আবার পথে বার করে দিলেন নিষ্ঠুর সজনীকান্ত।

এবারে তিনি আশ্রয় নিলেন রুদ্র প্রকৃতির। যে শান্তশিষ্ট প্রকৃতি বিভূতিভূষণ আনলেন তার প্রতি বিন্দুমাত্র করুণাও প্রকাশ করলেন না সজনীকান্ত। হঠাৎ এনে ফেললেন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে নিদারুণ ঝটিকাবর্ত।

এই ঝড়ের আগমনে একটা সমস্যার সমাধান হল মনে করলেন সজনীকান্ত এবং বসন্ত চৌধুরী। ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করার এই সুযোগ। "কারেন্সি নোটের কার্পেটটা নিশ্চিহ্নে বিদায় করার এই সুযোগ।"

কিন্তু এর মধ্যে এক লক্ষ টাকা স্কুলে দান করা হয়ে গেছে। টাকার হিসেব ঠিক মিলছে না। তার উপর বসন্ত চৌধুরী যখন ভাবছেন ধুলো মাটির ওপর

দাঁড়িয়ে আবার নতুন করে জীবন শুরু করবেন তিনি। নিজের অন্ন নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংগ্রহ করবেন।

কিন্তু ত্রিশ লক্ষ টাকা কোনও সময়েই সমস্যা হয়ে উঠেছিল কি বসন্তের জীবনে? যাঁর তিনখানা বাড়ি কলকাতায় এবং সরলার মৃত্যুর পর মাত্র এক ভৃত্য নিয়ে সংসার, তাঁর নিজের অন্ন নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সংগ্রহ করার কথা ওঠে কোত্থেকে? তা ছাড়া তিনি গুণী ব্যক্তি, পড়াশুনা করলে যাঁর মন ভাল থাকে, ভাল আয় সত্ত্বেও তাঁকে খাদ্যের কথা ভাবতে হবে কেন, অহেতুক?

আসলে, ঐ ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়ে কি করা যায়—অর্থাৎ কত আনন্দ মজা করা যায় বা নিজের জীবনের নিরাপত্তা আনা যায় সেটা সজনীকান্ত ভাবতেও পারেননি। বসন্তর একটি সাপ্তাহিক বা দৈনিক সংবাদপত্র তৈরি করার কথাও কেন মনে হল না, কিংবা একটি নিদারুণ মাসিক সাহিত্যপত্র? এত জন লেখকেব কারুরই মনে হল না সেটা?

যাই হক, সজনীকান্ত বসন্ত চৌধুরীকে দানবীর এবং সমাজসেবক করে তুললেন। জনসেবার জন্য তিনি গেলেন এবং "নগ্নপদে সিক্ত ক্লান্ত দেহে ঝটিকা বিধ্বস্ত অঞ্চলে ঝড়ের মত ঘুরে বেড়িয়ে দরিদ্র বিপন্নের সাক্ষাৎ বাপ মায়ের মর্যাদা পেয়েছেন।" কিন্তু তাতেও শেষ হয় না বসন্ত চৌধুরীর মহত্ত্ব। তিনি অসুস্থ হয়ে ভোলা হাসপাতালে পড়ে রইলেন, এদিকে কলকাতায় হেনা দেবী, চারু ঘোষাল এবং মিস জ্যাকোবাইন কুমারী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। যে কুমারী আশ্রম একদা ইয়ার্কি বলে ঘোষণাই করা হয়েছিল। মূল পরিকল্পনাটি অবশ্য মঞ্জরীর।

সজনীকান্ত হাসপাতালে আরও দুজনকে পাঠালেন, তবে রোগী হিসেবে নয়। এই দুজনকে আমরা চিনি। একজন ভৃত্য নিধিরাম অন্য জন মঞ্জরী। হাসপাতালের অনুমতি নিয়ে মঞ্জরী বসন্ত চৌধুরীর সেবা করার সুযোগ পেল, এবং সেখানে গভীর রাত্রে একটি আরসোলা এসে মঞ্জরীকে ভয় পাইয়ে দিলে "শিয়রে বসা" মঞ্জরী একেবারে রোগীর বুকে বাবা রে বলে আছড়ে পড়ল। দারুণ সিচুয়েশন। ভেবে দেখুন দৃশ্যটা—শিয়রে বসা শিউরে ওঠা মঞ্জরী একেবারে মাথার কাছ থেকে রোগীর বুকে আছড়ে পড়ল!! সজনীকান্ত এই ধরনের নানা ঘটনা শনিবারের চিঠিতে লিখে একদা ইয়ার্কি করেছেন, কিন্তু এটি তিনি করলেন ঠাণ্ডা মাথায়।

তিনি দুটি কাজই অবশ্য করলেন যার পর আর কিছু করার ছিল না। তিনি সমস্ত টাকা বিলিয়ে দেওয়ালেন বসন্ত চৌধুরীকে দিয়ে এবং মঞ্জরীকে সেই ভোলায় পাঠালেন, প্রজাপতি নয়, মিলন ঘটালেন আরসোলাকে দিয়ে। এটাই এই উপন্যাসের সবচেয়ে বড় চমকপ্রদ ঘটনা।

হেমেন্দ্রকুমার বোধ হয় অট্টহাস্য করে উঠলেন। এর পর আর কি করা সম্ভব? এবারে ভার পড়ল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর। তারাশঙ্কর অবশ্য হাতে পেলেন "অর্থহীন" বসন্ত চৌধুরীকে। এবং আরসোলার দ্বারা

যে বন্ধন রচিত হয়েছিল সেটিকে সমীহ করলেন, দুম করে আবার অন্য কিছু করে বসলেন না। তারাশঙ্কর বসন্ত চৌধুরীকে রোগমুক্ত করলেন, শয্যাশায়ী করে রাখলেন না, বা একেবারে মেরেও ফেললেন না। আর অচেনা অঞ্চল পূর্ববঙ্গেও বেশিক্ষণ রাখতে পারলেন না।

অর্থহীন বসন্তকে ফিরতি স্টিমারের ক্যাবিনে তারাশঙ্কর কবিই বানিয়ে দিলেন।

কিন্তু কলকাতায় বসন্ত ফিরে এলেন তাঁর নিজেরই বাড়িতে। যাক সজনীকান্ত এবং তারাশঙ্কর ঐটুকু দয়া করেছেন, পুরনো সম্পত্তিগুলো ঝটিকা বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য দান করেননি। না, বসন্তর এটুকু বুদ্ধি ছিল বই কি!

কিন্তু গল্পের গতি যে ঘুরপাক খাচ্ছিল নানা পথে তার সুবাহা কিছু যে হল না? তারাশঙ্কর সজনীকান্তর মত চমৎকার আরসোলার বন্ধনকে বেশি পাকা হতে দিতে রাজি নন। এদিকে বসন্ত সমস্ত টাকা দান করে ফেলেছেন এবং তারাশঙ্কর তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রেখেছেন মাত্র পাঁচশো টাকা! এটা যে একেবারেই ঠিক হয়নি তারাশঙ্করের। মাত্র পাঁচশো টাকা? তবে এই টাকা তারাশঙ্কর যে-ভাবে ব্যবহার করতে পারতেন, (কিংবা সজনীকান্ত এবং অন্যান্য উল্লিখিত প্রায় সকলেই) ত্রিশ লক্ষ টাকা তিনি ব্যবহার করতে পারতেন না। কেবল তাই নয়, ব্যাঙ্কে পাঁচশো টাকা থাকলেও বসন্ত চৌধুরীর উপর তারাশঙ্কর হাজার খানেক টাকা দেনার বোঝাও চাপিয়ে দিলেন। এ রকম জীবন তারাশঙ্কর দেখেছেন, অতএব এই নিষ্ঠুরতায় তাঁর হাত কাঁপল না একেবারে। সজনীকান্ত যেখানে বসন্ত চৌধুরীর সমস্ত টাকা বিলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন—সেটাই এক করুণ ব্যাপার, সেখানে তারাশঙ্কর আরও এক কাঠি উপরে গিয়ে বসন্ত চৌধুরীকে আরও বিপন্ন করে তুললেন। হেমেন্দ্রকুমার নিশ্চয় এবারে চমকে গেলেন। তাঁর হাসি কি একটু মিলিয়ে গেল? এত সহজ সমাধান?

কিন্তু তারাশঙ্কর জটিলতা আনলেন ব্যাঙ্কের ব্যালান্স দেখিয়ে। তারপর আরও দেখালেন পৈত্রিক দুখানা বাড়ি থেকে ভাড়াব বিষয়টি। তিনখানা বাড়ির একটিতে নিজে থাকেন। এর পর দেখালেন হাজার বিশেক টাকার শেয়ার, যার বাজারদর দশ হাজার টাকার বেশি হবে না। বসন্ত সাব্যস্ত করল শেয়ার বেচে দেবে, বেচে দেবে একখানা বাড়িও।

কিন্তু বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে আরসোলার ঘটকালি এবং অন্যান্য নানা ইতিবাচক ইঙ্গিত সত্ত্বেও তারাশঙ্কর স্থির করলেন বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে মঞ্জরীর যা হবার হয়ে গেছে সে দায়িত্ব তাঁর নয়, কিন্তু তিনি নিজের হাতে বিয়ে দিতে পারবেন না। অতএব বসন্ত চৌধুরী তারাশঙ্করের নির্দেশে স্থির করলেন মঞ্জরীর সঙ্গে বিয়ে হবে সুপাত্রের। যার ব্যবস্থা করবেন স্বয়ং বসন্ত চৌধুরী।

কিন্তু এর পর এক মোক্ষম আচরণ মঞ্জরীর। সে সরলার মত সাধারণ

শাড়ি এবং সজ্জায় এসে উপস্থিত হয়ে বসন্ত চৌধুরীকে একেবারে যেন ভিরমি খাইয়ে দিলেন। মঞ্জরীর ঐ বেশে আসা এবং বলা, "ভয় পাবেন না, দিদি নয়, আমি মঞ্জরী।"

এবার প্রবেশ করলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। নরেশচন্দ্রের অত সমস্যা নেই। ত্রিশ লক্ষ টাকা তাঁর ঘাড়ে ঝুলছে না। হেনা চলে গেছে, হেনার মা-ও। এখন কেবল বসন্ত, নিধিরাম, মঞ্জরী এবং মঞ্জরীর মা। এঁদের দুজন অনাবশ্যক। সমস্যা নেই। আর বাকি রইল মঞ্জরী। বসন্ত এবং মঞ্জরীর জটিলতা আর কত হতে পারে?

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তই কিন্তু সমস্ত সমস্যার সমাধান করবার মালিক। তিনি যা করবেন তাই হবে, পঞ্চদশ অধ্যায় এসে গেল। এর পর আর কেউ উপস্থিত হয়ে উপন্যাস উদ্ধার করবেন না। সমস্যাটা নরেশচন্দ্রের পক্ষে খুব জটিল হওয়ার কথা নয়, সমাধানও নয়। সিন্দবাদের বোঝা আর কারুর উপর চাপাতে হবে না। তাঁকেই কিছু একটা করতে হবে।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গোটা ব্যাপারটাকেই একটা হাসির ব্যাপার বলে মনে করলেন। কিন্তু নিজে সে-কথা বলতে পারলেন না, তিনি সেটি বলালেন বসন্ত চৌধুরীকে দিয়েই। বসন্ত চৌধুরী বলছেন, "তার মনে হল, মানুষ যে সব কথা নিয়ে দুঃখ করে তার সবগুলোই এমনি তুচ্ছ যে রসিক যে, সবই সে হেসে উড়িয়ে দিতে পারে। এই ত্রিশ লক্ষ টাকা পেয়ে তার জীবনে এই কটা দিনের মধ্যে যে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়ে গেল, যার শেষে তার চিত্ত সেই বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালির ঝটিকা বিধ্বস্ত দেশের মত চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হাস্য-রসিকের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলে এও একটা হাসির কথা।" এই কটা দিন কথাটা অবশ্য ঠিক নয়। এই কটা মাস বললেই ঠিক হত, কিন্তু এটা ভাবের কথা, ঘটনার বিবরণ নাও হতে পারে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় যে হাসবার খোরাকের জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন বসন্ত চৌধুরী, হঠাৎ পাওয়া ত্রিশ লক্ষ টাকা ইত্যাদি, সেটি বোধ হয় নরেশচন্দ্রই ধরে ফেলেছিলেন। মন্তব্য করেছেন নরেশচন্দ্র, বসন্ত চৌধুরীর বমুখে (বকলমে হলে বমুখ হয় না কি ?) "হাসির উপাদানের অন্ত নেই এর ভিতর।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটালেন তিনি অহাস্যকর একটি ব্যাপার। বসন্ত চৌধুরী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি পেলেন, তা অধ্যাপনা, দরোয়ানি কিংবা কেরানিগিরি তা বোঝা গেল না।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত বসন্ত চৌধুরীকে মহান করে তুললেন। তাঁর বসত বাড়ি মঞ্জরীর মায়ের নামে দানপত্র রেজিস্ট্রি করে দিলেন, আর বাকি বাড়িগুলি সুরেন সেনের নামে ট্রাস্ট ডিড করে দিলেন, তার আয় থেকে মঞ্জরীর বিয়ের প্রচুর যৌতুক ও তাকে একটা আজীবন বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা হল। বসন্তকে নিঃস্ব না করা পর্যন্ত যেন নরেশচন্দ্র স্বস্তি পাচ্ছিলেন না।

এখানেই উপন্যাসটি শেষ হতে পারত, কিন্তু নরেশচন্দ্রও কম লেখক নন। সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করার পর বসন্ত চৌধুরী যখন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন

বলে মনে হচ্ছে সেই সময় অকস্মাৎ তিনি এক আঘাত হেনে বসলেন।

মঞ্জরী বাড়ি থেকে বিনা বাক্যে বেরিয়ে গিয়েছে, এই খবর পেলেন বসন্ত চৌধুরী। যে দলিল দুটি তিনি মঞ্জরীকে দিয়েছিলেন সেগুলিও সে ফেলে গেছে।

বসন্ত চৌধুরী অতঃপর কি করলেন জানা যায় না। কাশীতে তাঁর যাওয়া হয়েছিল কি না তাই বা কে জানে? কাহিনীর ইতি হয়ে গেল।

হেমেন্দ্রকুমার এতে কি বলেছিলেন, কি ভেবেছিলেন জানা যায় না।

কোনও পাঠক পাঠিকা বা সমালোচক কিছু বলেছিলেন কি না তারও খোঁজ নেই, অন্তত আমার জানা নেই।

যতদূর মনে হয় কেউই এই উপন্যাসটিকে উল্লেখযোগ্য বলে ভাবেননি। বেতারতরঙ্গ যেমন মুহূর্তে উঠে মুহূর্তে মিলিয়ে যায় এও সেই রকম একটা ব্যাপার।

তবু মনে হয় এর মধ্যে পাওয়া যায় তৎকালীন একটি চিত্র। দলিল চিত্র নয়, দৈনন্দিন বাজার দরের কোনও কথা নেই। এক জায়গায় মাত্র বালিগঞ্জের জমির দাম বাড়ছে বলা আছে, দামও দেওয়া আছে। একটি বাগানবাড়ি বালিগঞ্জে, হট হাউস সমেত যার দাম বলা হচ্ছে চল্লিশ হাজার টাকা। স্কুল টিচারের (হেড-মিস্ট্রেস) মাইনে মাসে চল্লিশ টাকা। শৈলজানন্দ জানিয়েছেন দেশের সাধারণ মানুষের দৈনিক আয় গড়ে ছ পয়সা! কিন্তু কি চিত্র পাওয়া যায়? লেখকেরা ছিলেন অতি মাত্রায় যাকে বলে রক্ষণশীল। এর মধ্যে প্রেম এসেও আসেনি, দৈহিক ব্যাপার তো প্রায় অনুপস্থিত। অবশ্য বেতার কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞাও নিশ্চয় ছিল। তখন যুদ্ধ বেধেছে, একটি কথাও নেই সে নিয়ে। সায়েব বিরোধী কথা নেই, স্বদেশী কোনও রাজনৈতিক পরিবেশ নেই। নেই, নেই-এর অন্ত নেই। এটাই বোধ হয় সেই ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত যুগে, ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত মিডিয়ায় স্বাভাবিক ছিল, যেমন স্বাভাবিক আজকের বেতারে, টি ভি-তে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা না করা।

যাই হক, একটু মজার দৃষ্টিতে দেখলে এই অতি সাধারণ উপন্যাসটি থেকে রসিকজন আহরণ করতে পারেন চিন্তার নানা খোরাক! এই কারণে, তৎকালীন প্রকাশক 'বাণী-ভবন'কে জানাই ধন্যবাদ। তাঁরা এ বইটি না ছাপলে আমার পক্ষে এই লেখাটি লেখাই যে সম্ভব হত না।



মন্ত্রমুগ্ধ পাঠক

লেখকরা বড় হন কিসে ? কেমন করে পাঠকদের তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন—কেবল তৎক্ষণাৎ নয়, লেখার পর দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ কিংবা একশ বছর পরও ? এর অনেক কারণের মধ্যে একটি হল হিপ্নোটিজম। ঐ যে আগে বলেছি মন্ত্রমুগ্ধ করার কথাটা, অনেক কারণের মধ্যে, ওটা একটা বড় কারণ। হিপ্নোটিজম না করলে এত মানুষ কেমন করে কতকগুলি কথা সাজানকে এত বড় মনে করেন ? হিপ্নোটিজমের একটা প্রমাণ হল যা নেই তা বিশ্বাস করা, ত্রুটিপূর্ণ কোনও জিনিসকে ত্রুটিহীন মনে করা। যেখানে চেয়ার নেই, সেখানে সম্মোহন করে বুঝিয়ে দেওয়া সেখানে চেয়ার আছে, এবং বসতে গেলেই অবশ্য টের পাওয়া যায় চেয়ার নেই। কিন্তু সম্মোহিত ব্যক্তির তাতে কিছু এসে যায় না। তিনি কিন্তু ধরেই নেন চেয়ার আছে। দু-এক জনের মোহভঙ্গ হয় না তা নয়, কিন্তু অধিকাংশই মন্ত্রমুগ্ধ হয়েই থাকেন, এবং হয়ত থাকতেও চান ! অপটিকাল ইলিউশন দু ভাবে করা যায়—এক নানারকম যান্ত্রিক কারসাজিতে, অন্যটি হল অন্যের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন সফল গুরু, রাজনীতিবিজ্ঞ, কখনও কখনও দোকানদারও। বাক্যের পর বাক্য সাজিয়ে তাঁরা যা বলেন তার মূলে বাস্তবতা থাকার দরকার নেই মোটেই—লোকেদের বিশ্বাসের সঙ্গে সর্বদা বাস্তবের মিল থাকেও না। সফল গুরু, রাজনীতিজ্ঞ এবং দোকানদারের মতই কিন্তু লেখকদেরও অনেক সময়েই বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক কিছু থাকে না, কিন্তু তা না থাকলেও সেটাই সত্যি বলে মেনে নিতে কষ্ট হয় না। সত্যি বলে মেনে নিতে কেবল কষ্ট হয় না যে তা নয়—ওটাই যে সত্যি, এবং মিথ্যে কখনই হতে পারে না এই ধারণাটাও পাঠকদের হতে থাকে। ঐ একই কারণে একজন নামকরা বড় ডাক্তারের সাধারণ ওষুধে বহু রোগীর অসুখ সারে, আবার তাঁরা প্ল্যাসিবোর সাহায্যেও রোগীকে আরোগ্য করেন ! প্ল্যাসিবো হচ্ছে ওষুধের মত দেখতে ক্যাপসুল, বড়ি, কিংবা ইনজেকশন, অথচ তাতে ওষুধ কিছুই থাকে না ! মানুষের মন বড় জটিল !

বড় ডাক্তার যখন বলেন, ও কিছু না, আপনার কিছু হয়নি। তখন রোগীর মন এমন ভাল হয়ে যায় যে তার প্রভাবে সত্যি অসুখ থাকলেও তা সেরে যায় অনেক সময়। সারতে সাহায্য তো করেই। যাই হোক এত কথা বলার কারণ, আমরা মন্ত্রমুগ্ধ পাঠক মন্ত্রমুগ্ধই হতে চাই, দরকার কি বাবা ভেতরে ঢোকার! ভেতরে ঢুকে জেনে শুনে মন খারাপ করানোর দরকারটা কি?

পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করার ক্ষমতা বড় বড় সাহিত্যিকদের থাকে, এমনকি তথাকথিত ক্ষুদ্র সাহিত্যিকেরও থাকে। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত রহস্যঘন মোহন সিরিজের শশধর দত্তের লেখার মধ্যে অসম্ভব ঘটনা অনেক কিছু থাকলেও পাঠকদের কিছু এসে যেত না। মন্ত্রমুগ্ধ হবার জন্য ঘটনার অসঙ্গতি কোনও বাধাই নয়। একটি গল্পে, মনে আছে, মোহনকে রেঙ্গুনের কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়, কিন্তু মোহনকে কারাগারে রাখা কার সাধ্য? মোহন তার ঘরের মেঝে ফুটো করে একটা সুড়ঙ্গ খোঁড়ার ব্যবস্থা করে ফেলল। আর সে কি যে-সে সুড়ঙ্গ? একেবারে (যতদূর মনে পড়ে) রেঙ্গুন থেকে কলকাতা পর্যন্ত! কলকাতার পাতাল রেল কর্তৃপক্ষ কৌশলটা জানতে পারলে কি আর ১৯ কিলোমিটার সুড়ঙ্গ খুঁড়তে এত বছর আর হাজার কোটি টাকা খরচ করতেন? এত লোক লাগাতেন? যাই হোক, এই অবাস্তবতার জন্য কিন্তু শশধর দত্তের বইয়ের কাটতি বা সুনাম কোনটাই ক্ষুণ্ণ হয় নি। যদি হয়েও থাকে তা অতি সামান্য!

এবারে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্রমুগ্ধ করার একটি অসাধারণ উদাহরণ দিই। বঙ্কিমচন্দ্র যে কেবল সাধারণ পাঠকদের মুগ্ধ করেছেন তা নয়। গত দেড়শ বছরেরও বেশি আগে তিনি জন্মেছেন এবং বলা যায় একশ পঁচিশ বছর ধরে শিক্ষিত বাঙালীদের মনোরঞ্জন করে এসেছেন। আজও তাঁর বই বিক্রি হয় হাজারে হাজারে। কেবল তাই নয়, তিনিই একমাত্র লেখক যিনি লেখক হয়েও ঋষি! এঁর অনেক লেখাতেই অল্পবিস্তর অসঙ্গতি আছে, একটু চেষ্টা করলেই সেগুলির সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কেবল ঐতিহাসিক কাহিনীতে নয়, সাধারণ বর্ণনাতেও এমন সব ব্যাপার আছে যা হিসেব করতে গেলে ঝামেলায় পড়তে হয়। আমি সব উদাহরণ দেব না, কেননা সব উদাহরণ সংগ্রহ করা আমার বিদ্যায় কুলোবে না। এবারে একটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। পাঠকগণ! আপনারা আগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাটি পড়ুন। এটি দেবী চৌধুরাণী থেকে উদ্ধার করছি ঃ

দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশ হাজার লোকে একবার "দেবী রাণী কি জয়" বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। তারপর দশ জন সুসজ্জিত যুবা অগ্রসর হইয়া মধুর কণ্ঠে দেবীর স্তুতি গান করিল। তারপর সেই দশ সহস্র দরিদ্রের মধ্য হইতে এক এক জন করিয়া ভিক্ষার্থীদিগকে দেবীর সিংহাসন সমীপে রঙ্গরাজ আনিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ, সেও প্রণাম করিল—কেন না, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভগবতীর অংশ, লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা।...

দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লইয়া, যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেই রূপ দান করিতে লাগিলেন। নিকটে টাকা পোরা ঘড়া সব সাজান ছিল।

এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেবী দরিদ্রগণকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া এক প্রহর রাত হইল। তখন দান শেষ হইল। তখন পর্যন্ত দেবী জলগ্রহণ করেন নাই।

সাধারণ পাঠক! অসাধারণ পাঠক!! এবার আসুন একবার উপরে উদ্ধার করা বাক্যাবলীর তাৎপর্য একটু হৃদয়ঙ্গম করা যাক। আশা করি আপনারা আমাকে এই সময়টুকু দেবেন। এর মধ্যে কতকগুলি ব্যাপার আছে যা তর্কের ব্যাপার হলেও একেবারে অমীমাংসেয় নয়। একটি একটি করে তর্ক এনে সেগুলির মীমাংসা করা যাক। আমার সিদ্ধান্তই যে মেনে নিতে হবে তা বলি না, কেবল সাধারণ এবং অসাধারণ পাঠকবৃন্দকে আমার মীমাংসা বিবেচনা করে দেখতে অনুরোধ করি।

প্রথমে দেখা যাক সময়। দেবী চৌধুরাণী "প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত"। কিন্তু ঘণ্টার হিসেবে কতখানি? প্রাতঃকাল কটা থেকে শুরু? এখানে ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রাতঃ সূর্য প্রভাবিত (এ কথাটিও দেবী চৌধুরাণীতে আছে), সকাল ছটার আগে নয়। এই সময়টিই সুবিধার জন্য ধরে নিচ্ছি। সকাল ছটা থেকে "সন্ধ্যা অতীত হইয়া এক প্রহর রাত হইল" অর্থাৎ, সন্ধ্যে ছটার পরও এক প্রহর অর্থাৎ তিন ঘণ্টা। সব সমেত পনের ঘণ্টা। এই সময়টির কথা সাধারণ এবং অসাধারণ পাঠকবৃন্দকে মনে রাখতে বলি। মনে রাখতে বলি, কেননা এটি আমার বক্তব্যের সমর্থনে ব্যবহার করব।

দ্বিতীয় আরও একটি বিষয় আপনাদের স্মরণে আনতে চাই সেটি হল দরিদ্র সংখ্যা। সংখ্যাটি হল পুরো দশ হাজার! ন হাজার আটশ ছিয়াশী নয়, ন হাজার নশ বত্রিশ বা কোন রকম ভগ্নাংশ নয়, সরল সহজ একেবারে দশ হাজার। এটা এমন কিছু অবিশ্বাস্য নয়—ন হাজার আট শ ছিয়াশীও যেমন একটি সংখ্যা, দশ হাজারও তাই, আপত্তির কি আছে? আপত্তি তাই তুলছিও না। কিন্তু কথাটি স্মরণ রাখবেন।

আরও স্মরণ রাখবেন (দয়া করে) দেবী চৌধুরাণীর সাঙ্ঘাতিক মনোবল। সচরাচর এমনটি দেখা যায় না। তবে দেবী চৌধুরাণীর মত নারীও তো সচরাচর দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র এঁর কথা না লিখলে এঁকেও আমরা দেখতে পেতাম না। এই সাঙ্ঘাতিক মনোবল ছিল বলেই তিনি অনেক কিছুই করেছেন, তার পরিচয় সমস্ত উপন্যাস জুড়েই রয়েছে। তাঁর বিশেষ মনোবলের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে যেটুকু উদ্ধার করেছি তাতেই। তিনি দশ হাজার দরিদ্রকে প্রত্যেককে তাঁর সামনে আনিয়েছেন এবং এক সঙ্গে ভেড়া বা ছাগলের পালের মত একশ-দেড়শ করে নয়, এমনকি ডজন ডজন করেও নয়, বুদ্ধিমান পাঠক পাঠিকাবৃন্দ লক্ষ্য করুন, বঙ্কিমের কথায়, "এক এক জন করিয়া"। এটা মনোবলের প্রমাণ নয়—মনোবলের প্রমাণ "দেবী সকলকে মধুর ভাষার

সম্বোধন করিয়া, তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন।" মধুর ভাষায় কথাটা সবিশেষ লক্ষণীয়। আমি আপনি হলে প্রথম ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন পর্যন্ত মধুর ভাষা ব্যবহার করতে পারতাম। তারপর থেকে মধুর কণ্ঠ ক্রমশ এদিক-ওদিক হতে থাকত। তারপর একশর পর থেকে গলার আওয়াজ আর মেজাজ দুটিই খাট্টা হতে থাকত, কেননা আমার আপনার এমন খাটা খাটুনিতে অভ্যেস নেই যে। আজকের দিন হলে অবশ্য প্রথম দিকের কণ্ঠস্বরের টেপ করে তাই দশ হাজার বার শোনানো যেত, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে টেপ ছিল না, যদিও টমাস আলভা এডিসন বোধহয় প্রথম রেকর্ড বাজিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই, কিন্তু সে অন্য ব্যাপার। যাই হোক, সকাল ছটা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত এক নাগাড়ে কথা বলেও দেবী চৌধুরাণী ক্লান্ত হন নি বোঝা যায়, কেননা, ক্লান্ত হলে আর যে কণ্ঠ মধুর থাকে না! এটুকু বলা যায় যে এক নাগাড়ে পনের ঘণ্টা বসে থাকা কিংবা দাঁড়িয়ে থাকা অত্যন্ত অসম্ভব না হলেও ব্যাপারটি যে অতীব দুরূহ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেবল তা তো নয়, এই সঙ্গে আরও একটি বিষয় বিশেষ দ্রষ্টব্য, সেটি হল সকাল থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত কিছু খাননি তো বটেই এমনকি "জলগ্রহণও" করেন নি। ক্রমাগত কথা বলেছেন, শুনেছেন, বিচার করেছেন এবং লোকেদের অবস্থা অনুযায়ী টাকা বিলি ব্যবস্থা করেছেন। এ এক অসাধারণ ব্যাপার।

এবার তর্ক হবে, কেন, একজন লোক এটা করতে পারেন এটা কি অসম্ভব একেবারেই? এর উত্তর—না। কারুর কারুর অমানুষিক শক্তি থাকে বটে। এ নিয়ে তর্ক বেশিদূর করতে চাই না। কেউ বিশ্বাস করবেন কেউ করবেন না। কিন্তু এবারে আসা যাক আসল প্রশ্নে। যে প্রশ্নটি নিয়ে খুব বেশি বিতর্ক হবে না বলেই আমার ধারণা। সেটি হল সময়ের প্রশ্ন। মনে করুন দেবী চৌধুরাণী মঞ্চে উপবিষ্টা, (বা দণ্ডায়মান) তাঁর সামনে এক জন এক জন করে দরিদ্র লোক আসছেন। তাঁরা মঞ্চে আসার পর এই কথোপকথন হতে পারে বলে যদি ধরে নিই তাহলে আশা করি তাঁদের আপত্তি হবে না। সঙ্গে সম্ভাব্য সময় কতখানি লাগছে সেটাও আমার আন্দাজমত দিচ্ছি।

১) মঞ্চে ওঠা (১২ সেকেণ্ড)

২) ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম : (১৭ সেকেণ্ড)

৩) দেবী চৌধুরাণী : নাম? (২ সেকেণ্ড)

৪) ব্যক্তি : শ্রী মানিকচন্দ্র দেবশর্মা। (৩ সেকেণ্ড)

৫) দেবী চৌধুরাণী : আপনার বাড়িতে কে আছেন? (৪ সেকেণ্ড)

৬) ব্যক্তি : এক পিতামহ, তিন মাতামহী, এক পিতামহ, চার মাতামহী, তিন স্ত্রী, দুই ভ্রাতা, তিন বোন তাদের মধ্যে একজন বিবাহিত কিন্তু স্বামী বিতাড়িতা, আমার নিজের সন্তান সংখ্যা পাঁচ, আমাদের আয় প্রায় নেই। বছরে তিন মাস না খেয়েই কাটিয়ে দিতে হয়। কাপড় কেনার পয়সা নেই··· (২৫ সেকেণ্ড)

৭) দেবী চৌধুরাণী : আহা, বড় কষ্ট তো তোমার। (নির্দেশ) : এই

ব্যক্তিকে ২৮ টাকা দেওয়া হোক। (১৫ সেকেণ্ড)

৮) ব্যক্তির টাকা গ্রহণ ও প্রস্থান। (৩ সেকেণ্ড)

সব সমেত তাহলে লাগছে ৮১ সেকেণ্ড।

আমার ছোট্ট ক্যালকুলেটর বলছে, ১০ হাজার ব্যক্তির জন্য সময় লাগছে ২২৫ ঘণ্টা! তার অর্থ এক নাগাড়ে পুরো ন দিন এবং ন রাতের চেয়েও বেশি। বঙ্কিমচন্দ্রের হিসেব অনুযায়ী অবশ্য জনপ্রতি সময় লেগেছে প্রায় সাড়ে পাঁচ সেকেণ্ড!

এবারে যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে সমর্থন করতে চান তাঁরা বলতে পারেন এভাবে হিসেব করাটা বাড়াবাড়ি। সাহিত্য পড়ছ পড়, কিন্তু এসব কি? উপভোগ না করে হিসেবের গলতি দেখানোর মধ্যে কী মজা পাও হে তুমি?

এর উত্তর—একটু মজাও পাই না, কিন্তু হিসেব করলে হাসি পায় তার কি করব?

বঙ্কিমভক্ত এতে আমার প্রতি ক্ষুণ্ণ হবেন। বলবেন, আপনার ঐ সূক্ষ্ম হিসেবই যে সঠিক সেটা তো নাও হতে পারে?

আমার বক্তব্য, তা তো হতে নাও পারে, কিন্তু আসল হিসেব কত হতে পারে সেটাও তো জানা দরকার। ধরে নিলাম আমার হিসেব শতকরা ৫০ ভাগই অতিরঞ্জিত। সেটা হওয়া সম্ভব নয়—কিন্তু যদি তাও হয় তাহলেও তো দেখা যাচ্ছে টানা সাড়ে চার দিন লেগে যাবে দেবী চৌধুরাণীর ঐ দশ হাজার লোককে টাকা বিলোতে!! অথবা সমস্ত ব্যাপার যদি পনের ঘণ্টায় হয় তাহলে প্রতি জনে সময় লাগছে প্রায় সাড়ে পাঁচ সেকেণ্ড। এটা যে অসম্ভব, তা যে কোনও দুগ্ধপোষ্য শিশুকে প্রশ্ন করুন, সঠিক উত্তর পেয়ে যেতেও পারেন!

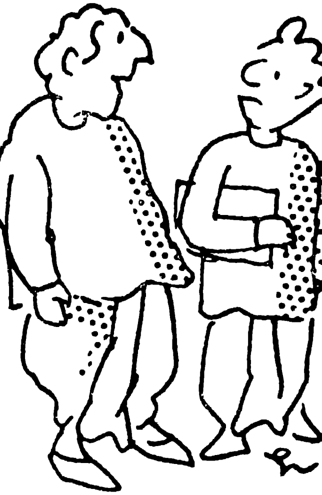
এবারে আরও একটু বলি যদি অনুমতি দেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেবী চৌধুরাণীর এই কর্মকাণ্ডের জন্য বেছে নিয়েছিলেন একটি জঙ্গল। তা তিনি ঋষি মানুষ "নিবিড় জঙ্গল" বেছে নেবেন তাতে আর ক্ষতিটা কি হয়েছে? কিন্তু জঙ্গল নিবিড় হলে কি হবে "প্রায় তিন শত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে"। সেই পরিষ্কার ভূখণ্ডে "প্রায় দশ হাজার লোক" জমিয়াছে। কিন্তু একটু পরেই প্রায় দশ হাজার আর প্রায় রইল না, ঠিক দশ হাজারে পেঁাছেছিল। যাই হক, এই তিনশ বিঘা পরিষ্কার জমির ঠিক মাঝখানে দেবী চৌধুরাণীর এজলাস। চন্দন কাঠের বেদি, তার উপর পুরু গালিচা পাতা। গলায় এত মতির হার যে, "বুকের আর বস্ত্র পর্যন্ত দেখা যায় না।"

কিন্তু অতখানি জায়গা পরিষ্কার করা হল কেন? তিনশ বিঘা পরিষ্কার জায়গায় সকলে যদি সমবেত হয় তাহলে কিন্তু অতখানি জায়গা লাগে না, কেননা আমার ছোট ক্যালকুলেটরের বক্তব্য, মানুষ প্রতি ফাঁকা জায়গা ৪৩২ বর্গ ফুট, অর্থাৎ আধ কাঠারও বেশি। এর মধ্যে কিছু কিছু বড় গাছ অবশ্য কাটা হয় নি, এবং দেবী চৌধুরাণীর জন্য তৈরি মঞ্চেও কিছু জায়গা লেগেছে। তাতে যদি মাথা প্রতি ৩২ বর্গ ফুটও বাদ যায় তাহলে প্রতিটি লোকের জন্য

জায়গা করা হয়েছিল ৪০০ বর্গ ফুট। এ হিসেব মেনে নেওয়া আমার ক্যালকুলেটরের পক্ষে শক্ত।

যাই হোক, আগেই বলা হয়েছে সমস্ত ব্যাপারটি সম্ভব নয় সময়ের দিক থেকে। কিন্তু এই অসম্ভব ব্যাপার সত্ত্বেও পাঠকেরা মুগ্ধ হয়ে থাকেন লেখকের কথায়। লেখক যা বলেন তাই সত্যি বলে মেনে নেন। কেউ হয়ত একটু আধটু সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ভক্ত পাঠক তা শুনলে ফোঁস করে উঠে বলেন, ওরে হারামজাদা তুই বঙ্কিমের বিরোধিতা করিস, যিনি কিনা ঋষি!

আমি সবিনয়ে জানাই, আমি বঙ্কিম বিরোধী নই। আমিও বঙ্কিমের একজন মন্ত্রমুগ্ধ পাঠক, কেবল আমার এই জাপানী ক্যালকুলেটরটাই একটা ইয়ে! ওর প্ররোচনাতেই এত সব কথা আমাকে লিখতে হল।



ব্যোমকেশ ঃ হিসেবের কড়ি

অজিত ঃ 'তুমি সত্যি সত্যি সুকুমারীকে সন্দেহ কর ?'

ব্যোমকেশ ঃ 'সত্যি-মিথ্যের কথা নয়, এ হচ্ছে হিসেবের কড়ি, একটি কানাকড়ি বাদ দেওয়া চলে না।' (মগ্ন-মৈনাক)

ব্যোমকেশের কথাটি মেনে নিয়েই আমার বক্তব্য শুরু করছি। হিসেবের কড়ি থেকে কিছু বাদ দেওয়া সত্যিই চলে না। ব্যোমকেশের নাম এখন বাঙলা গোয়েন্দা কাহিনী পাঠকদের কাছে অজানা নেই। অসাধারণ এই মানুষটি আমাদের মন ভোলায়। মন ভোলায় বলেই ব্যোমকেশের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের চোখে পড়ে না।

এইবার ব্যোমকেশভক্ত পাঠক আর্তনাদ করে উঠবেন, ব্যোমকেশের ত্রুটি-বিচ্যুতি ? আমার সবিনয় নিবেদন, হ্যাঁ। ব্যোমকেশেরই ত্রুটি-বিচ্যুতি। তবে আসলে এর দায়িত্ব শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কেই নিতে হয়। তবে ত্রুটি-বিচ্যুতি কথাটি আমার ব্যক্তিগত অভিমত, তার সমর্থনে কিছু প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু তারও আগে আমি সামান্য অন্য দু-একটা কথা বলে নিই।

প্রশান্তির টোটকা

কেবল যে অপরাধী ভুল করেন তা নয়, গোয়েন্দারাও ভুল করে থাকেন ! গোয়েন্দা লেখকরা ভুল করেন বলেই গোয়েন্দাদের ভুল করতে হয়, এর হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। কথাটা আরও একটু চিন্তা করা দরকার, সহজ কথা হল, মানুষ মাত্রেই ভুল করেন, এবং গোয়েন্দা লেখকেরাও মানুষ, অতএব তাঁরাও ভুল করে থাকেন। নীহাররঞ্জন গুপ্তর বই পড়তে পড়তে সতর্ক পাঠকরা

লক্ষ্য করে দেখবেন সেখানে ডজন ডজন ভুল বা অসঙ্গতি। লিখবার সময় বেপরোয়া একটা মনোভাব, পাঠক সম্পর্কে কিছুটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, কিংবা সত্যি সত্যি অসতর্কতা, অথবা ইচ্ছে করেই কিম্ভূত সব ঘটনা বিন্যাস অধিকাংশ গোয়েন্দা লেখকেরই বিশেষত্ব। নীহাররঞ্জন গুপ্তর লেখায় বাস্তবতা ছিল না, তাঁর সে ভানও ছিল না। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখার মধ্যেও একটা মজার আমেজ ছিল, বাস্তব জীবনের সঙ্গে না মিললেও ক্ষুদে পাঠকদের চলে যেত। ষোল-সতের বছরের ছেলেরা হাতে বন্দুক, প্রভূত পরিমাণে জিনিসপত্র নিয়ে অভিযানে বেরুল, এবং শেষ পর্যন্ত আসামে গিয়ে নিদারুণ সব কাণ্ড-কারখানা করল এগুলো পড়ার সময় খারাপ লাগে না খুব। দুবার পড়তে গেলেই নানা রকম অসঙ্গতি চোখে পড়ে কারুর কারুর। গোয়েন্দা প্রতুল লাহিড়ী পড়তে গেলে তো অনেক সময়েই অসম্ভব এবং বেখাপ্পা জগতেই প্রবেশ করতে হয়। গোয়েন্দা ফেলুদার গল্পেও পাওয়া যায় নানা ধরনের অসঙ্গতি, কিন্তু গোয়েন্দা লেখকদের সুবিধে এই যে তাঁদের কাছ থেকে অনেক সময়েই কঠিন বাস্তব এবং উচ্চমান বিশেষ কেউ প্রত্যাশা করেন না। ধরেই নেওয়া হয় এ-সব 'এস্কেপ লিটারেচার' দৈনন্দিন নানা উত্তেজনা এবং বাস্তবের কাঠিন্যের মধ্যে প্রশান্তির টোটকা। এই হিসেবে প্রায় সব সাহিত্যই বোধহয় 'এস্কেপ লিটারেচার'। বাঙলায় এর নাম দেওয়া চলতে পারে পলায়নী সাহিত্য। কোনও সমালোচক এ-কথাও বলতে পারেন শিশুদের রূপকথার জগৎ শিশুদের বাস্তব জীবনের কঠোরতা থেকে পলায়নের সুযোগ এনে দেয়। রূপকথায় এক ধরনের বাস্তবতা থাকে যা ছোটদের পরিণত করতে সাহায্য করে। তবু, বলতে হয় রূপকথায় বাস্তবতার ভান নেই, প্রথম থেকেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়, এ জগতটাই আলাদা। এখানে হীরের ফুল ফোটে গাছে, এখানে দেখা মেলে ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী পাখির, এখানে দেখা মেলে রাক্ষুসী-রানী, যে ভালমানুষ সেজে থাকে আর রাত্রে ঘোড়া, মানুষ খেয়ে খিদে মেটায়। এখানে কড়ির হিসেব আলাদা, এখানে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র এক অদ্ভুত রাজ্যে উপস্থিত হন পাথর হয়ে যাওয়া রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে।

কিন্তু যে গল্প আজকের, যে গল্পে থাকবে আজকের সমস্যা তাকে যথা-সম্ভব বাস্তবকে মেনে নিতেই হয়। সেই বাস্তব হল মঞ্চ বাস্তব। মঞ্চ সাজিয়ে নেন লেখক নিজেই তারপর সেই মঞ্চ পরিবর্তন করা লেখকের পক্ষেও সম্ভব নয়। কিন্তু তবু ঐ মঞ্চের উপরেই বহু লেখক নানা অসঙ্গতির সৃষ্টি করেন। রবীন্দ্রনাথের গোরার বয়স নিয়ে গোলমাল বেধে যায়। শরৎচন্দ্রের বহু গল্পের বাস্তবতা অলীক এবং বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইল ছাড়া আর কোনও গল্পই সম্ভাব্যতার মাত্রার মধ্যে থাকে না। এর মধ্যেও সমালোচকরা নানা অসম্ভব ব্যাপার খুঁজে পাবেন সন্দেহ নেই। রাধারানী থেকে একটি উদাহরণ দিই। এটি বোধহয় শতকরা নিরানব্বই জন পাঠকেরই নজর বা অনুভূতি এড়িয়ে যাবে। অন্ধকারে কয়েক মিনিটের পরিচয়ে রাধারানী এবং দেবেন্দ্র নারায়ণের জীবন কি ভাবে প্রভাবিত হল সেটির বাস্তবতা কল্পনা করাও কঠিন। "দশ

এগারো বছর"-এর বালিকা অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্য দেবেন্দ্র নারায়ণের প্রেমে সেই যে পড়ল আর তার সহজে উদ্ধার হল না ! আর বেশ পরিপুষ্ট বয়সের ধনী দেবেন্দ্র নারায়ণও নিজের নাম গোপন করলেন কিন্তু রাধারানীর প্রতি করুণা দেখাতে ভুললেন না। এখানে নাম গোপন করাটার সদুত্তর হয়ত আছে, কিন্তু তারপর দেবেন্দ্র নারায়ণের হঠাৎ কাশী চলে যেতে হয়। দেবেন্দ্র নারায়ণের কথায়ঃ "পিতা অনেক দিন রুগ্ন হইয়া রহিলেন, কাশী হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে আমার বৎসরাধিক বিলম্ব হইল। বৎসর পরে আমি ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই কুটীরের সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।"

এখানে বৎসারাধিক এবং তার পরের মুহূর্তেই বৎসর পরে কথাটা সাধারণ পাঠকের মনে প্রশ্ন তোলে না। কিন্তু দেবেন্দ্র নারায়ণের অন্য বক্তব্য যে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় সেটা না রাধারানী, না সাধারণ পাঠক, না বঙ্কিমচন্দ্র কেউই বুঝতে পারেন নি। দেবেন্দ্র নারায়ণের অন্য বক্তব্য হল, "···আবার সেই কুটীরের সন্ধান করিলাম—কিন্তু তাহাদিগকে আর সেখানে দেখিলাম না।"

বয়স্ক, বুদ্ধিমান, বিষয় বুদ্ধিতে পাকা জমিদার একথা বলতে পারেন, কিন্তু এটি যে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয় ! একজন অতি আবেগের সঙ্গে একটি বালিকার খোঁজ করতে সেই কাশী থেকে মাহেশের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সেই কুটীরেও গিয়ে পৌঁছলেন, কিন্তু তিনি এমনই এক ব্যক্তি যে কুটীরের কাউকে দেখতে না পেয়ে আর খোঁজই নিলেন না ! আমি কিংবা আপনি কিংবা একটি আট বছরের ছেলে বা মেয়ে ঐ অবস্থায় কাউকে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করত যে এই কুটীরের বাসিন্দারা গেল কোথায় ? এই একটি প্রশ্ন করলে অন্তত পঞ্চাশজন বলে দিতে পারত রাধারানীর নতুন ঠিকানা ! দেবেন্দ্র নারায়ণের এই বক্তব্যটি মোটেই বাস্তবানুগ নয় এবং সেই কারণে বিশ্বাসযোগ্যও নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যত বড় লেখকই হন না কেন, স্বীকার করতেই হবে এখানে তিনি বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নি। তাতেও কিছু এসে যায় না, কেন না, পাঠকেরা হয় এগুলি বিবেচনাই করেন না, কিংবা করলেও এটাকে মেনে নেন, অথবা অন্য কথায়—না মেনে উপায়ই বা কি ? তবু হিসেবের কড়ি নিয়ে যাঁরা চুলচেরা বিচার করেন, যেমন ব্যোমকেশ, তাঁদের এই নিয়ে বেশ সময় কাটে। সাহিত্যের অন্য এক দিক তাতে উদ্ভাসিত হয়।

চোর চেনা এবং চতুর

ব্যোমকেশের কথা দিয়েই শুরু করেছি, অর্থাৎ হিসেবের কড়ি। এবারে দেখা যাক ব্যোমকেশের বিবরণ যিনি দিচ্ছেন সেই অজিত হিসেবের কড়ির বিবরণ ঠিক মতো দিতে পেরেছেন কিনা। অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত ধরতে হচ্ছে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কেই, উপায় নেই !

সীমন্ত হীরা ব্যোমকেশের এক আশ্চর্য কীর্তি। 'সীমন্ত হীরা' যিনি চুরি করেছেন তিনি চেনা লোক। চেনা, এবং চতুর। ঐ হীরেটি যিনি চুরি

করেছেন অর্থাৎ ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণের কাকা দিগিন্দ্র নারায়ণ, তিনি জানেন হীরেটি উদ্ধারের চেষ্টা চলবে। তিনি হীরেটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন সেটা ব্যোমকেশের জানার কথাও নয়। যে বাড়িতে ওটিকে লুকিয়ে রাখা হয়েছে সে বাড়িটিকে ব্যোমকেশ আগে দেখে নি। দিগিন্দ্র নারায়ণের সঙ্গেও ব্যোমকেশের আগে দেখা হয় নি। সে হীরের দাম এমনই বিরাট যে ত্রিদিবেন্দ্র নারায়ণ জানান, "টাকা দিয়ে সে হীরে কেনবার মত লোক ভারতবর্ষে খুব কমই আছে"! এই হীরেটিকে খুঁজে বার করে মালিককে ফেরত দেওয়ার প্রস্তাবটি যে কোনও ব্যক্তিকে বিহ্বল করতে পারে। কিন্তু ব্যোমকেশকে হীরে উদ্ধারের প্রস্তাব দেওয়া হলে ব্যোমকেশ সহজভাবেই উত্তর দেয়, "এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আমি এর চেয়ে ঢের বেশি জটিল রহস্য প্রত্যাশা করেছিলুম।"

কোনও বাস্তব লোক মাটিতে যার পা এমন কথা বলতে পারেন? ঘটনাটা আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে যখন পর মুহূর্তেই ব্যোমকেশ বলে, "যা হোক, আজ শনিবার, আগামী শনিবারের মধ্যে আপনার হীরা ফেরত পাবেন।" এ-রকম একটি অসাধারণ বাক্য, বলা বাহুল্য, পাঠকদের মনে চিন্তা পর্যন্ত জাগায় না। এর অস্বাভাবিকত্ব মেনে নেন তাঁরা, কেন না পলায়নপর পাঠকের যে বিচারবুদ্ধি হয় থাকে না, নয় তো মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েন বা মোহে পড়তে চান।

ঐ একটি ঘটনা থেকে পাঠক মনের অনেকটাই জানা হয়ে যায়। ব্যোমকেশ কেন মনে করে সে হীরেটিকে উদ্ধার করতে পারবে তার একটিমাত্র আভাস আছে গল্পে। সেটি হল, ব্যোমকেশ ধরে নিয়েছিল দিগিন্দ্র নারায়ণ এক দণ্ডের জন্যও হীরেটি কাছ-ছাড়া করবেন না। দিগিন্দ্র নারায়ণ যদি হীরেটিকে রান্না-ঘরের কফির কৌটোয় রাখতেন তাহলে কিন্তু ব্যোমকেশ কখনই সেটাকে খুঁজে পেত না! আরও হাজার রকম জায়গা ছিল, এমন কি তিনি বাড়িতেই রাখবেন ওটি সেটাও না হতে পারত। কিন্তু ব্যোমকেশ যেই ধারণা করল যে তিনি হীরেটিকে এক দণ্ডের জন্যও কাছ-ছাড়া করবেন না ঠিক সেটাই মিলে গেল।

এরপর অবশ্যই ব্যোমকেশ হীরেটিকে উদ্ধার করে, (শার্লক হোমসীয় কায়দায়) যদিও ব্যোমকেশ নিজেই বিবরণ দিচ্ছে ফটকে চারটে দারোয়ান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বসে আছে···আট হাত উঁচু পাঁচিল, তার উপর ছুঁচলো লোহার শিক বসানো।···বাড়ির সদর দরজায় নেপালি ভৃত্য উজরে সিং থাপা বাঘের মত থাবা গেড়ে বসে আছেন···। আর রাত্রে? "ব্যবস্থা আরও চমৎকার" দারোয়ান চৌকিদার তো আছেই, তার উপর চারটে বিলিতি ম্যাস্টিফ কুকুর কম্পাউন্ডের মধ্যে ছাড়া থাকে।·· এরপরও কিন্তু ব্যোমকেশ তার গোঁ ছাড়ে না। সে বলে, "সাতদিনের মধ্যে কুমার বাহাদুরের জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দেব, কথা দিয়েছি।" অর্থাৎ, আমি হলেম গিয়ে ব্যোমকেশ বক্সি, কথা যখন দিয়েছি তখন সেটা পালন তো করবই!

আশ্চর্য ঘণ্টি বন্দুক !

'পথের কাঁটা' এক আশ্চর্য গল্প। অভাবনীয় পন্থায় এক সাইকেল আরোহী ঘণ্টির মধ্যে স্প্রিং-এর জোরে গ্রামোফোন পিন সজোরে ঢুকিয়ে পথচারীকে খুন করে থাকে। এ-রকম একটা অস্ত্রের জন্য যে স্প্রিং-এর দরকার সেটি ঐটুকু ঘণ্টির মধ্যে রাখা এবং ঠিক হৃৎপিণ্ডে ঢুকিয়ে দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। মনে রাখতে হবে, কোনও ক্ষেত্রেই পিনটি হৃৎপিণ্ড ভেদ পুরো করেনি, খানিকটা গিয়ে আটকে গেছে। অর্থাৎ স্প্রিং-এর জোর খুব বিরাট নয়। খুব বিরাট জোর হলে পিনটি শরীরটাই ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারত। কিন্ত কোনও ক্ষেত্রেই তা হয়নি ! অথচ এই গল্পের আশুতোষ মিত্র যা বলেন তাতে হতচকিত হতে হয়। তিনি বলছেন, "মাথাটা যেন ঘুলিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে বুকে ধাক্কা লাগল, কিছুই ধারণা করতে পারলাম না। পকেট থেকে ঘড়িটা বার করতে গিয়ে দেখি, ঘড়ি বার হচ্ছে না, কিসে আটকে যাচ্ছে। সাবধানে পকেটের কাপড় সরিয়ে যখন ঘড়ি বার করলাম, তখন দেখি, তার কাচ খানা গুঁড়ো হয়ে গেছে…আর · আর একটা গ্রামোফোনের পিন ঘড়িটাকে ফুঁড়ে মুখ বার করে আছে।"

একটি পিন পুরনো আমলের একটি পকেট ঘড়ির কাঁচ গুঁড়ো করেছে (এটা সম্ভব কিনা সেটাও বিচার্য। কাঁচ ভাঙতে পারে, ফাটতে পারে, কিন্তু গুঁড়ো হওয়া ?). ঘড়ির অসংখ্য কলকব্জা ভেদ করেছে, ডায়াল ভেদ করেছে, এবং শেষ পর্যন্ত ঘড়ির মোটা ধাতুকে পর্যন্ত ফুটো করেছে। এটা এতই অসম্ভব যে এর জন্য বৈজ্ঞানিক হিসেব দাখিলের প্রয়োজন নেই। যাই হক, বুকে একটা প্লেট বাঁধা অবস্থায় যখন ব্যোমকেশের দিকে ঐ রকম পিন ছুটে আসে তখন কিন্তু ঐ পিনটি কেবল প্লেটটিকেই ভাঙতে পারে, ব্যোমকেশের চামড়া পর্যন্ত ভেদ করতে পারে না। এগুলোই অসঙ্গতি কিন্তু চট করে এসব পাঠকদের মনে আসে না। ব্যোমকেশের হিসেবের কড়ির এখানে পরাজয় ঘটে, কিন্তু পাঠক বুঝতে পারেন না।

খোলা দরজা

গল্পকে সহজ করার জন্য প্রায়ই দেখা যায় দরজা বা জানালা (গরাদহীন) খোলা। আদিম রিপু-তে, "অনাদি হালদার মারা গেল—সে তার দরজা খুলে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল। পেছন থেকে গুলি করা হয়েছিল।" মণি মণ্ডণে খোলা দেরাজে ৫৭ হাজার টাকা দামের গহনা রাখা হয়েছিল, চুরি গেল। 'কহেন কবি কালিদাস'-এ সন্ধ্যে সোয়া আট থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে দরজা খোলা ছিল।

দুষ্টচক্রে দেখা যায়, "বাড়িতে একটা ঝি ছাড়া কেউ থাকে না ; অভয় ঘোষাল ন'টার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে যায় ; সদর দরজা ভেজানো থাকে, চাকরানী বোধহয়…।" ইত্যাদি। অর্থমনর্থম-এ সত্যবতী বলছে,

"...বাড়িতে কারুর দরজা বন্ধ করে শোবার হুকুম ছিল না। মেসোমশায় নিজেও রাত্রিতে দরজা খুলে শুতেন।" রক্তমুখী নীলাতেও দরজা খোলা এবং "শোবার ঘরের মেঝেয় (হরিপদ) মরে পড়ে আছে... ।" ব্যোমকেশ ও বরদাতে দরজা বন্ধ থাকলেও জানালা খোলা ছিল এবং জানালার গরাদ ছিল না।

এতগুলি খোলা জানালা দরজার ব্যাপার। আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু সবটা মিলে সন্দেহজনক বলে মনে হয়।

ঘাড়ের কশেরু ভাঙিয়া

মগ্ন মৈনাক গল্পটি নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। গল্পটি একটু জটিলতরও বটে! খুন হয়েছে হেনা, ছাত থেকে পড়ে। কিন্তু হেনার ঠিক কি কারণে মৃত্যু হয়েছে? দেখা যাক। (পুলিসের) "ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, উচ্চ স্থান হইতে পতনের ফলে ঘাড়ের কশেরু ভাঙিয়া মৃত্যু হইয়াছে,... ।"

এটা মেনে নিলে গোল থাকে না। কিন্তু কয়েক পৃষ্ঠা পরেই আর একটি বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে, ঐ একই হেনার মৃত্যুর কারণ হিসেবে থানার দারোগা বলছেন, "এ-রকম অবস্থায় যা আশা করা যায় তার বেশি কিছু নয়। পাঁজরার একটা হাড় ভেঙে হৃৎপিণ্ডকে ফুটো করে দিয়েছে, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে। অন্য কোনও জটিলতা নেই।"

জটিলতা নেই? কোথায় ঘাড়ের কশেরু ভেঙে মৃত্যু আর কোথায় হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে মৃত্যু!! এ ব্যাপারে কিন্তু ব্যোমকেশ এবং শরদিন্দু উভয়েই নির্বিকার! পুলিসের ডাক্তার এবং থানার দারোগার মধ্যে এই মতভেদের কিভাবে শেষ পর্যন্ত অবসান হল, কিংবা হল কিনা তার ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই কোথাও! হিসেবের কড়ি এই ভাবেই চোখের সামনে হারিয়ে যায়।

আগেই বলেছি, মগ্ন মৈনাক নানা দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এমন অসংলগ্নতা বোধহয় অন্য আর কোনও গল্পে খুঁজে পাওয়া যাবে না। গল্পটি বেশ বড়ই। প্রায় পঁচিশ হাজার শব্দ। এই গল্পে অনেকটাই জেরা আছে। ব্যোমকেশ জেরার সময় ২০ বছর বয়সের যুগলকে বলছে "হেনার সঙ্গে আপনার ভালবাসা হয়েছিল?" কিন্তু তারই যমজভাই ২০ বছর বয়সের উদয়কে বলছে, "তুমি হেনাকে উল এনে দিয়েছিলে .. ।"

উল এনে দিতেই পারে, কিন্তু ব্যোমকেশ একজনকে আপনি, অন্য জনকে তুমি বলছে কেন, বোঝা গেল না। দুজনেরই এক বয়স!

এবারে আর একটি ব্যাপার দেখা যাক। হেনার যে বাড়িতে মৃত্যু হয় সে বাড়ির নিয়মকানুন বড় কঠোর। কেন না, দেখা যাচ্ছে রবি বর্মা নামক এক ব্যক্তি সিগারেটের কৌটো এবং দেশলাই এনে সন্তোষবাবুর সামনে রাখার পর তিনি কৌটোর "ঢাকা খুলিয়া আমাকে সম্মুখে ধরিলেন—" এবং তারপর "সিগারেট লইতে লইতে ব্যোমকেশ একটু হাসিয়া বলিল, শুনেছিলাম এ বাড়িতে ধূমপান নিষিদ্ধ। সন্তোষবাবু ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন,

"আপনাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়।"

কিন্তু এরপর যা দেখা গেল তাতে ব্যাপারটা একটু প্যাঁচালো হয়েই উঠল, কেন না, পুলিসের কাছে জবানবন্দীতে উদয়চাঁদ সমাদ্দার বলছে, "নেংটি ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছিল, আমার কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।" অর্থাৎ কেবল রবি বর্মাই নয়। সিগারেটের অভ্যেস আরও দুজনের ছিল। এবং তাতেই যে শেষ তাও নয়—সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে হেনাও লুকিয়ে সিগারেট টানতে ছাতে যেত!

যেখানে দেখিবে ছাই

যাঁরা হিসেবের কড়ি নিয়ে কারবার করতে ভালবাসেন, তাঁদের পক্ষে মগ্ন মৈনাক একটি ভান্ডার বিশেষ। ব্যোমকেশ ও বরদায় আছে, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ ভাই, পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন। এই মগ্ন মৈনাকেও ছাই আছে, দেখা যাক সেটার হিসেব কী রকম দাঁড়ায়!

নেংটি ব্যোমকেশকে বলছে, "কাল রাত্তিরে হেনার ঘরটা কে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে।" পরে শোনা গেল হেনার ঘরটিই কেবল পুড়েছে, বাড়ির আর কোনও ক্ষতি হয়নি। অদ্ভুত আগুনের শিখা, কিংবা শিক্ষা! যে আগুন কেবল যতটুকু দরকার সেটুকুই পোড়ায়, তার বেশি নয়! তাও যেমন তেমন পোড়া নয়, সব পুড়ে ছাই! নেংটির কথায়, "বাড়ি নয়, শুধু হেনার ঘরটা পুড়েছে। খাট-বিছানা, টেবিল-আলমারি কিছু নেই, সব ছাই হয়ে গেছে।"

কিন্তু একথায় ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর সে প্রশ্ন করল, "রাত্তিরে কখন তোমরা জানতে পারলে?" (ঘটনাটি রাত্রে ঘটেছিল), তার উত্তরে নেংটি বলল, "আমরা রাত্তিরে জানব কোত্থেকে, আমরা দোতলায় শুই।" কেবল তাই নয়। রবি বর্মা নিচের তলায় শোয় সামনা সামনি ঘর, কয়েক ফুট দূরে থেকে সেও জানতে পারেনি রাত্রি বেলায় ঐ রকম আগুনের ব্যাপার। বাড়ির লোকেরাই যখন জানতে পারেনি, তখন পাড়া পড়শীর জানার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

ঘরটা পুড়েছে কিন্তু একেবারে নিখুঁত ভাবে। জানালা পুড়েছে, দরজা পুড়েছে। দরজা এমন ভাবে পুড়েছে যে সেটা বন্ধ ছিল কি খোলা ছিল তাও বোঝা যাচ্ছে না! তা পুড়বে ভয়ানক ভাবে তাতে আশ্চর্য কি, পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালানো হয়েছিল, কেননা সে ব্যোমকেশকে বলে, 'সিঁড়ির তলায় এক টিন পেট্রোল রাখা থাকতো, দেখা গেল টিন খালি।"

যাই হক, পেট্রোলের তীব্র আগুন জ্বলে একটি ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র ছাই হয়ে গেল, তারপর সে আগুন নিজেই নিবে গেল। এ-রকম শিক্ষিত আগুন হিসেবের মধ্যে আনা যায় কেবল কাহিনীতেই! এই আগুনের প্রচন্ড তাপ কিন্তু দোতলার ঘরের কিছুতে আগুন ধরায়নি, কিংবা কোনও ব্যক্তি থাকলে তাকেও বুঝতে দেয়নি!!

হেনার রহস্যময় আচরণ

হেনার মৃত্যু হয়েছে ছাত থেকে পড়ে। হেনার উচ্চতা ছিল আন্দাজ পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। আলসের উচ্চতা চার ফুট। অজিত বলছে, "আলিসাটা আমার কোমর পর্যন্ত উঁচু, এক ফুট চওড়া।" এবং "পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা কম।" কিন্তু পুলিসের দারোগার মত হল, "কিন্তু তাহলেও অসম্ভব নয়।" এখানে পুলিসের দারোগার সাক্ষ্য মানা সম্ভব নয়, কেন না চাব ফুট আলিসাব পরও এক ফুট চওড়া জায়গা, ঝুঁকে কিছু দেখতে গিয়ে পড়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঝুঁকে কিছু দেখতে গিয়ে পড়তে হলে আলিসার দেওয়ালের ঐ এক ফুট জায়গা থেকেও শরীরটাকে প্রায় তিন ফুট বাইরের দিকে আনতে হবে তাহলে যদি ভারসাম্যতা হারায়! হেনা বুদ্ধিমতী মেয়ে, তার পক্ষে সেটা কবা সম্ভব নয়। ঝুঁকে কোনও কিছু দেখতে হলে আলিসার শেষ থেকে মাথাটা ছ'ইঞ্চি বার করলেই হয়ে যায়, কিন্তু হেনা তা করেনি, করলে পড়ত না, তাহলে এখানে অন্য একটা অস্বাভাবিক কিছু হয়েছিল ধরে নিতেই হয়। অবশ্যই অন্য একটা কিছু ঘটেছিল, কিন্তু সেটা এমনই অস্বাভাবিক এবং প্রায় অসম্ভব যে সেটা কাহিনীতেই ঘটে বা ঘটতে পারে!

সেই ঘটনাটি হল, হেনাব মৃত্যুর ব্যাপারটি। সন্তোষ সমাদ্দার জানতেন হেনা প্রতিদিন বিকেলে ছাতে যায় নামাজ পড়তে। ঐ সময়, "হেনা বোধহয় তখন মাদুর পেতে পশ্চিম দিকে মুখ করে নামাজ পড়বার উপক্রম করছিল, দেখল সন্তোষবাবু উঠে আসছেন। তাঁর অভিপ্রায় বুঝতে হেনার দেরি হল না, সে ভয় পেয়ে ছাদের পূব দিকে পালাতে লাগল। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? আলসের কাছে আসতেই সন্তোষবাবু পিছন থেকে ছুটে এসে তাকে ধাক্কা দিলেন, সে ছাদ থেকে নিচে পড়ে গেল।"

বলা হয়েছে, সন্তোষবাবু বাড়িতে এসেছিলেন তা কেউ জানল না! বাড়িতে এসেছিলেন পাড়ার কেউ দেখেনি! কলকাতার একেবারে চৌরঙ্গি অঞ্চলে তাঁব বাড়ি। তিনি নিজে বিখ্যাত লোক, বড একজন নেতা। সম্পূর্ণ গোপনে তিনি বিকেল বেলা তাঁর নিজের বাড়িতে এলেন, কিন্তু বাড়ির ছাদে উঠে গেলেন ভারা বেয়ে। বাড়ি মেবামতের জন্য বাড়িতে ভারা বাঁধা ছিল। কী দারুণ সর্ব-ভারতীয় নেতা! যাই হক, ছাদে উঠেই তিনি হেনার দিকে তেড়ে গেলেন, এবং ধাক্কায় তাকে নিচে ফেলে দিলেন। এক ধাক্কায় হেনাকে ফেলা সম্ভব নয়, তাকে উঁচু করে ধরে ফেলা ছাড়া উপায় নেই, আবাব হেনা তাঁর মতলব বুঝেও একটু চিৎকার করল না। পড়বার সময় পর্যন্ত সে নীরব! এমন কি বাড়িতে লোকজন থাকা সত্ত্বেও তার পড়ার বিরাট আওয়াজ পাড়ার কেউই শুনতে পেল না। তারপর সেই নেতা ঠাণ্ডা মাথায় ছাদের শেকল খুলে আবার ভারা বেয়ে নেমে গেলেন, (তিনি ধরেই নিলেন তিনতলা থেকে পড়ে হেনার মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না!) এবং এবারেও কেউ দেখতে পেল না! সত্যি, হিসেবের কড়ি যে কত গোলমাল করতে পারে, তার ঠিকানা নেই!

অবশ্য একেবারেই কেউ ব্যাপারটি দেখতে পায়নি তা ঠিক নয়। সেটা জানা গেল নেংটির মুখে। নেংটি শেষে জানাল সে সমস্তটা নিজে দেখেছে! অর্থাৎ ব্যোমকেশ যা 'কষ্ট' করে উদ্ঘাটন করতে পেরেছিল তা নেংটি আগেই জানত !! অথচ সেই ব্যোমকেশকে হেনার মৃত্যু সংবাদ টেলিফোনে জানায়। ব্যোমকেশকে আসতেও বলে! এদিকে ব্যোমকেশ যখন নিজে সমস্ত রহস্য সমাধান করল তখন নেংটি জানালো সে সমস্ত ব্যাপারটা দেখেছে। কিন্তু কেন সে আগে বলেনি? ব্যোমকেশও নেংটিকে ঐ একই প্রশ্ন করেছিল, তার উত্তরে নেংটি জানায়, "কি করে বলি, ব্যোমকেশদা। উনি আমাদের অন্নদাতা, ওঁকে পুলিসে ধরিয়ে দেব কি বলে? তবু আপনাকে খবর দিয়েছিলাম, জানতাম, কেউ যদি অপরাধীকে ধরতে পারে তো সে আপনি।"

এই রকম লজিক সচরাচর দেখা যায় না। যে খুন করেছে তাকে ধরিয়ে দিতে কুণ্ঠা, কিন্তু সে যাতে ধরা পড়ে সে জন্য একেবারে ব্যোমকেশকে খবর দিয়েছে। হিসেবের কড়ি এখানে জোর করে মেলানো হয়েছে, কেন না এর মধ্যে প্রভূত পরিমাণ অচল আধুলি, এবং জাল টাকা চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দোতলায় পাঁচটি বাথরুম!

হিসেবের কড়ি এইভাবেই অচল মুদ্রার সাহায্যে মেলানো হয়। এবারে বাড়িটার দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক, গল্পের সঙ্গে একটি বাড়ি নকশা দেওয়া রয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে বাড়িটা ৬০ ফুট লম্বা এবং ৪৫ ফুট চওড়া। অর্থাৎ সব সমেত হয় ২৭০০ বর্গ ফুট। কিন্তু বাড়িটা তৈরি হয়েছে ইংরেজী ইউ এর মত। দক্ষিণ দিকে দুখানি ঘর অনেকটা বাড়ানো মাঝখানে চত্বর। ফলে বাড়িটা পুরো ২৭০০ বর্গ ফুট নয়, কম। মোটামুটি হিসেবে অন্তত ৪০০ ফুট কম। তাহলে বাড়িটার মাপ হচ্ছে ২৩০০ বর্গ ফুট। অথচ আর একটা বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে ছাদটি বেশ বড়, "ইহার উপর সুন্দর একটি টেনিস কোর্ট তৈরি করা চলে।"

চলে? একটি বড় টেনিস কোর্টের মাপ বর্গ ফুটের হিসেবে ২৮০৮ লম্বায় ৭৮ ফুট, এবং চওড়ায় ৩৬ ফুট। এই বাড়িটি যে লম্বায় মাত্র ৬০ ফুট। তাছাড়া বর্গফুটেও কম। টেনিস কোর্ট তো তৈরি করলেই হয় না কোর্টের বাইরেও অনেকটা জায়গা রাখতে হয়। সে হিসেবেও সন্তোষবাবুর বাড়িটি নিতান্তই ছোট যে!

এবারে বাড়ির নকশা। এটি তাজ্জব হয়ে যাওয়ার মতই! দোতলা বাড়ির নিচে রয়েছে চাকরদের ঘর, তার পাশে রান্নাঘর, রান্নাঘরের পাশে ভাঁড়ার ঘর। ভাঁড়ার ঘর সংলগ্ন খাবার ঘর। সেটাতে টেবিল ও ১৬টি চেয়ার দেখান আছে, অথচ অজিত বলছে, "সন্তোষবাবুর ভোজন-কক্ষটি বেশ বড়, লম্বা টেবিল বারো-চৌদ্দ জন একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারে।"

বাড়িটার নকশায় কোনও শ্রী-ছাঁদ নেই। হেনার ঘর আর সন্নিহিত বাথরুম লম্বায় সমান, প্রায় ১৮ ফুট! চওড়ায় হেনার ঘর আন্দাজ ১১ ফুট, বাথরুম

চওড়ায় ৭ ফুট ! আবার রবি বর্মার ঘরটি হেনার ঘরের চেয়ে বড়, প্রায় ২৩/২৪ ফুট, কিন্তু রবি বর্মার ঘরের সন্নিহিত বাথরুমটি তুলনায় নিতান্তই ছোট, ১১×৫ ফুট! আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে নিচে আর কোথাও বাথরুম নেই। চাকরদের ঘর আছে বটে, কিন্তু তাদের বাথরুম নেই। এ এক অসাধারণ বাড়ির নকশা। সর্বভারতীয় নেতার মন বোঝা ভার !! ওঁর বাড়িতে কেউ অতিথি এলে বাথরুম ব্যবহার করতে হলে হয় রবি বর্মা নয়তো হেনার বাথরুম ব্যবহার করতে হত। অথবা উপরে দোতলায় বাথরুমে যেতে হত। দোতলায় অবশ্য বাথরুমের অভাব নেই। ১৫ বছরের মেয়ে চিংড়ি বলছে, "······আমিও বাথরুমে গা ধুতে গেলুম। দোতলায় পাঁচটা বাথরুম আছে।"

দেখুন সর্বভারতীয় নেতা সন্তোষবাবুর বাড়ির অদ্ভুত ব্যাপার ! দোতলায় পাঁচ পাঁচটা বাথরুম। এগুলিও পাঁচখানা ঘরের সঙ্গে যুক্ত কিনা তা অবশ্য জানা যায় না। দোতলার নকশা বইতে দেওয়া নেই ! সর্বভারতীয় নেতা সন্তোষবাবুর খেয়ালের অন্ত নেই ! তার উপর এই বাড়িতে গ্যারাজ-এরও কথা নেই, নকশাতেও নেই !

হেনার ঘরের দুটো দরজা, একটা বাথরুমের আর একটি হল ঘর থেকে ঢোকার জন্য। জানলা চারটি, দুটি পূব দিকে, একটি দক্ষিণে, একটি পশ্চিমে। অথচ, বর্ণনায় স্পষ্ট লেখা আছে, "ঘরটি বেশ বড়। সদরের দিক ধনুরাকৃতি, বড় জানালা, পূব দিকের দেওয়ালেও একটি সাধারণ জানালা আছে।" বাড়ির প্ল্যান-এ দুটি জানালা দেখানো আছে।

তখন সুকুমারীর বয়স

ঐ একই গল্পে সন্তোষবাবু বলছেন, "দশ বছর আগে তার গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার দাম্পত্য-জীবন সুখের নয়, আমি সুকুমারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তখন সুকুমারীর বয়স বাইশ তেইশ বছর। · · ·"

অর্থাৎ, সুকুমারীর বর্তমান বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ। বয়স হিসেবে চমৎকার হলেও হিসেবের কড়িতে এখনও অচল সিকি আধুলির সমারোহ, কেন না, ঐ গল্পেরই অন্য বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে, "এক একজন মানুষ আছে যাহাদের যৌবনকাল অতীত হইলেও যৌবনের কুহক থাকিয়া যায়। সুকুমারীর বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশের কম নয়।"

কী সর্বনাশ !

এবার দেখা যাক একটি জেরার উত্তরে সন্তোষবাবু কী বলছেন। "প্রঃ আজ যখন টেলিফোন পেলেন তখন আপনি কি করছিলেন ? উঃ কীর্তন শুনছিলাম। সুকুমারী চণ্ডীদাসের পদ গাইছিল।"

তারপর সুকুমারীকে ঐ একই প্রশ্ন করাতে তার উত্তর, " ···· আমি জগদানন্দর মঞ্জু-বিকচ-কুসুম-পুঞ্জ পদটি শেষ করে এনেছি, এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল।"

ব্যোমকেশ এই দুই বিভিন্ন বক্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করে নি, সন্দেহও নয় !

সে নিজে যদিও বলে হিসেবের কড়ির কথা, কিন্তু নিজেই জানে না সঠিক হিসেব কেমন করে করতে হয় !

এবার দেখা যাক অন্যত্র ব্যোমকেশ কী করছে। সত্যান্বেষী গল্পে অজিত বলেছে, (ব্যোমকেশ সম্পর্কে), "কিন্তু সে তাসপাশা খেলিতে জানিত না।" অথচ 'হেঁয়ালির ছন্দ' গল্পটিতে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। ব্যোমকেশ নিজে বলছে, "· আমারও এক সময় ব্রিজের নেশা ছিল।"

উইল নিয়ে অর্থমনর্থম-এ দেখেছি, "সুকুমারবাবর ঘর থেকে যে উইলটা বেরিয়েছে—উইল হিসেবে সেটা মূল্যহীন। তাতে সাক্ষীর দস্তখত নেই।"

বেশ কথা। হেঁয়ালির ছন্দের দেবনাথ বলছে, "একটা কথা মনে হল। শুনেছি উইল করলে দু-জন সাক্ষীর দস্তখত দরকার হয়। · ···"

কিন্তু খুঁজি খুঁজি নারিতে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার ! এখানে ব্যোমকেশের একেবারে অন্য সুর। প্রমাণ "ব্যোমকেশ বলিল, আপনার কথা যথার্থ। কিন্তু একটা ব্যতিক্রম আছে। যিনি উইল করেছেন তিনি যদি নিজের হাতে আগাগোড়া উইলটা লেখেন তাহলে সাক্ষীর দরকার হয় না।"

এখন তাহলে হিসেবের কড়ি কোথায় দাঁড়াচ্ছে ?

সন্দিহান সত্যবতী

ব্যোমকেশ সত্যবতীর চিঠি পেল। "সকালবেলা ডাকে দুটি চিঠি আসিল। একটি চিঠি সত্যবতীর। সে দীর্ঘকাল আমাদের না দেখিয়া আমাদের বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছে।" (আদিম রিপু)। এই গল্পেই আবার দেখা যাচ্ছে ব্যোমকেশ "একাকী দিল্লি চলিয়া গেল" এবং আট মাসেরও বেশি সেখানে রহিল !

কিন্তু অন্যত্র ব্যোমকেশের জবানীতে, " ···বাঙালীর ছেলে চিঠি লিখতে শেখে বিয়ের পর। কিন্তু আমি বিয়ের পর দুদিনের জন্যও বৌ ছেড়ে রইলাম না, চিঠি লিখতে শিখব কোত্থেকে ?" (শৈল রহস্য)

হিসেবের কড়ি মেলানো ভার হয়ে ওঠে, যখন 'মণি মণ্ডণ'এ দেখা যায়, "যাহারা বিপদে পড়ে তাহারাই ব্যোমকেশের কাছে আসে, সে আগে কাহারও কাছে যায় না।" সত্যি ? কিন্তু সীমন্ত হীরায় ব্যোমকেশ উত্তরবঙ্গে গেল, অবশ্য একটি চিঠি পেয়ে, কিন্তু সত্যান্বেষীতে দেখা যায়, কলকাতার একটি বিশেষ অঞ্চলে পর পর কয়েকটি খুন হয়ে যাওয়ার পর ব্যোমকেশ নিজে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে ! অতএব "সে আগে কাহারও কাছে যায় না" কথাটা মেলে না !

এবার দেখা যাক 'শৈল রহস্য' গল্পের একটি বর্ণনা ঃ "মহাবালেশ্বরে হোটেলের মরসুম হচ্ছে আড়াই মাস, টেনেটুনে তিন মাস। কিন্তু এই কয় মাসের মধ্যেই হোটেলের আয় হয় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা, খরচ-খরচা বাদ দিয়ে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা লাভ থাকে।" কিন্তু ঐ গল্পেই, "স্ত্রী পুরুষে হোটেল চালাচ্ছে, হোটেল বেশ জাঁকিয়ে উঠল। প্রতি বছর ত্রিশ-

চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হয়।" বিশ-পঁচিশ হাজার এবং ত্রিশ-চল্লিশ হাজার এ হিসেব যে মেলে না।

তোমার ঔরৎকে নিয়ে এসো

'খুঁজি খুঁজি নারি', গল্পের একটি বর্ণনাঃ "রামেশ্বরবাবু বড়মানুষ ছিলেন। কলিকাতায় তাঁহার আট-দশখানা বাড়ি ছিল·····।" আট-দশখানা ? মোটেই নয়, কেন না রামেশ্বরবাবুর উইলে তিনি স্পষ্ট লিখেছেন "কলিকাতায় আমার যে আটটি বাড়ি আছে · ···।"

হিসেবের কড়ি !

এবার দেখা যাক বেণী সংহার গল্পের একটি বর্ণনা—"মেঘরাজ সিপাহি ছিল, সে হুকুমের চাকর। যথারীতি মকরন্দর কান ধরে গালে চড় মারল। মকরন্দর মনে যতই ধৃষ্টতা থাক, মেঘরাজের সঙ্গে হাতাহাতি করার সাহস বা দৈহিক শক্তি তার নেই, সে ধাক্কা খেতে খেতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।"

এরপরের ঘটনা, (মেঘরাজকে বেণীমাধব)ঃ "এখন আমার প্রস্তাব শোনো। তুমি দেশে গিয়ে তোমার ঔরৎকে নিয়ে এস।···তুমি কাল সকালে প্লেনে দিল্লি চলে যাও, বৌকে নিয়ে যত শীগগির পার ফিরে আসবে, প্লেনের ভাড়া ইত্যাদি সব খরচ আমি দেব।"

অর্থাৎ, গালে চড় মারার ঘটনার সময় মেঘরাজের ঔরৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। অথচ ঐ গল্পেই রয়েছে, "মেঘরাজের ঔরৎকে ব্যোমকেশ জেরা করছে, "মেঘরাজ তাকে চড় মেরেছিল তুমি জানো ?" তার উত্তরে ঔরত বলছে, "জি হাঁ, আমি তখন পাশের ঘরে ছিলুম।"

স্থানাভাব, তাই আরও অনেক অসাধারণ হিসেবের কড়ির গরমিল দেওয়া যাচ্ছে না। এবারে আদিম-রিপু থেকে দু-একটি কড়ির গরমিলের খবর জানাই। প্রথমটি হল—"যুদ্ধের বাজারে ভাল বাসা পাওয়া যায় না।"

অসম্ভব কথা। কলকাতায় যুদ্ধের সময় ইচ্ছে মত হাজার হাজার বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত। এ ব্যাপারে যে কোনও ঐ আমলের সংবাদপত্র দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। বিভূতিভূষণের অনুবর্তনেও যুদ্ধের সময়কার কলকাতার সেই 'ইভ্যাকুয়েশন'এর চমৎকার বর্ণনা আছে।

ঐ গল্পেই ব্যোমকেশ বলছে, "ননীবালা দেবী মিথ্যা বলেননি। এক জোড়া বেড়াল, তবে শুকনো বেড়াল নয়, ভিজে বেড়াল।"

না, ননীবালা দেবী তা বলেন নি। ননীবালা দেবী বলেছিলেন, "তাহাদের দৃষ্টি বাঘের মত ভয়ানক।"

বেড়াল এবং বাঘের মধ্যে জাতিগত মিল থাকলেও প্রজাতিগত মিল যে নেই !

এইবার শেষ করি। অজিত বলছে (আদিম-রিপু), "শিউলী মজুমদারের গান শেষ হইল···লক্ষ্য করিলাম···গান শেষ হইবার পর প্রভাত অলক্ষিতে উঠিয়া গেল।"

এই রহস্যের সমাধানে আমি ব্যর্থ হয়েছি। প্রভাত অলক্ষিতে "উঠিয়া" গেলে সেটা নজরে পড়ে কেমন করে?

এবারে শেষ কথাটা বলা যায়, যদিও হিসেবের কড়ির গরমিলের শেষ এখানেই করা গেল না। এই গরমিল থাকা সত্ত্বেও পাঠক হিসেবে পড়ে যেতে কোনও অসুবিধে হয় না। পলায়ন যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে পকেট থেকে দু-একটি খুচরো পয়সা পড়ে গেলে তেমন কিছু এসে যায় না।